উমর আজ্জাম খোরাসানি
মরু শার্দুল
সেহরা সে সমন্দর তক

উমর আজ্জাম খোরাসানি

মরুশার্দূল

সেহরা সে সমন্দর তক

ইডিটরের কথা

বাংলাদেশে কওমী প্রতিষ্টান গুলো অধিকাংশ ই দেওবন্দী মদদপুষ্ট। দেওবন্দী ও বেরেলভী দুই আকীদা ই একি। একদল প্রকাশ্য শিরক করে, আরেক দল গোপনে। পূর্ব থেকেই এরা তাওহীদের দাওয়াতের চেয়েও আমল, তাসাউফ, ফানাফিল্লাহ, আশেক - মাশুক। এইসব আকীদা বেশি জোর দেয়। অথচ তাওহীদ না থাকলে সবই বাতিল। এটা বর্তমানে পরিবর্তন হচ্ছে। কওমী কিছু ওলামায়ে কেরাম ফাজায়েলে আমল এর তাহকীক বের করেছে। কিন্তু এটা কিছুটা দু:খজনক। যেখানে এত শিরক - তা দিয়েই কেন প্রচার করতে হবে।

অন্যদিকে অধিকাংশ সালাফি আলেমদের 100% তাওহীদের শিক্ষা থাকলেও, তারা দরবারি আলেম। গ্লোবাল জিহাদ অস্বিকারকারী ও সর্বদাই জিহাদ এর বিপক্ষে, ও গনতন্ত্রের সাপোর্টার না হলেও সৌদি রাজতন্ত্রের সাপোর্টার।

[রাজতন্ত্র ইসলামে নিশিদ্ধ না। যদি সেটা সারা বিশ্বব্যাপি সকল স্থানে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করতো ও শরিয়াহ কায়েম করতো ও মুসলিমদের জান মাল হেফাজত করতো, যা আলিশান সৌদি রাজা রা করে না]

বর্তমানে আমাদের দেশে সালাফি বেশ ধারি অধিকাংশই সৌদির দালাল।

বর্তমান তালেবান যে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করেছে তাও ইসলামিক না। তারাও সৌদির মতও মুশরিক চিনা ও হিন্দুদের সাথে এলাই করেছে। UN ও ইরান এর সাথে চুক্তি করেছে। শিয়াদের হেফাজত, নির্দিশ্ট ভূখন্ডে ইসলাম প্রতিষ্টা ও বিশ্বব্যাপি কাফির রাষ্ট্রদের থেকে সিকৃতি পাওয়া নিয়ে অনেক ব্যাস্ত রয়েছে। যা কোনটাই ইসলামিক না। আল্লাহই জানেন তাদের পরিকল্পনা। বিশ্বব্যাপী মুজাহিদ দের বিরুদ্ধে বরং তারা নিজেদের জাতীয়তাবাদ নিয়ে ব্যস্ত। অথচ ইসলামে জাতীয়তাবাদ হারাম। মুশরিকদের হেফাজত করার জন্য তারা মুজাহিদদের দমনেই ব্যাস্ত। অথচ আরাকান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া জলছে তাদের কোন খবর নেই। তারা এখন তাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেই খুশি।

পূর্বের তালেবান আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির ধংশ করেছিল, যা এই তালেবানের কাছে স্বপ্নেও আশা করা যায় না।

তাই যাদের যেগুলো সঠিক আমরা তাই নিব। যেগুলো বাতিল। তা অস্বিকার করবো।
আল্লাহ তাদেরকে ও আমাদেরকে হিদাআত এর পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

এই বইটি আমাদের সবাইকে অতীত সম্পর্কে একটি ভাল ধারনা দিবে। আশাকরি সবাই উপকৃত হবেন।
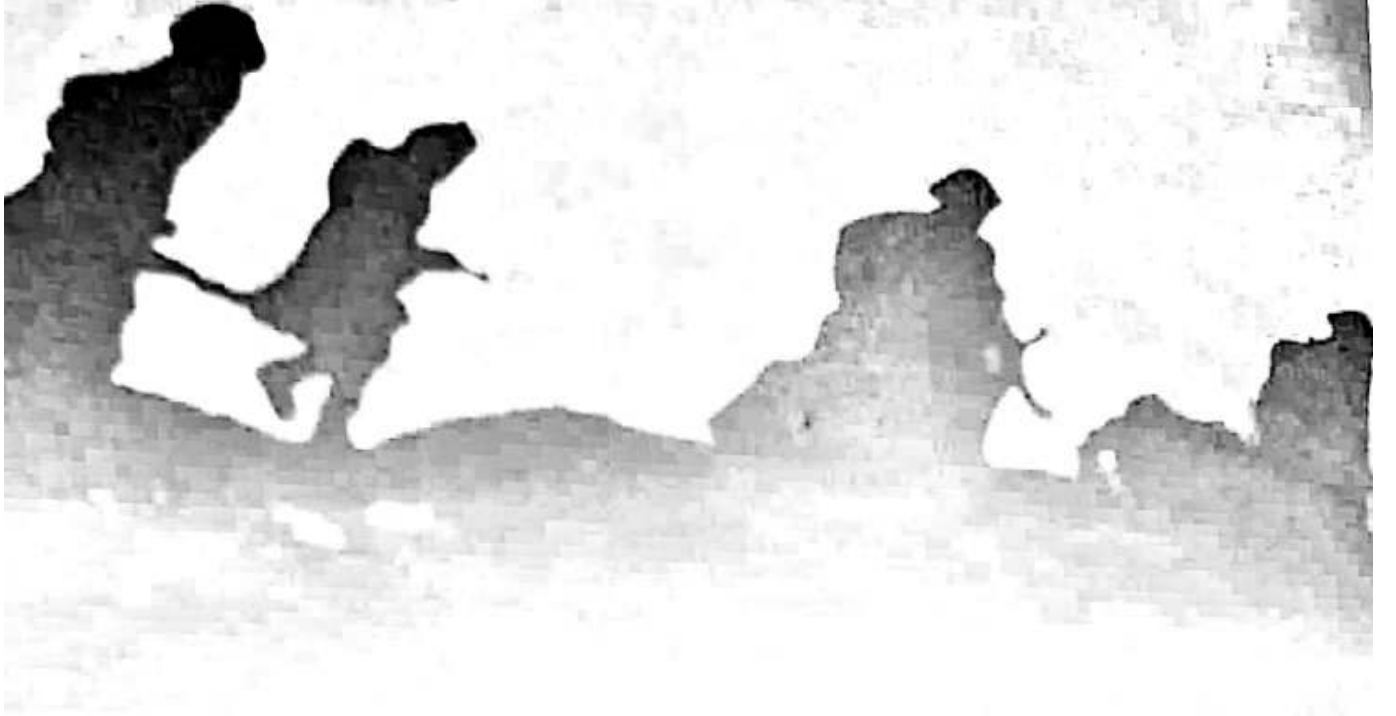
মরুশার্দূল

সেহরা সে সমন্দর তক

মূল	উমর আজ্জাম খোরাসানি
অনুবাদ	ইবনে আবু বকর
সম্পাদক	আবু উসামা
প্রকাশকাল	নভেম্বর ২০২০
স্বত্ব	প্রকাশক
মুদ্রিত মূল্য	৩২০ টাকা মাত্র
প্রকাশক	রেনেসাঁ, ফকিরাপুল, ঢাকা

রেনেসাঁ

প্রকাশকের কথা

তাঁকে নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে আছে নানা কল্পকাহিনি। কিছু সত্য আর কিছু মিশ্রণের মধ্যে আসল সত্যটি বের করা কঠিন। এই গ্রন্থটিতে তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি পাঠ করলে জানতে পারবেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাঁকে কীভাবে আর কী অভিধায় মূল্যায়িত করেছেন। জানতে পারেন তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি কী ছিলেন আর তাঁর অনুপস্থিতিতে কী হতে পারে।

এই মত প্রকাশকারীদের মধ্যে যেমন আছেন রাজনীতিবিদ, আছেন ইতিহাসবিদ, বিশ্লেষক, বিজ্ঞানী, সামরিক বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, শিক্ষার্থী এমনকি সাধারণ মানুষও।

ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীতে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় হাজারো বই রচিত হয়েছে, লাখ লাখ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়েছে; কিন্তু বাংলাভাষায় তাঁকে জানার মতো তেমন কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা-ও অর্ধসত্য বা বানোয়াট কেচ্ছাকাহিনিতে ভরপুর। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এই শূণ্যতা পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অনুবাদকের কথা

> আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত বাকি থাকতেও আমরা বিন লাদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। যদি আফগানিস্তানের সকল ঘর ধ্বংস হয়ে যায়, পাহাড়গুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তবু আমরা তাঁকে কারও হাতে তুলে দেবো না।

উসামা বিন লাদেনকে মার্কিনদের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকির মুখে কথাগুলো বলেছিলেন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহ.।

উসামা বিন লাদেন, একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের গতিপথ পালটে দেওয়া মহানায়ক। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,

> আমরা বিশ্বাস করি, মার্কিনদের পরাজিত করা আল্লাহর জন্য অসম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য এটি হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার চেয়েও সহজ। ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই আমেরিকার পতন হবে। এর জন্য আমার প্রয়োজন নেই। উসামা বিন লাদেন জীবিত থাকুক বা মৃত্যুবরণ করুক, এতে কিছু আসে যায় না।

মহান আল্লাহ তাঁর এই বক্তব্য সত্য করে দেখিয়েছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

রাসুল সা. বলেন,

> আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন, যিনি আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন।

মরুশার্দূল গ্রন্থটি উমর আজ্জাম খোরাসানি রচিত *শহিদ উসামা-সাহরা সে সমন্দর তক* গ্রন্থটির অনুবাদ। শিশুকালের মানসপটের মহানায়কের জীবনী অনুবাদে হাত দিতে পারা নিঃসন্দেহে আমার জন্য পরম আনন্দের। আমি মনে করি, গ্রন্থটি পাঠকের সামনে বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত-সমালোচিত এই মহান ব্যক্তির জীবনের অজানা অধ্যায়গুলো উন্মোচিত করবে এবং তাঁর প্রয়াণ নিজেকে অশ্রুসিক্ত করবে। মহান আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন।

গ্রন্থটির প্রকাশক, সম্পাদক, প্রুফ সমন্বয়কারীসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশে। বিশেষত প্রতিকূল পরিবেশেও গ্রন্থটি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব সবরের সঙ্গে আনজাম দিয়েছেন প্রকাশক মহোদয়। মহান আল্লাহ সবার খিদমাতে ইখলাসের মোড়কে কবুল করুন।

ইবনে আবু বকর
২০.১০.২০২০

মরুশার্দূল গ্রন্থটি উমর আজ্জাম খোরাসানি রচিত *শহিদ উসামা-সাহরা সে সমন্দর তক* গ্রন্থটির অনুবাদ। শিশুকালের মানসপটের মহানায়কের জীবনী অনুবাদে হাত দিতে পারা নিঃসন্দেহে আমার জন্য পরম আনন্দের। আমি মনে করি, গ্রন্থটি পাঠকের সামনে বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত-সমালোচিত এই মহান ব্যক্তির জীবনের অজানা অধ্যায়গুলো উন্মোচিত করবে এবং তাঁর প্রয়াণ নিজেকে অশ্রুসিক্ত করবে। মহান আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন।

গ্রন্থটির প্রকাশক, সম্পাদক, প্রুফ সমন্বয়কারীসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশে। বিশেষত প্রতিকূল পরিবেশেও গ্রন্থটি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব সবরের সঙ্গে আনজাম দিয়েছেন প্রকাশক মহোদয়। মহান আল্লাহ সবার খিদমাতে ইখলাসের মোড়কে কবুল করুন।

ইবনে আবু বকর
২০.১০.২০২০

ধারা বিবরণী

আফগানিস্তানের জিহাদ ও উসামা বিন লাদেন

তৃতীয় অধ্যায়

নাইন ইলেভেন ও বিন লাদেনের বিশ্বব্যাপী পরিচিতি

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোল্লা উমরের প্রতি বিন লাদেনের আনুগত্যের

লিখিত প্রমাণ

প্রতি,

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর,

আল্লাহ আপনাকে সদ্য উত্তরাঞ্চলে বিজয় দান করেছেন। এটি আমাদের জন্য পরম আনন্দের। জমিন থেকে ফ্যাসাদের মূলোৎপাটন ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ করছি। আপনার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি—আল্লাহর বাণী সমুন্নত এবং ইসলামি হুকুমত সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমি আবারও এই প্রতিজ্ঞার নবায়ন করছি যে, আপনি আমাদের যথাযথ আমির। শরিয়তস্বীকৃত শাসক হিশেবে আপনার শাসন মান্য করা ও আপনার সহযোগিতা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আমি সকল মুসলমানকে যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতা ও সমর্থনের অনুরোধ করছি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ইতি,

আপনাদের ভাই—

উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন

প্রথম অধ্যায়

মুখবন্ধ

মাহদির অগ্রবাহিনীর সিপাহসালার

শহিদ উসামা বিন লাদেন

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ। ফজরের পূর্বমুহূর্ত। বিত্তশালী পরিবারের এক আরব-শিশু ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে তার পিতাকে। অতঃপর বলে,

—আব্বাজান আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।

পিতা ভাবছিলেন ছেলে হয়তো ভয়ংকর কোনো স্বপ্ন দেখেছে। তাই অজু করে তাকে নিয়ে মসজিদের রাস্তা ধরেন। পথে ছেলে তার পিতাকে বলে, আব্বা, আমি স্বপ্নে দেখি এক প্রশস্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। আচমকা সাদা অশ্বারোহী একটি বাহিনী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বাহিনীর জ্বলজ্বলে চোখের অধিকারী জনৈক অশ্বারোহী আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি উসামা বিন লাদেন?' আমি বলি, 'হ্যাঁ।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি উসামা বিন লাদেন?' এবারও আমি 'হ্যাঁ' বলি। অশ্বারোহী ফের প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি উসামা বিন লাদেন?' উত্তরে আমি বলি, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমিই উসামা বিন লাদেন।' অতঃপর তিনি আমার দিকে একটি পতাকা বাড়িয়ে ধরে বলেন, 'পতাকাটি মসজিদে আকসার দরজায়, ইমাম মাহদি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে দেবে।' আমি পতাকাটি হাতে নিই। অতঃপর দেখতে পাই সে বাহিনী আমার পেছন পেছন যাত্রা শুরু করছে।

পিতা স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরে ব্যস্ততার দরুন তিনি স্বপ্নের কথা ভুলে যান। পরদিন ভোরে সে পিতাকে জাগিয়ে একই স্বপ্ন শোনায়। তৃতীয় দিনও সে একই স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলে বলে। পিতা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে তাকে নিয়ে জনৈক আলিমের কাছে চলে যান।

আলিম স্বপ্নের বিবরণ শুনে শিশুটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ শিশুটিই কি স্বপ্ন দেখেছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' এবার আলিম তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বেটা, সাদা অশ্বারোহী তোমাকে যে পতাকা দিয়েছিল সেই পতাকার স্বরূপ কী?' সে বলে, 'স্মরণ আছে।' এবার আলিম তাকে জিজ্ঞেস করেন, পতাকাটি কেমন ছিল?' বালক বলে, 'পতাকাটি সৌদিআরবের পতাকার মতোই ছিল, তবে তার রং সবুজ ছিল না, ছিল কৃষ্ণবর্ণের।' আলিম জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কখনো স্বপ্নে নিজেকে লড়াই করতে দেখেছ?' উত্তরে সে বলে, 'জি, প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখি।' এবার আলিম তাকে বাইরে যেতে বলে তার পিতার দিকে মনোযোগী হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের পূর্বপুরুষ কোথায় বসবাস করতেন?' তিনি বলেন, 'আমরা ইয়ামেনের হাজরামাওত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলাম।' আলিম বলেন, 'আপনাদের গোত্রের ব্যাপারে বলুন।' তিনি বলেন, 'আমরা ইয়ামেনের শানুআহ গোত্রভুক্ত; আর শানুআহ হচ্ছে কাহতান গোত্রের শাখাগোত্র।'

আলিম তখন জোরে তাকবির-ধ্বনি দিয়ে শিশুটিকে ডেকে আনেন। তারপর তার কপালে চুমু খেয়ে বলেন, 'কিয়ামতের আলামতসমূহ নিকটবর্তী হয়েছে। হে মুহাম্মাদ বিন লাদেন, আপনার এই ছেলে ইমাম মাহদির জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবে এবং নিজের দীনের হিফাজতের জন্য খোরাসান-ভূমিতে হিজরত করবে। সৌভাগ্য তাঁদের, যাঁরা তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবে। হতভাগা তারা, যারা তাকে ছেড়ে দেবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।'

মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সেই শিশুপুত্রকেই আজ পুরো বিশ্ববাসী *তানজিম আল কায়িদাতুল জিহাদ*-এর প্রধান শায়খ উসামা বিন লাদেন নামে চেনে। এই মহান মুজাহিদ দীনের হিফাজতের লক্ষ্যে আক্ষরিক অর্থেই হিজরত করেছেন; বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। জিহাদের জন্য নিজের রক্ত ও ধনসম্পদ ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেছেন। পেছনে রেখে গেছেন এমন এক বাহিনী, যারা পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে দাজ্জালের সহযোগী খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের আতঙ্কিত করে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

বিগত সহস্র বছরে মুসলমানদের মধ্যে শুধু এমন দুজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা নিজেদের সময়ের সুপার পাওয়ারকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। একজন জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম, অপরজন উসামা বিন লাদেন।

জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম চেঙ্গিস খান এবং তাতারদের আগ্রাসনের যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তৎকালের বিশ্ব-পরাশক্তি চেঙ্গিস খান, যার সামরিক শক্তি ছিল অসীম।

তাতাররা খুব সাহসী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল না; কিন্তু অসাধারণ সমরকৌশল তাদের পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল। শক্তি ও উন্মাদনার পৈশাচিক প্রয়োগ তাদের অজেয় করে তুলছিল। বিপক্ষদলের ৫-১০লাখ সৈন্যের বাহিনী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা তছনছ করে দিত। যুদ্ধের শুরুতে প্রথমে তারা শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করে তাদের তছনছ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যেত; আবার ফিরে এসে অবশিষ্ট জীবিত সৈন্যদের শেষ করে দিত।

চেঙ্গিস খানের এ সমরকৌশল ও সামরিক শক্তির ফলে সাধারণত বিপক্ষশক্তি যুদ্ধের আগেই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করত। তার সেনাবাহিনী শহরে এসে হানা দিলে শহরের নেতৃবৃন্দ তার হাতে শহরের কর্তৃত্বভার তুলে দিয়ে নিজেরা তার স্বেচ্ছাসেবকে পরিণত হতো।

সেই ভয়াবহ সময়ে জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়া আদায় করতে ইসলামের ইতিহাসে ধূমকেতুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জালালুদ্দিন কোনো সম্রাট ছিলেন না—তিনি খাওয়ারিজম শহরের একজন শাহজাদামাত্র ছিলেন। চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধে শাসকের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে নিজে পিতা থেকে আলাদা হয়ে যান। সরকারি সহযোগিতা ব্যতীত কেবল নিজের বীরত্ব ও যোগ্যতাবলেই তিনি খানকে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেছিলেন। একাধিক যুদ্ধে তিনি খানকে পরাজিত করেন। একপর্যায়ে বাগদাদের খলিফার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে খলিফা তাঁকে ১ লাখ সৈন্যের বাহিনী দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

এ দিকে খানের দূত বাদশাহকে খানের শক্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে। তার প্রতিনিধি বাদশাহকে বলেছিল, 'জালালুদ্দিন তো একজন সন্ত্রাসবাদী। তার নিজস্ব কোনো ঠিকানা নেই। সে বাগদাদকে খানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে নিজে বাগদাদের খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।'

শেষপর্যন্ত বাগদাদের খলিফা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও জালালুদ্দিনকে সাহায্য পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান; অথচ বাস্তবে বাগদাদে খানের সেনাবাহিনীর আগ্রাসনের সর্বশেষ দেয়াল ছিলেন এই জালালুদ্দিন। এই দেয়াল সরে যেতেই তাতাররা বাগদাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংসতার ইতিহাস রচনা করে।

উসামা বিন লাদেন। তিনি এমন দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়েছিলেন, যা হয়তো কোনো রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য বা কোনো জাতির কাঁধে জমা পড়েছিল। এ দিক থেকে তাঁর উদাহরণ জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমের মতো। পার্থক্য শুধু এই—জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে ছিল খানের অজেয় সৈন্যবাহিনী; আর বিন লাদেনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা ও

ইউরোপীয় জোট, যে আমেরিকা ও ইউরোপের সামরিক শক্তি খানের সামরিক শক্তির চেয়ে বহুগুণে বেশি। শুধু তা-ই নয়, খান ছিল একটি আঞ্চলিক শক্তি। অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকা বিশ্ব-পরাশক্তি। খানের কাছ থেকে বেঁচে যাওয়া ছিল খুবই সহজ; কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের নাগাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। খানের নাগাল এড়িয়ে সারা জীবন লুকিয়ে থাকা ছিল খুবই সম্ভব; কিন্তু আমেরিকা-ইউরোপের হাত থেকে নিরাপদে থাকা প্রায় অসম্ভব। তথাপি বিন লাদেন তাগুতি শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে ২০ বছরের অধিক টিকে ছিলেন, যা শুধু আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমা-শক্তিকে বিন লাদেনের চ্যালেঞ্জ ব্যক্তিগত কোনো কারণে ছিল না; এটি ছিল ইসলামের পক্ষ থেকে একজন মুমিনের মধ্যে সঞ্চারিত শক্তি ও সাহসের বহিঃপ্রকাশমাত্র।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিজীবনে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন এনে দেয়। স্বাভাবিক জীবনে দেখা যায় মৃত্যু মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়; কিন্তু ইসলাম মানুষকে মৃত্যুর পেছনে দৌড়ানোর সাহস যোগায়। বিন লাদেনের ১৯৭৯-২০১১ জীবনকাল এই বাস্তবতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

পারভেজ মোশাররফ পৃথিবীর ইতিহাসের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর মুসলিম রাষ্ট্র ও সপ্তম শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ১৭ কোটি নাগরিকের সর্বাধিনায়ক আমেরিকার একটিমাত্র ফোনকল পেয়ে তিনি তার পুরো রাষ্ট্র আমেরিকার হাতে তুলে দেন। বিপরীতে বিন লাদেন শুধু একজন ব্যক্তি—যিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানই নয়; পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়া আদায় করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামের সৌন্দর্য ও গৌরব নিজস্ব শক্তিতেই আবির্ভূত হয়; এর প্রকাশে কোনো রাষ্ট্র বা রাজ্যের প্রয়োজন হয় না।

বিন লাদেনের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—তিনি বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি জিহাদকে মার্কিন প্রভাবমুক্ত করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদ বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু এই জিহাদের ব্যাপারে একটা বহুল কথিত তথ্য হলো, এটি আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল, যা ইসলামি জিহাদকে আমেরিকান বলয়ে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এটা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের জন্যই নয়; পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্য বড় একটি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিন লাদেন আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করে জিহাদকে আমেরিকান বলয় থেকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে

মুসলমানরা মার্কিন সামরিক শক্তি ও ডলারের প্রভাবে বিজয়ী হননি, তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন মুসলমানদের জিহাদি মানসিকতা ও শাহাদাতের তীব্র বাসনার কারণে। মুসলমানরা নিজেদের ইমানি শক্তিতে এই অবদান পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম। আফগানিস্তানে আমেরিকা ও তার সহযোগীদের পরাজয় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমেরিকা বিন লাদেনের মাথার মূল্য নির্ধারণ করেছিল ৫ কোটি ডলার। বস্তুত এটা তাঁর একটি পশমের মূল্যও নয়। কেননা, তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি। আল্লামা ইকবালের কবিতার মর্ম অনুযায়ী প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহ.। আল্লামা ইকবাল বলেন,

> *যদি রাজ্যও হাত থেকে চলে যায়, তো যেতে দাও; তবু আল্লাহর বিধানের অন্যথা করো না।*

এটি ছিল পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের কবিতা। পাকিস্তান তাঁর এই কবিতার আবেদন বাস্তবায়ন করতে না পারলেও মোল্লা উমর রাহ. তার যথার্থ বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি রাজ্য এবং রাজত্ব উৎসর্গ করেছেন; কিন্তু আমেরিকার দাবির মুখে বিন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি।

মোল্লা উমর এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন; কিন্তু এর মৌলিক কৃতিত্ব ছিল বিন লাদেনের। পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলে হয়তো এমন মানুষ পাওয়া যাবে না, যার জন্য কোনো সাম্রাজ্য উৎসর্গ করা হয়েছিল।

বিন লাদেনের মূল্য সম্পর্কে ধারণা পেতে এ কথাও মনে রাখা উচিত, তাঁর জন্য উৎসর্গকৃত আফগানিস্তান সাধারণ কোনো সাম্রাজ্য নয়; এটি এমন এক রাষ্ট্র, যা বিগত ৩০ বছরে দুটি বিশ্ব-পরাশক্তিকে পরাজিত করার গৌরব বহন করছিল। মোল্লা উমর হকের পক্ষাবলম্বন করে বিন লাদেনের জন্য এমন মূল্যবান সাম্রাজ্য উৎসর্গ করতেও পিছপা হননি। বস্তুত, সেটা ব্যক্তি বিন লাদেনের মূল্য নয়, নিঃসন্দেহে তা একজন মুমিনের জীবনের মূল্য, যে সত্যিকার মুমিন ব্যক্তি বিন লাদেনের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে। রাতের অন্ধকারে তিনটি মার্কিন হেলিকপ্টার অ্যাবোটাবাদের বেলাল টাউনে উড়ে আসে। একটি হেলিকপ্টার থেকে মার্কিন মেরিন নেভি সিল বিন লাদেনের ভবনে অবতরণ করে। তাঁর দেহরক্ষীরা মার্কিন কমান্ডোদের লক্ষ করে ফায়ারিং করে। এতে একাধিক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। মুজাহিদদের আক্রমণে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়। বিন লাদেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও তাঁর সন্তান

খালিদ বিন লাদেন কমান্ডোদের মোকাবিলা করে শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন। মার্কিন সেনারা বিন লাদেনের ঘরের উপরতলায় যায়। সেখানে তিনি সপরিবারে বসবাস করছিলেন। মার্কিন কমান্ডোদের গুলিতে তাঁর এক স্ত্রী শাহাদাতবরণ করেন।

শায়খ উসামা বিন লাদেন মার্কিনদের হাতে ধরা দেওয়ার পরিবর্তে নিজের গায়ের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাঘের মতো মোকাবিলা করেন। তাঁর আক্রমণে কয়েকজন মার্কিন সেনা মৃত্যুবরণ করে এবং শেষপর্যন্ত শায়খ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

তাঁর পুত্র হামজা বিন লাদেন সেখান থেকে কোনোভাবে নিরাপদে সরে পড়তে সক্ষম হন। তাঁর দুই স্ত্রী, মেয়ে সাফিয়া ও অন্যান্য পরিজনকে পাকিস্তানবাহিনী গ্রেপ্তার করে। শায়খ উসামা বিন লাদেনের পরিজনদের কারামুক্ত করা উম্মাহর উপর ফরজ। তাদের দেখাশোনা ও হিফাজত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্যকর্তব্য।

শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাত এক যুগের সমাপ্তি ও নতুন যুগের সূচনা। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম থেকে শুরু হওয়া যুগের সমাপ্তি ঘটে শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের মাধ্যমে। এ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তিন প্রজন্মের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। জিহাদের ময়দানে এমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, যার দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিরল। আল্লাহ তাঁকে অন্যান্য সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। আল্লাহর রাহে খরচের তীব্র স্পৃহা, খোদাভীরুতা, সাহসিকতা ও তাঁর দীনকে সমুন্নত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তাঁকে দান করেছিলেন।

একদিকে তিনি যেমন হারামাইনে কাফির দখলদারত্বের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, তেমনি অসহায় ফিলিস্তিনি, মসজিদে আকসার স্বাধীনতা, কসোভো, চেচনিয়া ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতাকামীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এভাবেই তিনি উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বমানবতার মডেলে পরিণত হন। মুসলিমবিশ্বে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য তিনি মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতাকে দায়ী করতেন। আমেরিকাকে ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক মনে করতেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, মুসলিমবিশ্বকে মার্কিন প্রভাবমুক্ত করতে ও মুসলিমবিদ্বেষী নীতি থেকে মুক্তি দিতে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে মার্কিনদের পঙ্গু করে দেওয়ার বিকল্প নেই।

নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর ক্ষুব্ধ আমেরিকা নিজেদের দলবল নিয়ে আফগানিস্তানের ওপর হামলা করে; কিন্তু ভুলেও কল্পনা করেনি যে, বিন লাদেনের ফাঁদেই তারা আটকা পড়ে গেছে—যেখান থেকে কোনো শিকারই মৃত্যু ছাড়া বের হওয়ার পথ খুঁজে পায় না। এখন তারা মরিয়া হয়ে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজছে; কিন্তু সম্মানজনক কোনো রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না। যদিও নাইন ইলেভেনের ঘটনার বহু আগে থেকেই

তিনি মোস্ট ওয়ান্টেড তকমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর মার্কিনরা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। দীর্ঘ ১০ বছর আফগানিস্তানের অলিগলিতে খুঁজেও শেষতক ব্যর্থ হয়।

বিন লাদেন এই পৃথিবীতে নেই। তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের আলোকে শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তবে এ কথাও সত্য যে, তাঁর জিহাদের আহ্বান এখনো শাশ্বত। তাঁর আহ্বানে স্বাধীনতা ও শান্তিকামীরা নিয়ত জিহাদের ময়দানে যাত্রা করছেন। তিনি জীবিতকালে জিহাদি দাওয়াতের মূর্তপ্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পরেও তিনি মার্কিন ও তাদের মিত্রজোটের চোখের কাঁটা হয়ে আছেন। অ্যাবোটাবাদে প্রবাহিত তাঁর পবিত্র রক্ত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সুবাসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

পাঠক! শায়খ উসমা বিন লাদেনের জীবনী-সংক্রান্ত অন্য গ্রন্থের তুলনায় এটিতে ভিন্ন ধরনের তথ্য পাবেন। এটি রচনাকালে এ সংক্রান্ত আরও প্রায় তিনটি বই বাজারে এসেছে, যেগুলোর কোনোটায় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আঙুল তোলা হয়েছে। কেউ রূপকথার প্লট সাজিয়েছেন। কেউ আবার অ্যাবোটাবাদের অপারেশনকে নাটক প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে সিআইএর এজেন্ট হিশেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এ পরিস্থিতিতে পাঠকের সামনে তাঁর জীবনের সত্য তথ্যগুলো তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। গ্রন্থটিতে আমরা তাঁর ব্যাপারে পাকিস্তানের আলিমগণের বিভিন্ন মন্তব্য তুলে ধরেছি।

এ ছাড়াও বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন ব্যক্তি, এমনকি অনেক খ্রিষ্টান লেখকের মতামতও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বস্তুত এ বইটিতে জাজিরাতুল আরবে জন্ম নেওয়া ও আরবসাগরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবনকালের সত্য ঘটনাপ্রবাহ পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন মন্তব্য তুলে ধরতে বিভিন্ন মতবাদের আলিম ও রাজনীতিবিদের নাম চলে এসেছে—পাঠক এতে রাজনৈতিক মতাদর্শ খোঁজার চেষ্টা করবেন না বলে আশা রাখি। আসলে সব মতবাদ ও মাজহাবের লোকেরাই তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করতেন বিধায় সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন।

আল্লাহ এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

উমর আজ্জাম খোরাসানি

২ আগস্ট ২০১১

মুসলিম উম্মাহর প্রতি

উসামা বিন লাদেনের শেষ বার্তা

আরববিশ্বে নতুন বিপ্লবের (আরব বসন্ত) পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহর প্রতি শায়খ উসামা বিন লাদেনের বার্তা।

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছেই উত্তম পরিণামের প্রত্যাশা রাখি। আমরা নিজেদের আত্মার কুমন্ত্রণা এবং নিজেদের সকল মন্দ কাজ থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে না। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ

আজ আমরা মুসলিমবিশ্বে ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণে অবস্থান করছি। সকল আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও আবেগে আমিও আপনাদের সঙ্গে অবস্থান করছি। আপনাদের আনন্দেই আমার আনন্দ এবং আপনাদের কষ্টে আমি কষ্ট অনুভব করি। বিপ্লবের সফলতায় আপনাদের মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের শহিদদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন। আহতদের আশু রোগমুক্তি দান করুন। শত্রুর হাতে বন্দিদের দ্রুত কারামুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

> *ইসলামি বীরসেনানীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়েছে, আরববিশ্বের স্বৈরাচারী শাসকরা ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে।*
>
> *তারা তাদের ক্ষমতার মসনদ গুটিয়ে নিচ্ছে; আর শুভসংবাদের হাতছানি যেন আমাদের ডাকছে।*

পূর্ব দিক থেকে আসা সেই বিজয়ের পূর্ব-লক্ষণগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করেছে, যে বিজয়ের জন্য পুরো মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে ঘটেছে আশ্চর্যজনক আরেক ঘটনা। পশ্চিম আকাশে উদিত হয়েছে বিপ্লবের এক জ্বলন্ত সূর্য। তিউনিসিয়া থেকে উদ্দীপ্ত এ সূর্যালোক যখন উম্মাহর চোখে পড়েছে, এতে তারা পেয়েছে স্বস্তি। আনন্দের আভা ঠিকরে পড়েছে সকলের চেহারায়। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছে স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দ। হতভাগা ইহুদিরা ভবিষ্যৎশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। তাগুতের পতনে মুসলমানদের ওপর আপতিত বিপদাপদ ও দাসত্বের শৃঙ্খল দিন দিন ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা অতীতের অনুপ্রেরণায় আজাদি, সম্মান ও বীরত্বের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাগুতের দাসত্ব থেকে মুক্তির স্পৃহা পরিবর্তনের পালে বাতাস দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রপথিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তিউনিসিয়া। বিপ্লবের ঘূর্ণিবায়ু মিসরবাসীকে তাহরির স্কয়ারে এনে দাঁড় করিয়েছে, যা জন্ম দিয়েছে এক নতুন বিপ্লবের, যে বিপ্লব মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরতে শেখাচ্ছে।

এসেছে এক নতুন বিপ্লব। যে বিপ্লব খাদ্য ও পোশাকের বিপ্লব নয়; আত্মমর্যাদাবোধ ও সম্মানের ইনকিলাব, যা নীলনদের শহর ও গ্রামসমূহে আশার আলোর সঞ্চার করছে। মুসলিম উম্মাহর কাছে তাঁদের অতীতের বীরত্বগাথা নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা কায়রোর তাহরির স্কয়ারে অত্যাচারী শাসকদের পতন নিশ্চিত করতে অবিচল অবস্থান করছেন। বাতিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান করছেন। তাঁরা শাসকদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত নন। যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন তা পূরণ করে দেখিয়েছেন তাঁরা। ধীরে ধীরে তাঁদের সাহসিকতা ও শক্তির পারদ ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে।

হে আজাদির অগ্রদূতেরা

বিজয়ের পথে কখনো বিরতি নেওয়ার সুযোগ নেই। যুদ্ধের ময়দানে আলোচনার ফাঁদে পা দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হক-বাতিলের কঠিন লড়াইয়ের মাঝে কখনো পরামর্শের চিন্তাও করতে নেই। মনে রাখবেন, এসব বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। এ বিজয়ের সুফল আপনারাই ভোগ করবেন। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হবে আপনার হাতে। উম্মাহ আপনাদের এই বিজয়গাথা সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখবে। তাই উঠুন এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত না হয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যান।

লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে পারে।

আর স্বাধীন-সচেতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন সে ক্লান্ত হয় না, কখনো থেমে যায় না।

আল্লাহর তাওফিক ও অনুগ্রহে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত এ কাফেলা থেমে যাবে না। আরববিশ্বের পরিবর্তন এ বিজয়ের মাইলফলক হিশেবে বিবেচিত হবে। এ বিপ্লব মাজলুম অসহায়দের স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু হিশেবে কাজ করবে। আপনারা যারা উম্মাহর অনেক বড় বিপদ দূর করেছেন, আল্লাহ আপনাদের বিপদাপদ দূর করবেন। আপনারা আজ উম্মাহর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু, আল্লাহ আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করবেন।

তোমরা এমন রাতের মুসাফির, যারা নিরাশার অন্ধকারে দলবেঁধে সকালের সূর্যোদয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ।

রক্তের বিনিময়েই হারানো সম্মান খুঁজে পাওয়া যায়, সিংহ তার শাবকের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

যে নিজের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন এবং বাতিল প্রতিহত করতে জীবনবাজি রাখে, সে কি নিন্দিত হবে?

হে উম্মাহর সিংহ শার্দূলেরা

তোমাদের সামনে এক দিকে যেমন অপেক্ষা করছে বিপৎসংকুল রাস্তা, তেমনই উম্মাহর এই জাগরণকে পুঁজি করে অপেক্ষা করছে খোদাদ্রোহী তাগুতি শাসক, তাদের ইসলামবিদ্বেষী আইনকানুন ও খ্রিষ্টবাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামি ও গর্হিত পাপ। পুরো মুসলিম জাতি কয়েক দশক ধরে এই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করছিল। তাই এই সুযোগকে গনিমত হিশেবে গ্রহণ করে স্বৈরাচারী দানবদের ধ্বংস করে ইনসাফ-প্রতিষ্ঠার কাজে অবিচল থাকুন।

আমি একনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এমন শাসনব্যবস্থার কথা, যেখানে সাধারণ মুসলমানদের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এটিই শরিয়তের নির্দেশ। এমন শাসনব্যবস্থা সে-সকল সম্মানিত মানুষের জন্য আরও বেশি জরুরি, যাঁরা বহু আগে থেকেই অত্যাচারীর শাসনব্যবস্থা সমূলে উৎখাতের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, যাদের ওপর রয়েছে সাধারণ মুসলমানের অগাধ আস্থা-বিশ্বাস।

অত্যাচারী শাসকদের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে এখনই ইসলামি শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অতি দ্রুত এ পরিকল্পনা সফল করতে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি বের করতে হবে। পাশাপাশি এমন প্রজন্মের ধারাবাহিক উপস্থিতি প্রয়োজন, যারা এ শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখবে। চতুর্মুখী এমনসব কর্মপদ্ধতি চালিয়ে যাবে, যা দ্বারা উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান করা যাবে। সঠিক মেধা যাচাই করে উম্মাহর প্রয়োজনে কাজে লাগাবে। যেকোনো বিষয়ের প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞদের মেধা-মনন যেন জাতির উপকারে লাগানো যায়, যাতে এমন লোকদের সাহায্য করা যায়, যারা উম্মাহর ওপর চেপে বসা তাগুতি শক্তিসমূহকে সমূলে ধ্বংস করতে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করছেন, যারা বাতিলের আগ্রাসনের শিকার হচ্ছেন। এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে কয়েক দশক ধরে উম্মাহর ওপর চেপে থাকা স্বৈরাচারী দানবদের আগ্রাসন থেকে উম্মাহকে মুক্তি দিয়ে বিপ্লবের ফসল ঘরে তোলা যায়। বিপ্লবকে দেওয়া যায় তার কাঙ্ক্ষিত দিশা।

যেসব অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এখনো জাগরণ তৈরি হয়নি, ঠিক এভাবে তাঁদের জাগরূক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। সেখানে পরিবর্তন ও বিপ্লবের ধারাবাহিকতা শুরু করা এবং এর প্রারম্ভিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেওয়া উচিত। কেননা, সময়মতো পদক্ষেপ নিতে না পারলে বহু সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার পূর্ণ প্রস্তুতি ও উপযুক্ত সময়ের পূর্বে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

ইনশাআল্লাহ বিপ্লবের এ তুফান পুরো মুসলিমবিশ্বকে নিজের করায়ত্তে নিয়ে নেবে। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী যুবকদের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা উচিত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি।

> *বীরপুরুষদের বীরত্ব-প্রদর্শনের পূর্বে বিজ্ঞজনদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, বুদ্ধিমত্তার পরেই সাহসিকতার সুফল অর্জিত হয়।*

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ

আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি কয়েক বছর পূর্বের বিভিন্ন বিপ্লবের কথা, যা মানুষদের সীমাহীন আনন্দিত করেছিল। কিছুদিন পরেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয় এবং ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। তাই বর্তমানের বিপ্লবসমূহ পথভ্রষ্ট ও নিষ্ফল হওয়া থেকে বাঁচাতে সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাগুতের হাত থেকে মুক্তি ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহের বেশি বেশি আলোচনা করা জরুরি। বিশেষত

ইসলামের প্রথম বিধান তাওহিদ তথা একত্ববাদের বোধ তৈরি করা। এ বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সাইয়িদ কুতুব শহিদের লেখা *মাফাহিমু ইয়ানবাগী আন তুসাহহাহা* অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম এসব ব্যাপারে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস আমাদের ওপর চেপে বসেছে। এ ছাড়া স্বৈরাচারী শাসকরা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এসব মতবাদ আমাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছে। এটা তিক্ত বাস্তবতা। উম্মাহর ওপর আপতিত অন্য সকল বিপদাপদ শুধু এর প্রতিফলন।

পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সভ্যতার ফল অত্যন্ত ভয়ানক। যে কারণে আজ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অপমান ও অসহায়ত্ব এখন আমাদের জড়িয়ে রেখেছে। নিজেদের ওপর চেপে বসা শাসকদের দাসত্ব মূলত আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও উপাসনার সমার্থক।

নিজেদের ইহ-পরকালের যাবতীয় অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তা ভুলে গিয়ে এ সকল শাসকের উপাসনাকে নিজেদের সফলতা হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত এসব মতবাদ একজন মানুষের মানবিক অধিকার ছিনিয়ে তাকে পশুতে পরিণত করে। ফলে আত্মমর্যাদা বিলীন করে শাসকের মনস্কামনা পূরণে নির্দ্বিধায় নিজেকে বিকিয়ে দেয় সে। শাসকের খোশামোদে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। নিজের ব্যক্তিত্বের বাইরে তার দ্বৈতসত্তা তৈরি হয়। আমাদের সমাজে এ ধরনের মানুষ অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়। শাসকবর্গ এ ধরনের মানুষকে নিজেদের স্বার্থে রাস্তায় নিয়ে আসে। তারা শাসকদের পক্ষে মিছিল দেয়। শাসকদের রক্ষা করতে বিভিন্ন মোর্চা ও আন্দোলনের আয়োজন করে।

এ ধরনের শাসকরা চায়, মানুষ যেন আল্লাহপ্রদত্ত নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলো ভুলে যায়। এ জন্য তারা মানুষের স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়। সকল ক্ষেত্রে তাদের অধিকারগুলো সীমিত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে, যা তাদের যেকোনো হস্তক্ষেপকে আইনি বৈধতা দিয়ে দেয়। তাদের কূটকৌশল মানুষের চোখে পর্দা বেঁধে দেয়, চিন্তাচেতনা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। উন্নত লক্ষ্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-জাতীয় শব্দগুলো তাদের অপরিচিত করে তোলে। ধীরে ধীরে তারা শাসকদের পূজা শুরু করে। অতঃপর মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদের এই মন্দ কাজগুলোকে কখনো ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়; আবার কখনো দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের নামে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন মানুষ এগুলোর সম্মান করে। এসব চেতনা নিজেদের মধ্যে লালন করে এবং জাতির

ইসলামের প্রথম বিধান তাওহিদ তথা একত্ববাদের বোধ তৈরি করা। এ বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সাইয়িদ কুতুব শহিদের লেখা *মাফাহিমু ইয়ানবাগী আন তুসাহহাহা* অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম এসব ব্যাপারে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস আমাদের ওপর চেপে বসেছে। এ ছাড়া স্বৈরাচারী শাসকরা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এসব মতবাদ আমাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছে। এটা তিক্ত বাস্তবতা। উম্মাহর ওপর আপতিত অন্য সকল বিপদাপদ শুধু এর প্রতিফলন।

পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সভ্যতার ফল অত্যন্ত ভয়ানক। যে কারণে আজ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অপমান ও অসহায়ত্ব এখন আমাদের জড়িয়ে রেখেছে। নিজেদের ওপর চেপে বসা শাসকদের দাসত্ব মূলত আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারও উপাসনার সমার্থক।

নিজেদের ইহ-পরকালের যাবতীয় অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তা ভুলে গিয়ে এ সকল শাসকের উপাসনাকে নিজেদের সফলতা হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত এসব মতবাদ একজন মানুষের মানবিক অধিকার ছিনিয়ে তাকে পশুতে পরিণত করে। ফলে আত্মমর্যাদা বিলীন করে শাসকের মনস্কামনা পূরণে নির্দ্বিধায় নিজেকে বিকিয়ে দেয় সে। শাসকের খোশামোদে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। নিজের ব্যক্তিত্বের বাইরে তার দ্বৈতসত্ত্বা তৈরি হয়। আমাদের সমাজে এ ধরনের মানুষ অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়। শাসকবর্গ এ ধরনের মানুষকে নিজেদের স্বার্থে রাস্তায় নিয়ে আসে। তারা শাসকদের পক্ষে মিছিল দেয়। শাসকদের রক্ষা করতে বিভিন্ন মোর্চা ও আন্দোলনের আয়োজন করে।

এ ধরনের শাসকরা চায়, মানুষ যেন আল্লাহপ্রদত্ত নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলো ভুলে যায়। এ জন্য তারা মানুষের স্বাধীন চিন্তাভাবনার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়। সকল ক্ষেত্রে তাদের অধিকারগুলো সীমিত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে, যা তাদের যেকোনো হস্তক্ষেপকে আইনি বৈধতা দিয়ে দেয়। তাদের কূটকৌশল মানুষের চোখে পর্দা বেঁধে দেয়, চিন্তাচেতনা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। উন্নত লক্ষ্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-জাতীয় শব্দগুলো তাদের অপরিচিত করে তোলে। ধীরে ধীরে তারা শাসকদের পূজা শুরু করে। অতঃপর মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদের এই মন্দ কাজগুলোকে কখনো ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়; আবার কখনো দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের নামে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন মানুষ এগুলোর সম্মান করে। এসব চেতনা নিজেদের মধ্যে লালন করে এবং জাতির

বুদ্ধিজীবীরা যেন এ সবকে পবিত্র হিশেবে প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি অল্পবয়স্ক তরুণ-যুবকরা পর্যন্ত এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। স্রষ্টাপ্রদত্ত তাদের স্বাধীন চিন্তাভাবনার ক্ষমতা বিলীন হয়ে ধীরে ধীরে পরাধীনতার অনুভূতি নিয়ে প্রতিপালিত হতে থাকে। একদিকে শাসকদের অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যেতে থাকে; আর অন্যদিকে মানুষের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাও আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এখন আর কীসের অপেক্ষা? নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা করুন। এখনই সুবর্ণ সুযোগ। বিশেষত উম্মাহর যুবপ্রজন্ম এখন বিপ্লবের কঠিন দায়িত্ব পালন করছে। তাগুতি শক্তির অত্যাচার-নিপীড়নের মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা তাদের আত্মা বিসর্জন দিয়ে আমাদের পথ সমতল করে দিয়েছে। তারা নিজেদের রক্তের নাজরানায় তাগুতের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে দিয়েছে। জীবনের সোনালি অধ্যায়ে এই যুবকেরা অত্যাচার-নিপীড়নের দুনিয়াকে তালাক দিয়ে সম্মান ও মর্যাদার কবরের সঙ্গে নিজেদের বন্ধন তৈরি করেছে। অত্যাচারী শাসকদের কি এই অনুভূতি তৈরি হয়েছে? বর্তমানে সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে? ইনশাআল্লাহ সকল প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তারা আর ঘরে ফিরে যাবে না।

শেষপর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রসমূহে সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়নের সব সীমা অতিক্রম করছে; অথচ আমরা তা প্রতিহত করতে বেশ দেরি করে ফেলেছি। সুতরাং এখন যে বিপ্লব শুরু হয়েছে, তা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছা দরকার। আল্লাহ অবশ্যই সহযোগিতা করবেন। আর যারা এখনো এতে অংশ নিতে পারেননি, তারা যেন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করে নেন। রাসুল সা. বলেন,

> আমার পূর্বে আল্লাহ তাআলা যে নবিকে কোনো উম্মতের মধ্যে পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে তাঁর জন্য একদল অনুসারী ও সাহাবি ছিল। তারা তাঁর সুন্নাতকে সমুন্নত রাখত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের অবর্তমানে কতগুলো মন্দ লোক স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা মুখে যা বলে নিজেরা তা করে না; আর যা করে তার জন্য তাদের নির্দেশ করা হয়নি। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের হাত (শক্তি) দ্বারা মোকাবিলা করবে, সে মুমিন। যে জিহ্বা (মুখ) দ্বারা মোকাবিলা করবে, সে মুমিন এবং যে অন্তর দ্বারা মোকাবিলা করবে, সে-ও মুমিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ইমানের স্তর নেই।

রাসুল সা. অন্যত্র বলেন,

> উম্মতের শহিদগণের সরদার হবেন হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব এবং ওই

ব্যক্তি, যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভালোকাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলায় শাসক তাকে হত্যা করে ফেলে।

রাসুলের সুসংবাদ অনুযায়ী যে ব্যক্তি এই চেতনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তাঁর জন্য মোবারকবাদ। যদি পথে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে হবে সাইয়িদুশ শুহাদা বা শহিদগণের সরদার; আর যদি জীবিত থাকে তাহলে তাঁর জীবন হবে সম্মান ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ। মহান প্রভু অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন, সে যেন এতে বিন্দুপরিমাণ বিচলিত না হয়,

নিশ্চয়ই অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা,
এটিই সম্মান এটিই মর্যাদা।
এটি পৃথিবীতে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের উপায়
পরকালের জীবনে উন্নতির সোপান অর্জনের পদ্ধতি।
এখন তুমি চাইলে দাসত্বের শৃঙ্খল নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারো; আর চাইলে সম্মান ও মর্যাদার মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারো।

হে আল্লাহ, আপনি আপনার দীনের সাহায্যকারীদের বিজয়ী করুন। তাঁদের ধৈর্যধারণের তাওফিক এবং সঠিক পথের দিশা দিন।

হে আল্লাহ, আপনি এই উম্মতকে সঠিক পথ দেখাতে এমন আচরণ করুন, যার ফলে আপনার অনুগতরা হয় সম্মানিত এবং অবাধ্যরা হয় লাঞ্ছিত-অপমানিত। তাঁদের এমন সঠিক পথের দিশা দিন, যা তাঁদের ভালোকাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।

হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের ইহ-পরকালের জীবনে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আমাদের দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যর্থতা দূর করে দিন এবং আমাদের অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ, স্থানীয় ও বিশ্বজনীন অত্যাচারী শাসকদের দমন করুন, কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন।

মুসলিম উম্মাহর নামে
উসামা বিন লাদেনের বাণী

মুসলিম উম্মাহর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান ভাইয়েরা, আমি উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন বলছি। আজ আমি এমন বাস্তবতা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যা ইহুদি লবির পশ্চিমা মিডিয়া মিথ্যাকে সত্যের মোড়কে সাজিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে। আপনারা আমার অতীত সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। আমার জন্ম আরবের এক ধনকুবের পিতার ঘরে। আমি যখন পিতার আঙুল ধরে চলতে শিখেছিলাম তখন এমনও হয়েছে, আমরা ফজরের সালাত কাবা শরিফে, জুহর মদিনায় এবং ইশা মসজিদে আকসায় আদায় করেছি। আমার পিতার প্রাইভেট বিমান ছিল, যা আমাদের দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। আমাদের ছিল অঢেল অর্থ। সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যেসব সুবিধার কথা কল্পনাও করত না, এমনসব উপকরণে সুসজ্জিত ছিল আমাদের প্রাসাদোপম বাসভবন।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আমি দেখছিলাম নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদিদের আগ্রাসন। দেখছিলাম আগুন ও রক্তের খেলা। মুসলমান মা-বোনের ইজ্জত হরণ করা ছিল প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা। মায়ের কোলে শিশু-বাচ্চাদের নিয়মিত হত্যা করা হতো। স্পষ্টভাবে মুসলিমবিশ্বকে অবহেলা করা হয়। নির্বিচারে মুসলমানরা হত্যা ও নিপীড়নের শিকার হতে থাকেন। ফিলিস্তিনের অলিগলিতে মুসলমানদের লাশ পড়ে থাকত, দাফন করারও কেউ ছিল না। তখন থেকে এসব ঘটনা আমার মনমস্তিষ্কে গেঁথে যায়। মুসলমান নারীদের লুণ্ঠিত ইজ্জত ও মুসলমান পুরুষদের দাফন-কাফনবিহীন মৃতদেহ যেন চিৎকার করে আমার ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলছিল, যেন তারা আমার কাছে ফরিয়াদ করছিল—পৃথিবীতে কি আমাদের কেউ নেই? মুসলিমবিশ্বে কারা হবে আমাদের উত্তরাধিকারী, যারা আমাদের পক্ষ

থেকে এসব অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে হুংকার দেবে? এসব প্রশ্নই তখন আমার মনে ঘুরপাক খেত। তবু অপেক্ষা করতাম, হয়তো ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এর দায়িত্ব নেবেন। নিশ্চয়ই তারা এসব অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবেন। হানাদার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেবেন।

মুসলমানরা তো তাদের এ জন্যই নির্বাচিত করেছেন, তাদের উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা তো এ জন্যই করেছেন। মুসলমানরা প্রত্যাশা রাখেন প্রয়োজনের সময় এই নেতৃবৃন্দই মুসলমানদের হিফাজতে নিজেদের নিয়োজিত করবে। আমার মতো সাধারণ মুসলমানরা তখনো জানতাম না, আমাদের নির্বাচিত এসব নেতা পুতুলমাত্র। স্বার্থের জন্য তারা তাদের মনিবদের পদলেহন করে চলছে। তারা মৃতদের বিনিময়ে পশ্চিমাদের থেকে ডলার কামিয়ে নিচ্ছে। কীভাবে তারা আমাদের মা-বোনদের সম্মান রক্ষাকারী হবে? কীভাবে আমাদের জানমালের হিফাজত করবে? নিজেদের বিলাসী জীবনযাপন ও শাসনক্ষমতাই তো তাদের পরম আরাধ্য।

একদিন কুরআনের একটি আয়াত আমার দৃষ্টি কাড়ে। আয়তটি যেন আমাকেসহ পুরো মুসলিমবিশ্বকে আহ্বান করে বলছে, 'হে মুসলমানরা তোমাদের কী হলো, তোমরা কেন এমন লোকদের জন্য লড়াই করছ না, যাদের ওপর কাফিরবিশ্ব অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে।' এরপর অনুভূতিহীন অন্যান্য মুসলমানের মতো আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। আমার আত্মা আমাকে ডেকে বলছিল, উসামা, এসব দাফন-কাফনবিহীন মৃতদেহ, লুণ্ঠিত মানবতা শুধু তোমাকেই ডাকছে। তোমার কাছে ফরিয়াদ করছে। এরা তোমাকে ডেকে বলছে মুসলমান হিশেবে কি আমাদের জন্য তোমার কিছুই করণীয় নেই? তোমাকে কি শুধু অর্থসম্পদ উপার্জন ও বিলাসী জীবনযাপনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? আমাদের কোনো দায়িত্ব কি তোমার কাঁধে দেওয়া হয়নি? আমাদের রক্ত কি এভাবেই বৃথা যাবে?

কেউ যেন আমার ভেতর থেকে ডেকে বলছিল, হে উসামা তোমাকে যে ধনসম্পদ দেওয়া হয়েছে, একদিন তার হিসাব নেওয়া হবে। তোমার ছয় ফুট শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমার চোখের সামনে মুসলমান মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছিল, মায়ের কোলের সন্তান হত্যা করা হয়েছিল, তখন তুমি কী করছিলে? তখন আমার মনে হয়, শুধু আফসোস আর ফরিয়াদ করাই যথেষ্ট নয়; আমাকে মুসলিম মা-বোনদের লুণ্ঠিত ইজ্জত, মায়েদের খালি কোল এবং নিহত যুবক ও অধিকৃত ইসলামি ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী ও হিফাজতকারী হতে হবে।

তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুধু মুসলমানদের স্বার্থে

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই। এদের সঙ্গে কখনো আমার কোনো আত্মীয়তা ছিল না। এরা আমার কোনো জায়গাজমিরও ক্ষতি করেনি; কিন্তু হে মুসলিম উম্মাহ, এদের সঙ্গে আমার শত্রুতা শুধু তোমাদের কারণে। আমি পুরো মুসলিমবিশ্বকে নিজের পরিবার মনে করি। মুসলিমবিশ্বের পুরো ভূখণ্ডকে নিজের মনে করি। এই কাফিররা ইসলামি ভূখণ্ডের এক বিঘত জমি দখল করবে, আমি সহ্য করব না। আমি কীভাবে একজন মুসলমানের সুন্দর চেহারার শুভ্র দাড়ি উৎপাটন করে নিলে চুপ থাকব? মায়ের কোল খালি করা হলে আমি কীভাবে সহ্য করব? উম্মাহর কন্যাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হলে কীভাবে নিজেকে সংবরণ করব? কীভাবে আমি মুসলিম যুবকদের রক্তমাখা লাশ দেখে সহ্য করব? যেখানে অসহায় মুসলিম কন্যারা আরেক মুহাম্মাদ বিন কাসিমের পথ চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

আমেরিকার ইশারায় ফিলিস্তিনিদের ওপর পরিচালিত বর্বরতা প্রতিটি বিবেকবান মুসলমানের চোখের সামনেই ছিল; কিন্তু তারা এমন শাসকদের ওপর ভরসা করছিল, যারা ডলারের বিনিময়ে পুরো উম্মাহর মর্যাদা বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর ইহুদিদের নির্যাতন-নিপীড়ন নিয়ে যখনই আমি সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করেছি, তখনই চিন্তার গভীর সাগরে হারিয়ে গেছি—সমাধানের কোনো পন্থা পাচ্ছিলাম না। আমি আশা করেছিলাম, হয়তো একজন মুসলমান শাসকের মনেও এই অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্য দয়ার সঞ্চার হবে। হয়তো কেউ একজন এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে কাফিরবিশ্বকে হুংকার দেবে। দুঃখের বিষয়, এই সময়ের মায়েরা মুহাম্মাদ বিন কাসিম, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, তারিক বিন জিয়াদ ও খালিদ বিন ওয়ালিদদের জন্ম দিতে যেন ভুলে গেছে। এর পরিবর্তে মুসলমান মায়েদের গর্ভে জন্ম নিচ্ছে কাফির প্রভুদের ডলারের লোভে তাদের পা-চাটা নামসর্বস্ব মুসলিম শাসক। তারা কীভাবে কুরআনের এ আহ্বানে সাড়া দেবে—

> হে মুসলমানরা, তোমরা এমন নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের আর্তনাদে সাড়া দাও, যারা বলে হে আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী প্রেরণ করুন। [সুরা নিসা : ৭৫]

আত্মমর্যাদাহীন এ সকল শাসক ও তাদের সেনাবাহিনীর এমন দুঃসাহস নেই যে, তারা কাফিরবিশ্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়বে বা নিজেদের মস্তক আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করবে।

তারা তো নিজেদের বিলাসী জীবনযাপন নিয়েই চিন্তিত। তারা একটিবারও ভাবেনি, এই উম্মতের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? কী বন্ধন? কেনই-বা উম্মাহর স্বার্থে নিজেদের প্রাসাদ ও অর্থসম্পদ ছেড়ে রাস্তায় চলে আসবে?

একজন মুসলমান হিশেবে আমার কাছেও তাদের কিছু দাবি রয়েছে। তাদের উত্তরাধিকারী হিশেবে তাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া ধনসম্পদেও তাদের অধিকার রয়েছে; এগুলো তাদের হিফাজতে খরচ করা আবশ্যক। শুধু তা-ই নয়, তাদের মর্যাদা রক্ষার জিহাদে আমার শক্তি-সামর্থ্যও ব্যয় করা উচিত। তাই আমি কুরআনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই; কিন্তু কীভাবে? বিশেষত যখন উম্মাহর দায়িত্বশীল শাসকবর্গের অন্তরে তাদের স্রষ্টার পরিবর্তে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্যের ভয় ছিল বেশি। তারা কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্রভয়ে ছিল ভীত। জীবন ছিল তাদের পরম প্রিয় এবং মৃত্যুভয় হয়ে উঠছিল প্রকট। তারা ভুলে গিয়েছিল প্রতিটি প্রাণীকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে কে জিহাদের পতাকা উড্ডীন করবে? কেই-বা উম্মাহকে জিহাদের প্রতি আহ্বান করবে? পৃথিবীর ভালোবাসায় যে মত্ত, সে কীভাবে এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেবে? জিহাদ তো শুধু আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দাগণের কাজ, যারা মৃত্যুকে অন্বেষণ করে। ফলে তখন থেকেই শাহাদাত হয়ে ওঠে আমার একমাত্র গন্তব্য ও লক্ষ্য। আমি তখন একনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ এ পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি; কিন্তু কাফিরদের মোকাবিলার জন্য আমাদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আমার মহান প্রভু আমাকে সে সুযোগ করে দেন। আফগানিস্তানের জিহাদ আমাদের সে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। ওই জিহাদে আমাদের বীরত্বপূর্ণ সত্তা স্পষ্ট হয়। আমরা আফগান ভাইদের সঙ্গে মিলে লাল ভল্লুকদের পুরো স্কোয়াড্রন ধ্বংস করে দিই।

ওই যুদ্ধে বিজয় লাভের পর আমেরিকান মিডিয়া নিজেদের স্বার্থে আফগান মুজাহিদদের হিরো হিশেবে উপস্থাপন করতে থাকে। আমরা কিন্তু তা চাইনি। আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে নিজেদের সম্ভাব্য সকল সামর্থ্য ব্যয় করেছিলাম। তাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা শুধু আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আফগানিস্তানের জিহাদ ছিল আমাদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ। আমরা সেখানে অত্যাধুনিক যুদ্ধ-প্রযুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

রুশবাহিনীকে পরাজিত করার পর আমাদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে মুসলমানদের রক্ত ও মা-বোনদের ইজ্জতের বদলা নেওয়া।

তাই সাম্রাজ্যবাদী রুশরা ফিরে যাওয়ার পর আমরা আরবে চলে এসে ইহুদিদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করি। ইতিমধ্যে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে হামলা করে বসেন। ফলে সৌদি সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাফিরদের গৃহপালিত জাতিসংঘের সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা এর বিরোধিতা করি। আমরা বলছিলাম, আমরা ইরাকিদের দমন করব, তবু যেন এই ভূখণ্ডে কাফিরদের অপবিত্র পদচিহ্ন রাখার সুযোগ দেওয়া না হয়। রাসুলের যুগে আমাদের পূর্বসূরিরা এ ভূখণ্ডে কাফিরদের পদচিহ্ন সহ্য করেননি, তাহলে আমরা কেন তাদের সুযোগ করে দেবো? কিন্তু আমাদের কথা না মেনে বাদশাহ তখন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা আজ সকল মুসলমানের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাদশাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতার কারণে আমাকে নজরবন্দি করা হয়; কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তা বেশিদিন করা সম্ভব হয়নি। আমাকে নির্বাসিত করা হলে আমি খারতুম চলে যাই। আমার লক্ষ্য ছিল পুরো আরব থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নাপাক অস্তিত্ব দূর করা। তাই আমি আমার পুরাতন সাথিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করি এবং তাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকি। ইতিমধ্যে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে আমার পিতা, ভাই এবং চাচারা তিনবার সৌদি বাদশাহর বার্তা নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলেন, 'তুমি সৌদিআরবে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজের কর্মযজ্ঞ বন্ধ করো এবং বাদশাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তিনি তোমাকে সৌদিআরবে অবস্থানের অনুমতি দেবেন।' আমি তাঁদের এ উত্তর দিয়ে ফিরিয়ে দিই—'আমার মাথা হয়তো কেটে যাবে; কিন্তু কারও সামনে ঝুঁকবে না। আপনারা তো আমার সঙ্গে শুধু সৌদিআরবের কথা বলার জন্য এসেছেন; অথচ আমি পুরো মুসলিম ভূখণ্ডে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নাপাক অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছি।'

আমার উত্তর শুনে খ্রিষ্টানবাহিনীর প্রতিনিধি আমার শত্রুতে পরিণত হয়ে ওঠে। তারা সুদান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। বাধ্য হয়ে সুদান সরকার আমাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। এরপর আমি পূর্বপুরুষদের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ি ভূমিতে বসবাস করতে শুরু করি এবং মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের সঙ্গে জিহাদে লিপ্ত হই। আল্লাহর মনোনীত দীনের মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে বিলাসী জীবন ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি।

এখন সময় এসেছে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যুবকদের সঙ্গী করে মুসলিমবিশ্বে হানা দেওয়া পশ্চিমা সৈন্যদের উপর এমন আক্রমণ করার, যা তাদের ভিত কাঁপিয়ে দেবে। আল্লাহর অনুগ্রহে উম্মাহর কয়েকজন বীরপুরুষের সহায়তায় আমরা পশ্চিমাদের

স্বার্থে এমন আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছি, যার প্রতিশোধ নিতে তারা বুনো হাতির মতো মুসলিমবিশ্বের দুর্বলতম দেশ আফগানিস্তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর মহান প্রভু আমাদের দুর্বল হাতে বস্তুবাদের পূজারিদের ধুলি চাটতে বাধ্য করছেন। আমাদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে কুফরিশক্তি। এখন তো তাদের পরাশক্তির তকমাটাই পড়েছে হুমকির মুখে। আমার রবের দয়ায় আমাদের আক্রমণের মুখে আরও একবার ক্রুসেডের শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। আমরা পশ্চিমাদের প্রযুক্তির অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।

হে মুসলমানগণ, এটি আমাদের আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের জীবন্ত উদাহরণ। মুসলমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় জাতি। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাদের উপর আক্রমণ না করে, আমরা অযথা তাদের সঙ্গে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করি না। আগ্রাসী উপনিবেশবাদীরা দেড়শ বছর যাবত আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। পৃথিবীর হিংস্র ও বর্বরতম ক্রুসেডীয় বাহিনী আমাদের দীনের শত্রু। এ পৃথিবীতে আমাদের বসবাসের ক্ষেত্রকে সন্ত্রাসবাদে ভরে দিয়েছে।

একটু চিন্তা করুন, যে সময় আমাদের শিশুদের কলম হাতে পাঠশালায় যাওয়ার কথা, তখন আমরা কেন উম্মাহর হিফাজতে তাদের হাতে বন্দুক তুলে দিতে বাধ্য? তাদের শিশুরা যে বয়সে খেলনা নিয়ে খেলাধুলা করে; সে বয়সে তাদেরই কারণে আমাদের শিশুরা গোলাবারুদ নিয়ে খেলাধুলা করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের শিশুরা যখন প্রাসাদোপম ভবনে বিলাসী জীবনযাপন করছে, আমাদের শিশুরা তখন পাহাড়ি গুহায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের শিশুরা যখন নরম বিছানায় ঘুমুচ্ছে, তখন আফগান শিশুরা পাথরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছে। তোমরা যেখানে জীবনটা উপভোগের জন্য বেঁচে থাকতে চাচ্ছ; আমরা সেখানে মৃত্যুর ধাওয়া খেয়ে জীবন নির্বাহ করছি। তোমরা ক্রিকেট আর হকি খেলায় জয়লাভকে বিজয় বলে গণ্য করছ; আর আমরা যুদ্ধের ময়দানে ক্রুসেডারদের পরাজিত করাকে নিজেদের বিজয় বলে গণ্য করছি।

কাফিরবিশ্বের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য। এ যুদ্ধকে আমরা নিজেদের সন্তান ও সম্পদের চেয়ে প্রাধান্য দিই। আমাদের লক্ষ্য-গন্তব্য একমাত্র আল্লাহর পথে শাহাদাত।

এজেন্ট কারা

আমি নিজের পুরো জীবন, ধনসম্পদ সবকিছুই আল্লাহর দীনের মর্যাদা রক্ষায় ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমি উসামা বিন মুহাম্মাদ আওয়াদ বিন লাদেন আরবের

বিলিয়নিয়ার যুবরাজ উম্মতের সাহসী যুবকদের সঙ্গে নিয়ে মুসলিমবিশ্বের ওপর আগ্রাসী মার্কিনশক্তির বিরুদ্ধে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ইসলামের দুশমন বুশ ও ওবামার অনুসারীরা আজ আমাকে তাদের এজেন্ট বানিয়ে উপস্থাপন করছে। তাদের পা-চাটা মুসলমান নামধারী শাসকরা আজ আমাকে মুসলিমবিশ্বের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছে। আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, ক্রুসেডীয় উপনিবেশের বাস্তব এজেন্ট কারা? যারা ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের আত্মবিসর্জন দেয় তারা? নাকি যারা মুসলমানদের রক্ত ও ইসলামি মূল্যবোধের বিনিময়ে পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে ডলার কামিয়ে নেয় তারা?

হে মুসলিম উম্মাহ, আমি আমার সারা জীবনের সকল উপার্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঢেলে দিয়েছি। আলিশান অট্টালিকা ছেড়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নরম মখমলের বিছানার পরিবর্তে পাথুরে ভূমিকে বিছানা বানিয়েছি। বিলাসী জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুর অভিসারে বেরিয়েছি। মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তবু কি আমাকে পশ্চিমাদের এজেন্ট বলা হবে? মুসলিম উম্মতের মা-বোনদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার কারণে কি আমাকে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি উপাধিতে ভূষিত করা হবে? তোমরা কি জানো তোমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের সঙ্গে কাফিরদের কারাগারে কী ধরনের আচরণ করা হয়? স্মরণ করো আবু গারিব কারাগারের অত্যাচারী ফরিয়াদিনীর কথা, যে তোমাদের কাছে আর্তনাদ করে মৃত্যুর ফরিয়াদ করেছিল। সে চিৎকার করে বলেছিল, 'কাফিরদের সন্তানের মা হওয়ার চেয়ে আমি মৃত্যুকে উত্তম মনে করি। তোমরা যদি আমাকে উদ্ধার করতে না পারো, পুরো কারাগারটাই জালিয়ে দিয়ে যাও।'

উম্মতের সেই কন্যার ফরিয়াদে আরব শাসকরা সাড়া দেয়নি। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল আল্লাহর পথের বীরসেনানীরা। আমাদেরই এক বোন আফিয়া সিদ্দিকিকে আত্মমর্যাদাহীন এক শাসক কিছু অর্থের বিনিময়ে হিংস্র হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। কে তার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে? কার কানে তার আর্তনাদ ? কাফিরদের চোখে চোখ রেখে কে তাদের চ্যালেঞ্জ করেছে? আপনারা তো শুধু গতানুগতিক ধাঁচে মিছিল-মিটিং করেই দায়মুক্ত হয়েছেন; কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? এসব প্রতিবাদে পশ্চিমাদের কিছুই হয় না। আমেরিকা এ অসহায় নারীকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে, আপনারা শুধু তামাশাই দেখেছেন। ইতিহাসের কী কাকতালীয় সংযোগ! ইসলামি খিলাফত ধ্বংসের ঠিক ৮৬ বছরের মাথায় আফিয়া সিদ্দিকিকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখবেন, আজ যদি ইসলামের বীরসেনানীরা জিহাদের পতাকা উড্ডীন না করতেন, তাহলে উম্মাহর প্রতিটি নারী খ্রিষ্টানবাহিনীর দাসী হয়ে যেত। আপনারাও এভাবে স্বাধীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপন করতে পারতেন না। আপনাদের সঙ্গেও রেড ইন্ডিয়ান বা আফ্রিকান দাসদের মতো আচরণ করা হতো। আজ শুধু জিহাদের কারণে ক্রুসেডাররা সরাসরি মুসলিম ভূখণ্ড দখলের দুঃসাহস দেখাতে পারছে না। তারা আপনাদের শাসকদের নিজেদের এজেন্ট ও সেবাদাস হিশেবে নিযুক্ত করে পরোক্ষভাবে আপনাদের শাসন করছে। আপনাদের শাসকরাই তাদের এজেন্ট, যারা আপনাদের রক্ত-ঘামে অর্জিত পয়সা দিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছে; আবার আপনাদের লাশের বাণিজ্য করে তাদের কাছ থেকে ডলার কামিয়ে নিচ্ছে।

হে মুসলমানগণ, পাকিস্তানের কাবায়েলি অঞ্চলসমূহের অবস্থা আপনাদের চোখের সামনে। নিপীড়িত মুসলমানদের কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? আপনাদের কি জানা আছে, আপনাদের শাসকরা শুধু নিজেদের প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে এই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করছে? তাঁদের অপরাধ শুধু এটাই যে, তাঁরা নিজেদের মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা করেছিল। তাঁরা আজও জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও চেতনা লালন করেন। মুজাহিদদের তাঁরা পশ্চিমাদের এজেন্ট মনে করেন না; কিন্তু অবাক ব্যাপার, আপনারা পশ্চিমা এজেন্টদের কথায় বিশ্বাস করে ইসলামি সেনানীদের মার্কিন এজেন্ট আখ্যা দিচ্ছেন। আপনারা কি নিজেদের চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? আমার অতীতজীবন জেনেও কীভাবে ভাবছেন যে, আমি সামান্য কটি ডলারের জন্য কাফিরদের এজেন্ট হিশেবে কাজ করতে পারি? এটা তো দিবালোকের মতোই স্পষ্ট—কাফিরদের এজেন্ট কারা?

আজ আমি বলব, কে পশ্চিমাদের সত্যিকার এজেন্ট? কারা আমেরিকান সরকার ও সিআইএর কাছ থেকে নিয়মিত ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে? শুরুতেই স্পষ্ট করা উচিত, আমেরিকা এতটা বোকা নয় যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একজন বড় দাড়িওয়ালা ঝাঁকড়া চুলের অধিকারী মুজাহিদের হাতে ডলারভরতি ব্রিফকেস তুলে দেবে। যদি এটা সত্য হয়, তাহলে পৃথিবীর কেউ এর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করুক। স্বয়ং আমেরিকা এ ব্যাপারে প্রমাণ তুলে ধরুক। আমেরিকা তো সাধারণত ২০-২৫ বছর পর পর তাদের গোপন নথিপত্র জনসম্মুখে উপস্থাপন করে; কিন্তু ৩০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আমেরিকা তাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কোনো বোঝাপড়ার সংবাদ বা ছবি জনসম্মুখে আনতে পারেনি। এর বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নবিরোধী যুদ্ধ চলাকালে আইএসআই ও পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে

মার্কিনদের ছবি পুরো বিশ্ব দেখেছে। পুরো বিশ্ব ভালো করে জানে, আমেরিকার পক্ষ থেকে পেপসি-কোকাকোলার প্লান্ট কাদের দেওয়া হয়েছিল? ব্যক্তিগত অঢেল সম্পদ কারা বানিয়েছিল? কারা আমেরিকান ডলারে ফ্যাক্টরি বানিয়েছিল? সুইস অ্যাকাউন্টে কাদের নামে কোটি কোটি ডলার জমা হয়েছিল? কেউ আজ বলে দিক, মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কয়টা ফ্যাক্টরি আছে বা তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ কত? জালালুদ্দিন হক্কানি কয়টা ফ্যাক্টরির মালিক? পুরো আফগানিস্তানের যেকোনো একজন তালেবান কমান্ডারের ব্যাপারেই জানিয়ে দেওয়া হোক, তিনি কত অর্থসম্পদ কামিয়েছেন?

জানি, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কারও কাছে নেই। যারা মুজাহিদদের ওপর আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগ তোলে, তারা প্রমাণ করুক। আদতে তারা এটা প্রমাণ করতে পারবে না। ফায়সালা আপনার হাতে, আপনি সিদ্ধান্ত নিন কারা সত্যিকারার্থে পশ্চিমাদের দালাল!

শাহাদাত

আমাকে নিজের জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। বন্ধুবান্ধবের ছোট একটি বহর নিয়ে আমি দেশ ছেড়েছিলাম। স্বদেশ বিতাড়িত আমাদের সেই ছোট দলটির বিরুদ্ধে যেসব আরব শাসক ষড়যন্ত্র করেছিল, আজ তাদের অধিকাংশই তাদের প্রভুদের হাতে নিগৃহীত। তারা আমাদের আশ্রয়হীন করেছিল, মহান প্রভু আজ তাদের আশ্রয়হীন করেছেন। আমি কী পেয়েছি? আমি পেয়েছি উত্তম পরিণতি। কাফির আমার মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে অট্টহাসি দিয়েছে। তারা ভেবেছে মুসলিমবিশ্বের কেউ আমার জানাজা আদায় করতে পারেনি, আমার দাফন হয়নি; কিন্তু শত ধিক তাদের বিবেকের প্রতি। বস্তুত তাদের সঙ্গে মক্কার কাফিরদের সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্যতা রয়েছে। মক্কার কাফিররা যখন হজরত হামজা রা.-এর মৃতদেহ লাঞ্ছিত করেছিল, রাসুল সা. হজরত হামজা রা.-এর জন্য শাহাদাতের মর্যাদা ঘোষণা করে বলেছিলেন,

> যদি (তাঁর বোন) সাফিয়ার কষ্টের কথা না ভাবতাম, তাহলে তাঁকে আমি এভাবে রেখে দিতাম, যেন কিয়ামতের দিন তাঁকে হিংস্র প্রাণী ও চিলের পেট থেকে পুনরুত্থিত করা হয়।[১]

এই উম্মতের মিডিয়াবিশ্ব ভগত সিংকে শহিদ হিশেবে আখ্যায়িত করে, খ্রিষ্টান শাহবাজ ভাট্টিকে শহিদ উপাধিতে ভূষিত করে; কিন্তু তারা ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করা মর্দে মুজাহিদকে তাদের প্রভুদের আক্রোশের ভয়ে শহিদ আখ্যা

---

১ *সিয়ারু আলামিন নুবালা।*

দিতে ভয় পায়। আমাকে পশ্চিমাদের এজেন্ট হিশেবে প্রমাণের নিষ্ফল চেষ্টা করে। আমার এসবের পরোয়া নেই। কেউ আমাকে শহিদ বলুক বা না বলুক, এতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি জানি, আমি উসামা বিন লাদেন কিয়ামতের দিন মাছের পেট থেকে পুনরুত্থিত হব। আমি পেয়েছি আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। আমার চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ছিল শাহাদাতের মৃত্যু। এর জন্যই আমি আরবের আলিশান প্রাসাদ ছেড়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকাকে নিজের বাসস্থান বানিয়েছিলাম। আমি ওই স্বপ্ন সত্যি করে দেখিয়েছি, যেখানে উজ্জ্বল চোখের একব্যক্তি আমার হাতে কালোপতাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি পেছনে সেই কালো পতাকাধারী বাহিনী রেখে যাচ্ছি, যারা খোরাসানসহ পৃথিবীর প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে যুগের দাজ্জালদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ইসা আ.-এর সঙ্গে মিলিত হবে। এভাবেই আমার লক্ষ্য ও দায়িত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে।

শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতে

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শোকবার্তা

> মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। [সুরা আহজাব : ২৩]

আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদিরের সংযোগে কাফিরবাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলামি জিহাদরত শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহ. আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহযোদ্ধা ও পুরো মুসলিমবিশ্বকে ধৈর্যধারণের তাগিদ দিচ্ছে। আল্লাহ আমাদের এই মহান শায়খের আত্মোৎসর্গ কবুল করে তাঁকে পবিত্র জিহাদ ও শাহাদাতের বরকত দান করুন। মুসলিম উম্মাহকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দান করুন।

আফগানিস্তানের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণের পর থেকে শায়খ আফগান মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পূর্ণ নিষ্ঠা ও বীরত্বের প্রতিমূর্তি হিশেবে তিনি নিজেকে মুজাহিদদের কাতারে শামিল করেছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, যা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদে আকসা উদ্ধার করতে অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিদের উৎখাত করা ছিল শায়খের স্বপ্ন। মুসলিমবিশ্বে মার্কিন আগ্রাসনকে রুখে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তিনি এ পথে নিজেকে উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেননি কখনো।

তাঁর হৃদয়ে ছিল ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ। ইসলামের জন্য নিজের সারা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর চরিত্র ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় হিশেবে স্থান করে নেবে।

দীনের মর্যাদা সমুন্নত রাখার ইতিহাস জিহাদ ও শাহাদাতের দাস্তানে ভরপুর। শায়খ ছিলেন ওই পথেরই একজন পথিক। তিনি তাঁর জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতপ্রত্যাশী; আর জীবনের শেষ মুহূর্তে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গেই সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছেন।

যদি আমেরিকা ও তাদের সহযোগী বাহিনী মনে করে, বিন লাদেনের শাহাদাতে আফগানিস্তানসহ অন্যান্য অধিকৃত মুসলিম অঞ্চলের মুজাহিদগণ মনোবল হারিয়ে ফেলবে, তাহলে তারা চরম ভুল করবে। কেননা, জিহাদের এই পবিত্র বৃক্ষ সর্বদা রক্তের নজরানায় সিক্ত হয়েছে। একজন বীরমুজাহিদের রক্ত মুজাহিদকে শাহাদতের প্রতি প্রলুব্ধ করে। তাঁর অনুপ্রেরণায় হাজারো নওজোয়ান জিহাদের পথে পা রাখে।

আফগানিস্তানের বর্তমান জিহাদি কার্যপরিক্রমায় সাধারণ মুসলমানরাই মূল ভূমিকা পালন করছেন। সাহস ও বীরত্বের এ ভূখণ্ডে কাফিরদের প্রতিটা আক্রমণের বিপরীতে মুজাহিদদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের অধিকতর সহানুভূতি তৈরি হচ্ছে। যদি শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে আফগানের বীর জাতিকে পদানত করা সম্ভব হতো, তাহলে গত ১০ বছর আগেই আমেরিকা বিজয়ী হয়ে যেত। মার্কিন সৈন্যরা আফগান মুজাহিদদের দমনে কোনো কৌশল বাকি রাখেনি; কিন্তু বাস্তবতা বলছে এখানে শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োগ তাদের প্রত্যাশার বিপরীত ফল বয়ে এনেছে।

শুরু থেকেই ইসলাম নিয়ে কুদরতের খেলা দেখুন
একে যতই থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, ততই প্রস্ফুটিত হয়।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বিশ্বাস করে, জিহাদি কর্মযজ্ঞের এ ক্রান্তিকালে শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাত পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে। মুজাহিদরা ফিরে পাবে নতুন গতি। ইনশাআল্লাহ অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামের শত্রুরা তাকিয়ে দেখবে এই যুদ্ধে বিজয় মুজাহিদদেরই পদচুম্বন করছে।

বিন লাদেনের জন্ম, বংশ ও পারিবারিক অবস্থান

শায়খ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ সৌদিআরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন সিরিয়ান বংশোদ্ভূত। শায়খের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল ইয়ামেন। দক্ষিণ ইয়ামেনের উপকূলীয় প্রদেশ হাজারামাউত এডেন বন্দরের পশ্চিমে অবস্থিত। ব্রিটেন আরবের দক্ষিণাঞ্চল ও এডেন বন্দর স্বাধীন করে দক্ষিণ ইয়ামেন ও উত্তর ইয়ামেন হিশেবে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করে। স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে ইয়ামেনের ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের একটি বড় অংশ উন্নত ভবিষ্যতের সন্ধানে ইয়ামেন ছেড়ে সৌদিআরবে চলে আসে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর এ ধারাবাহিকতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইয়ামেন ছেড়ে সৌদিআরব আসা অসংখ্য মানুষের একজন ছিলেন শায়খের পিতা মুহাম্মাদ বিন লাদেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে হাজারামাউত শহর ছেড়ে সৌদিআরবে আগমন করেন। কর্মবীর ও পরিশ্রমী মুহাম্মাদ বিন লাদেন নতুন শহরে এসে পুরোদমে কাজের সন্ধান করতে থাকেন। অল্প সময়েই তিনি একজন শ্রমিক হিশেবে কাজ পেয়ে যান। সৌদিআরবের তেল-কোম্পানি আরামকোর একটি নির্মাণপ্রকল্পে শ্রমিক হিশেবে কাজ শুরু করেন। এখানে প্রতিদিন তাঁর উপার্জন ছিল মাত্র এক রিয়াল। অন্য সহকর্মীর মতো তিনি অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাপন করতে থাকেন। উপার্জিত সম্পদের কিছু অংশ তিনি একটি টিনের বাক্সে সংরক্ষণ করতেন। কয়েক বছরের কঠোর মেহনতে তিনি বেশ কিছু অর্থ জমা করেন। এরপর এই টাকা দিয়ে খুব ছোট পরিসরে ‘বিন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি’ প্রতিষ্ঠা করেন।

শুরুতে মুহাম্মাদ বিন লাদেনের কোম্পানি ছোট ছোট কাজ পেলেও ধীরে ধীরে এর পরিসর বাড়তে থাকে। ১৯৫০-এর দশকে বিন লাদেন কোম্পানি রাজকীয় বিভিন্ন নির্মাণপ্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। পূর্ণ সফলতা ধরা দেয় যখন তিনি পবিত্র শহর মদিনা থেকে জিদ্দা-অভিমুখী নির্মাণকাজের ঠিকাদারি পেয়ে যান। এ কাজটি তিনি ঘটনাক্রমে পেয়েছিলেন। প্রথমে একটি বিদেশি কোম্পানি এই হাইওয়ে

নির্মাণের ঠিকাদারি পেয়েছিল; কিন্তু কোনো এক কারণে তারা এটি করতে অনীহা প্রকাশ করলে বিশাল এ নির্মাণপ্রকল্প বিন লাদেন কোম্পানির হাতে আসে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিন লাদেন কোম্পানি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকে তিনি বিশাল হাইওয়ে, বিমানবন্দরের রানওয়ে, বড় বড় ভবনসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পেতে শুরু করেন। একপর্যায়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে জর্দান এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশসমূহে পা ফেলতে শুরু করে তাঁর কোম্পানি। ১৯৬০-এর দশকে 'বিন লাদেন গ্রুপ অব কোম্পানি' পুরো বিশ্বের প্রসিদ্ধ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিশেবে পরিচিতি লাভ করে।

মুহাম্মাদ বিন লাদেনকে দ্বিতীয় সৌদি শাসকের অত্যন্ত আস্থাভাজন মনে করা হয়। বাদশাহ ফায়সালের ক্ষমতাগ্রহণকালে পুরো সৌদিআরবে তখন অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে মুহাম্মাদ বিন লাদেন সৌদি সরকারকে বেশ সহযোগিতা করেন। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, তখনকার সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ছয় মাসের বেতন প্রদান করেন মুহাম্মাদ বিন লাদেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিরা মসজিদে আকসা জ্বালিয়ে দিলে মুহাম্মাদ বিন লাদেনই মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের মহান কাজ সম্পন্ন করেন।

উসামা বিন লাদেনের বয়স যখন ১৩ বছর, তখন তাঁর পিতা নিজের চার্টার্ড বিমান-দুর্ঘটনায় ইনতিকাল করেন। পিতার ইনতিকালের পর তাঁর বড় ভাই পিতার কোম্পানির হাল ধরেন। কিছুদিন পর শায়খ নিজেই তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত 'বিন লাদেন গ্রুপ অব কোম্পানি'র দেখাশোনা শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে আবারও বিন লাদেন গ্রুপ স্থাপত্য কোম্পানিসমূহের শীর্ষে পৌঁছায়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে ৮০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসায়িক কৌশলের মাধ্যমে একসময় তিনি তা ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে সক্ষম হন।

শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুরাগ

উসামা বিন লাদেনের জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর পিতা-মাতার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর মা বিন লাদেন কোম্পানিতে কর্মরত মুহাম্মাদ আল আত্তাসের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি তাঁর মা ও সহোদর বোনদের কাছে লালিতপালিত হতে থাকেন। পিতার ঔরসে জন্ম নেওয়া ভাইদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ২১ তম এবং ভাইবোনদের মধ্যে ৪১ তম। পরিবারের ভাই-বোন সকলেই তাঁকে বেশ সমীহ করে চলত। তাঁর পরিবার জিদ্দার নিকটবর্তী আল-মুশাররফা অঞ্চলে বসবাস করত।

কথিত আছে, শায়খ তাঁর জীবনের শুরুতে কিছুদিন সিরিয়ায় লেখাপড়া করেন। কেননা, তাঁর মা অধিকাংশ সময় সিরিয়ার লাতাকিয়া অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। ১০ বছর বয়সে তিনি ব্রোমানা হাইস্কুলে ভর্তি হন। এটি লেবাননের ব্রোমানা অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে তিনি এক বছরের চেয়েও কম সময় কাটান। ব্রোমানা হাইস্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি কিছুকাল লাতাকিয়ায় কাটান।

বাল্যকালেই তিনি ইসলাম এবং মুসলিম বীরদের ইতিহাস খুব গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। অল্প বয়সেই জিহাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়। তিনি ইসলামি বিদ্বান ব্যক্তিদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় কুরআন, হাদিস, তাফসিরসহ বিভিন্ন ইসলামি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী। রাতের বেশিরভাগ সময় টেপরেকর্ডারে প্রসিদ্ধ কারিদের তিলাওয়াত শুনতেন। মক্কায় সাপ্তাহিক দারসসমূহে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া মালিক আবদুল আজিজ থেকে এমপিএ ডিগ্রি এবং জামিয়া মালিক আস-সাউদ থেকে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি প্রচণ্ড ধর্মানুরাগী হয়ে ওঠেন। কুরআন অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকতেন। তাঁর এক সহপাঠী বলেন, 'আমরা সাইয়িদ কুতুব শহিদের গ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করতাম। সাইয়িদ কুতুব শহিদের চিন্তাচেতনা আমাদের বেশ প্রভাবিত করত।' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তিনি জিহাদের ভূমি উর্বর করার কারিগর সাইয়িদ কুতুব শহিদ ও শায়খ আবদুল্লাহ্ আজ্জামের প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে উঠেন। তখন থেকে আরব যুবকদের আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেন।

তিনি পিতা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ পেয়েছিলেন। আরবের সাধারণ মুসলমানদের মতো তাঁর পরিবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.-এর অনুসারী ছিল। উসামা বিন লাদেন পশ্চিমা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেননি। এ ব্যাপারে প্রচলিত তথ্যসমূহ সর্বৈব মিথ্যা ও অবাস্তব।

শায়খের মধ্যে স্বভাবজাত কাব্যচর্চার প্রবণতা ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্যে অধিকাংশ সময় কবিতা উপস্থাপন করতেন। তাঁর নিজস্ব কবিতায় উম্মতের ব্যথা-বেদনার বিবরণের পাশাপাশি জিহাদের প্রতি আহ্বান থাকত। তাঁর কবিতা আবৃত্তি সাইয়িদ হাসসান ইবনু সাবিত রা.-এর স্মরণ জাগরূক করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বিভিন্ন বৈশ্বিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছিলেন। যেমন, ইরানের শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লব। এর ফলে খোমেনির আবির্ভাব

ও পরবর্তী সময়ে মসজিদে হারাম দখলের ঘটনা। সৌদি সরকার তখন ফ্রান্স-বাহিনীর সহায়তা ব্যতীত মসজিদে হারাম মুক্ত করতে পারেনি। শায়খের সামনে তখন সৌদি সরকারের অক্ষমতা তীব্রভাবে ফুটে ওঠে। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের উপর হামলা করে, তখন তিনি জিহাদের জন্য তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিয়ে নেন।

বৈবাহিক জীবন

শায়খ উসামা বিন লাদেন পাঁচটি বিয়ে করেন। ১৭ বছর বয়সে নিজের মামাতো বোনের সঙ্গে প্রথম বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে আরও চারটি বিয়ে করেন। অবশ্য প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে-বিচ্ছেদ হয়েছিল। তাঁর ঔরসে মোট ১১ জন পুত্র ও নয়জন কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে। ছেলেদের নাম : আবদুর রহমান বিন লাদেন, কয়জান নাবিদ বিন লাদেন, সাআদ বিন লাদেন, উমর বিন লাদেন, উসমান বিন লাদেন, মুহাম্মাদ বিন লাদেন, লাদেন বকর বিন লাদেন, আলি বিন লাদেন, আমির বিন লাদেন, হামজা বিন লাদেন, খালিদ বিন লাদেন।

আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের উপর হামলা করলে পুরো মুসলিমবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। শায়খ তখন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় তিনি করাচি পৌঁছান। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ফিস্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শায়খ বলেন, 'আমি তখন চরম ক্ষুব্ধ ছিলাম এবং তাৎক্ষণিক করাচি পৌঁছাই।' অতঃপর তিনি সেখান থেকে আফগান-মুহাজিরদের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শুরুর দিকে একমাস তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পাকিস্তানে অবস্থান করেন এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি সৌদিআরব ফিরে যান। অন্যান্য আরব শায়খের মধ্যে আফগান মুজাহিদদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার জন্য জোর তৎপরতা চালান। তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারো আরব যুবক জিহাদে অংশগ্রহণে আগ্রহী হলে তিনি নিজেই তাঁদের যুদ্ধযাত্রার ব্যয় বহন করেন। নিজস্ব এ বাহিনীর সঙ্গে সৌদিআরব থেকে বিশাল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে তিনি পাকিস্তানে আসেন। অতঃপর আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ

করেন। আফগানিস্তানের ব্যাপারে একবার তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'এখানে মুসলমানদের যে পরিস্থিতি, সে পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশে একদিন অবস্থান করা সাধারণ কোনো মসজিদে ১ হাজার দিন ইবাদতের সমান।'

সেবামূলক কর্মকাণ্ড

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম পেশোয়ার ইউনিভার্সিটি এলাকায় কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এদিকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উসামা বিন লাদেন বায়তুল আনসার নামে একটি জিহাদি সাহায্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থনৈতিকভাবে তিনি এ সবগুলোরই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি বেশ কয়েকটি গেস্ট হাউস ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে আরব থেকে আগত মুজাহিদদের অবস্থান এবং তাঁদের আত্মিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম পেশোয়ারে একটি গাড়িবোমায় শাহাদাতবরণ করলে তিনি আরব মুজাহিদদের নেতা হিশেবে আবির্ভূত হন।

আরবের শাহজাদা

হজ ও উমরায় গিয়ে হয়তো আপনারা মসজিদে নববির নতুন স্থাপনার নির্মাণশৈলী ও সৌন্দর্য দেখে পুলক অনুভব করেন। অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী এই স্থাপনাও উসামা বিন লাদেনের তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হয়েছিল। শায়খের পিতা মুহাম্মাদ বিন লাদেনকে আল্লাহ একই সময়ে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদে আকসার নতুন স্থাপনা নির্মাণ ও পুরাতন ভবনের সংস্কারের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববির নতুন স্থাপনার নির্মাণকাজ তাঁর পিতা মুহাম্মাদ বিন লাদেন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ বিশেষত উসামা বিন লাদেন এতে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে ৯৯ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিন লাদেন কোম্পানির তত্ত্বাবধানে নির্মিত।

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববির নতুন নির্মাণ আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারুকার্যময় স্থাপনাসমূহের অন্যতম। স্থাপনার ডাইরেক্টর ছিলেন স্বয়ং উসামা বিন লাদেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মেধা ও রুচির সমন্বয়ে স্থাপনাকে শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য প্রদান করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি।

একবার আফগানিস্তানে আলিমদের মজলিসে তিনি বলেছিলেন, 'হিজাজ-ভূমির অধিকাংশ পবিত্র জায়গার স্মারকস্থাপনা ও প্রসিদ্ধ মসজিদসমূহ আমাদের ভাইয়েরা

নির্মাণ করেছিল। মসজিদে নববির নতুন স্থাপনা নির্মাণের সিদ্ধান্ত সামনে এলে আমি ভাইদের অনুরোধ করতে থাকি, তারা যেন এর নির্মাণের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে দেয়। তারা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এই ইচ্ছা পূরণে মসজিদে নববির নতুন নির্মাণের ডাইরেক্টর হিশেবে আমাকে নিযুক্ত করে। তত দিনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদ শুরু হয়ে যায়। এরপর আমি আফগানিস্তান চলে আসি। কিছুদিন জালালাবাদের পাহাড়ি উপত্যকায় রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটাতাম; আবার কিছুদিন মসজিদে নববির নির্মাণ-তত্ত্বাবধান ও কারুকার্য বর্ধনে মদিনায় ছুটে যেতাম।'

অতঃপর কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমার প্রভু ভালো করে জানেন, কতটা আগ্রহ নিয়ে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় আমি মসজিদে নববির নির্মাণ করেছিলাম; কিন্তু একেবারে শেষপর্যায়ে এসে আমাকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়।' তারপর দুঃখভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমেরিকান জালিমরা আমাকে আমার নবির মসজিদে, যা আমি নিজ হাতে নির্মাণ করেছিলাম—একটি সিজদা পর্যন্ত করতে দেয়নি।' এ বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। উপস্থিত কেউই তখন কান্না থামিয়ে রাখতে পারছিল না। মসজিদে নববির ভালোবাসা আর আবেগের উচ্ছ্বাসে তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। এ-ই ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা রাখা মর্দে মুজাহিদের অবস্থা।

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম একবার আলিমদের এক বৈঠকে বলেছিলেন, 'যদি কেউ আমাকে বলে, উসামা বিন লাদেন আল্লাহর ওলি নয় তাহলে আমি বলব, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে কেউ-ই আল্লাহর অলি নয়।'

একবার ইয়ামেনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শায়খের ১৪ জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। এটা ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পূর্বের কথা। তিনি ইয়ামেনের শাসক আলি আবদুল্লাহ এবং তার সরকারের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, 'অমুক অমুক ব্যক্তি তোমাদের কারাগারে বন্দি আছে, তাদের মুক্ত করে দাও। এটি আমার আদেশ। অন্যথায় তোমরা আমার পক্ষ থেকে বিপদের সম্মুখীন হবে।' ইয়ামেন সরকার তাঁর কথা আমলে নিতে বাধ্য হয় এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁদের মুক্ত করে দেয়। তারা ভালো করেই শায়খ উসামা বিন লাদেনের হুমকির যথার্থতা উপলব্ধি করত। অতঃপর তাঁরা সকলেই আফগানিস্তানে চলে আসেন এবং তাঁর নেতৃত্বে জিহাদের অঙ্গনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

শায়খ নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর রাখতেন। মসজিদ ও হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতেন। একবার তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করে দেখতে পান দুই সহোদর পাশাপাশি শুয়ে আছে। শায়খ জানতেন, তাঁরা অসুস্থ হয়ে এখানেই চিকিৎসাধীন। তাঁরা দুজন একসঙ্গে শুয়ে ছিল। শায়খ তাঁদের একজনের পায়ে হাত দিয়ে তাঁদের জাগিয়ে তোলেন। তাঁরা ঘুম থেকে জেগে চমকে উঠে, স্বয়ং উসামা বিন লাদেন তাঁদের জাগাচ্ছেন! তাঁরা বলে উঠল, 'অনুগ্রহ করে এটা করবেন না; এটা আপনার কাজ নয়।' তিনি তখন বলেন, 'এটা আমার দায়িত্ব এবং আপনাদের অধিকার।' পরবর্তী সময়ে এ দুই ভাই ওই ১৯ সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় আমেরিকাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে একবার ইরানি বাহিনী তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি তাদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'এদের সসম্মানে মুক্তি দাও, এখনো আমরা আমাদের বন্দুকের নল তোমাদের দিকে ঘুরাইনি।' ইরান তখন বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গীদের মুক্তি দেয়।

১১ সেপ্টেম্বরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পূর্বে তাঁর একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছিল। যেখানে তাঁর পেছনে পৃথিবীর মানচিত্র ছিল, যার উপরে বন্দুক রাখা। ঘটনাক্রমে তাঁর বন্দুকের নিশানা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো একটি দেশ। অতঃপর সে দেশের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানে তাঁর কাছে একদল প্রতিনিধি পাঠানো হয়। তারা তাঁর জন্য প্রচুর উপহার-উপঢৌকন নিয়ে যায়, যেন তিনি তাদের এলাকার কোনো ক্ষতিসাধন না করেন।

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পরে তিনি তোরাবোরা পাহাড়ে অবস্থান করেন। ভয়াবহ মার্কিন বোমা হামলার পর তিনি যখন নিশ্চিত হন যে, তাঁর সফরসঙ্গীরা নিরাপদে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে, এর পর তিনি বেরিয়েছিলেন।

একবার তোরাবোরা পাহাড়ে মার্কিন বোমা হামলার সময় হিজাজের একজন মুজাহিদ এক পাহাড়ি গর্তে প্রবেশ করেন। তিনি জানতেন না এখানে কারা আছে। কিছু মানুষকে সেখানে বসে থাকতে দেখে তিনি বাতি জ্বালান, তবু সেখানে ভয়াবহ অন্ধকার ছেয়ে থাকে। একে তো পাহাড়ি গুহাগুলোতে দিনের আলো পৌঁছায় না, ওদিকে তিনি বাহির থেকে ভেতরে যাওয়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে জোরে চিৎকার করে বলেন, 'আপনারা কারা, আপনাদের পরিচয় দিন।' তিনি বার বার এভাবে জিজ্ঞেস করার পর তারা এলেন। তিনি এবার তাঁর পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কে।' তিনি উত্তর দেন, 'আমি আপনার সহযোদ্ধা জাওয়াহিরি।' এ কথা শুনে তিনি চমকে যান। পাশের জনকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কে।' উত্তরে তিনি

বলেন, 'আমি আপনার সহযোদ্ধা বিন লাদেন।' তিনি বলতে থাকেন, 'মুহতারাম শায়খদ্বয়, আমি আপনাদের কপালে চুম্বন করতে চাই।' এরপর তিনি সকলের সঙ্গে পরিচিত হন এবং কপালে চুমু খান।'

শায়খ বিন লাদেনের খাওয়া-দাওয়ার জন্য আলাদা কোনো স্থান নির্ধারিত ছিল না। তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে বসে আহার করতেন। তাঁরা যা খেতেন, তিনি তা-ই খেতেন। নেতা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিশেবে বিশেষ কিছু আহার করতেন না। খাবারের সময় আশপাশে বসা ব্যক্তিদের নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করতেন।

তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে হাসি-কৌতুক ও মজাদার কথা বলতেন। একবার এক যোদ্ধা তাঁর কাছে এসে বলেন, 'আমি পার্থিব বিলাস-বিনোদন চাই না, আমি আফগানিস্তানে থাকতে চাই না; আমি চেচনিয়া চলে যেতে চাই।' শায়খ এক মুঠি বালু তুলে ধরে বলেন, 'পৃথিবীর ভোগবিলাস কি এই?' এ কথা বলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আফগানিস্তানের মাটি ব্যতীত এখানে ভোগবিলাসের কী আছে!

একবার এক ব্যক্তি জুমুআর সালাতে মসজিদে এসে দেখতে পান, শায়খ উসামা বিন লাদেন জুমুআর সালাতের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি মনে মনে ভাবেন আজ আমি খুতবা শুনব না; শুধু তাঁকে দেখেই যাব। তিনি দেখেন শায়খ তাঁর পকেট থেকে কুরআনুল কারিম বের করে তিলাওয়াত শুরু করছেন। কিছুক্ষণ তিলাওয়াতের পর দীর্ঘ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কুরআনের কোনো আয়াত যেন তাঁকে গভীর ভাবনায় বিভোর করে রেখেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর খতিব জুমুআর খুতবা দেওয়া শুরু করলে তিনি কুরআনুল কারিম রেখে খুতবা শুনতে থাকেন।

একবার সুদানে এক বৃদ্ধা তাঁর কাপড় ধরে সাহায্যের মিনতি করে। তিনি অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতেন। তখন তাঁর কাছে সাহায্য করার মতো কিছু ছিল না। তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে তাকে দান করেন। বৃদ্ধা এত পরিমাণের সাহায্য পেয়ে কান্না শুরু করে দেয়। সে তখন শায়খের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রাণখুলে প্রার্থনা করে চলে যায়।

তোরাবোরা পাহাড়ে মার্কিন হামলার ভয়াবহ দিনগুলোতে এক মুজাহিদ শায়খের কাছে আসেন। তাঁর কাছে তখন কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। শায়খ তাঁর অবস্থা দেখে নিজের ছেলের অস্ত্রটি নিয়ে তাঁকে দিয়ে দেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির। সব সময় চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতেন। একবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ চলাকালে তাঁকে খুব চিন্তিত থাকতে

দেখে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কী ভাবছেন?' শায়খ বলেন, 'আমি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা ভাবছি।'

তিনি তাঁর আফগান সহযোদ্ধাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে প্রায়শ বলতেন, 'যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে পাতা ও শুকনো ঘাস খেয়ে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ।'

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ও মার্কিন আক্রমণের কিছুকাল পূর্বে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজের টাকা খরচ করে ফারুকিয়া সেনাঘাঁটি সংলগ্ন জায়গায় বেশকিছু ঘর নির্মাণ করেন। এসব ঘরের কোনো দরজা-জানালা ছিল না; কিন্তু বিমান থেকে এগুলোকে মুজাহিদদের ঘর মনে হতো। মার্কিন বাহিনী হামলা শুরু করলে তিনি দুজনকে এসবের ওপর নজরদারির নির্দেশ দেন। তাঁরা বলেন, 'মার্কিনরা সেনাদের ঘাঁটি মনে করে এসব ঘর লক্ষ করে অজস্র বোমা হামলা করে সবগুলো গুড়িয়ে দেয়। এভাবেই তিনি মার্কিনদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন।

একবার তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের সূর্যাস্তের পূর্বে জনমানবহীন অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা আগুন জ্বালিয়ে সেখান থেকে চলে যেত; আর মার্কিন বাহিনী সেখানে মুজাহিদের অস্তিত্ব কল্পনা করে ব্যাপক বোমা হামলা করত। এভাবেই তাঁর কৌশলী পরিকল্পনায় মার্কিনদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের অপব্যয় হতো।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ও মার্কিন যুদ্ধের আগে একবার এক মুজাহিদ শায়খের আসবাবপত্র নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে ছোট একটি কামরা দেখতে পান, যেখানে শুধু একটি জায়নামাজ বিছিয়ে রাখা যায়। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো এখানের আসবাবপত্র তিনি আসার পূর্বেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শায়খের পুত্র তাঁকে বলেন, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমার পিতা এখানে একা অবস্থান করেন।'

ফিকহে হানাফি ও উসামা বিন লাদেন

ফিকহে হানাফির ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আস-সিয়ারুল কাবির*। অনবদ্য এই গ্রন্থটি ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত। জিহাদ-সংক্রান্ত তাঁর আরও কয়েকটি গ্রন্থ থাকলেও এটি তাঁর লেখা শেষ গ্রন্থ। ৫০ খণ্ডের এ বিশাল গ্রন্থটি খলিফা হারুনুর রশিদ দেখতে চাইলে তাঁর দরবারে আনার জন্য গরুগাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়।

পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত ফকিহ শামসুল আয়িম্মা সারাখসি রাহ. এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা রচনা করেন। তৎকালের শাসক তাঁকে পরিত্যক্ত কূপে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তাঁর হাজারও ছাত্র কূপের পাড়ে এসে অবস্থান করত। তিনি কূপের ভেতর থেকেই ইমাম মুহাম্মাদের লেখা গ্রন্থটি পড়ে তাঁদের সামনে নিজের রচিত ব্যাখ্যা তুলে ধরতেন।

ইসলামাবাদের মাওলানা আবদুল্লাহ শহিদ বলেন, ইমাম সারাখসির রচিত এই গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য একটি গ্রন্থ। আমি বহুদিন ধরে এর খোঁজ করছিলাম। একপর্যায়ে আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। সৌভাগ্যবশত তখন জিহাদের কাণ্ডারি সৌদিআরবের যুবরাজ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন, 'ইমাম মুহাম্মাদ *আস-সিয়ারুল কাবির* গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাফিরদের কাছে লোহা বিক্রি করা জায়িজ নেই। কেননা, তারা এর মাধ্যমে অস্ত্র তৈরি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।' তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের হানাফি আলিমদের কাছে আমার প্রশ্ন, কাফিরদের কাছে যখন লোহা বিক্রি করা জায়িজ নেই, তখন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে পেট্রোল বিক্রি করা কীভাবে বৈধ হবে, যা বর্তমানের মৌলিক অপরিহার্য যুদ্ধ-সরঞ্জামের অন্তর্ভুক্ত? ট্যাংক, যুদ্ধবিমানসহ প্রায় সকল কিছুই এর ওপর নির্ভরশীল।' তিনি আমাকে বলেন, 'যখন আপনি পাকিস্তানে যাবেন, তখন আমার পক্ষ থেকে আলিমগণের সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধরবেন।'

শায়খ উসামা বিন লাদেন আরও বলেন, 'অবশ্য আরব দেশগুলো থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা নামমাত্র মূল্যে তেল ক্রয় করে নিচ্ছে। চিন্তার বিষয়, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে এক ব্যারেল তেল ৪০ ডলার ছিল, আজ সেই তেল ১৩ ডলারে বিক্রি হচ্ছে; অথচ ১৯৭৫-এর পর থেকে সবকিছুর মূল্য ঊর্ধ্বগামী।

মাওলানা আবদুল্লাহ শহিদ বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, '*আস-সিয়ারুল কাবির* গ্রন্থটি কি পাওয়া যায়?' উত্তরে তিনি বলেন, 'এই গ্রন্থটি ব্যাখ্যাসহ আমার কাছে আছে। আপনি চাইলে আমি হাদিয়া দিতে পারি।' তখন আমার যে আনন্দ ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়েছিল, তা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারব না, কলমে প্রকাশের ভাষাও আমার নেই।'

উসামা বিন লাদেনের মায়ের স্বপ্ন

যখন শায়খ উসামা বিন লাদেনকে সুদান ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়, তখন তিনি বলেন, 'আমি আমার মায়ের নির্দেশ ব্যতীত কোথাও যাব না।' অতঃপর তিনি

পরামর্শের জন্য মায়ের কাছে ফোন করেন। মা তাঁকে বলেন, 'কয়েকদিন পর জানাব তোমাকে কোথায় যেতে হবে।'

কিছুদিন পর মায়ের কাছে পুনরায় ফোন করলে তিনি তাকে জানান, 'তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, এক দিকে ইসা আ., আরেক দিকে মুসা আ. আসন গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের দুজনের মাঝে উসামা বিন লাদেন বসে আছেন। ঈসা আ. উসামা বিন লাদেনের পিঠে হাত রেখে মুসা আ.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'একে কোথায় পাঠাবেন? তখন মুসা আ. বলেন, 'তাকে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিই।' এ থেকে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের বোঝা উচিত, যাঁর সঙ্গে তোমরা বিদ্বেষ পোষণ করছ, তাঁর হিফাজত আল্লাহর নির্দেশে দুজন গুরুত্বপূর্ণ নবির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। আর আল্লাহ যার হিফাজত ও দিকনির্দেশনা নবিগণের মাধ্যমে করেন, সে কীভাবে ভ্রষ্ট হতে পারে?

উসামা আপনার প্রতিশ্রুতি কখন পুরো করবেন

—স্যার, আমি আপনাকে একটি জিনিস দেখাতে চাই!

—অবশ্যই, দেখাও।

ল্যাপটপ হাতে এক ব্যক্তি কথা বলছিল শায়খ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে। ল্যাপটপে তখন একটি ভিডিয়ো চলতে শুরু করে। এটি ছিল ফিলিস্তিনের দৃশ্য। ধ্বংসস্তূপে ভরতি একটি ইসলামি রাষ্ট্রের দৃশ্য। অশ্রুসিক্ত হয়ে ভিডিয়োর দৃশ্যে যেন ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। একটি ছোট ফিলিস্তিনি শিশু ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে শায়খের ছবি তুলে ধরছিল। অশ্রুঝরা করুণ চাহনি নিয়ে সে ছবির দিকে ইঙ্গিত করে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল, 'উসামা, তোমার প্রতিশ্রুতি কখন পূরণ করবে, নিজের প্রতিশ্রুতি কখন পুরা করবে?'

শিশুটি কান্নাভরা কণ্ঠে বার বার এ শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করছিল। এ দৃশ্য দেখে শায়খ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তিনি তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে কান্না করছিলেন আর বলছিলেন, 'পৃথিবীর আপন-পর সবাই যার শত্রু? বিশ্ববাসী যাকে হরদম হত্যার পরিকল্পনা করছে, তার কাছে তুমি কী চাও?' কান্নায় শায়খের কণ্ঠ বুজে আসছিল। ইসলামের এই মহান বীর তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে হুঁশ হারিয়ে ফেললে তাঁকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। হুঁশ ফিরে এলেও সেই শিশুর আর্তনাদগুলো যেন তাঁর অন্তরে কশাঘাত হানছিল। তিনি আবারও কান্না করতে থাকেন। প্রায় তিন দিন পর তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রতিচ্ছায়া

শৈশব থেকেই শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহ. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করতে পছন্দ করতেন। একদিন তিনি এমন একটি গ্রন্থ পড়া শেষে নিজে নিজেই ভাবছিলেন খালিদ রা.-এর পিতা ওয়ালিদের নিশ্চয় আরও অনেক সন্তান ছিল; কিন্তু ইতিহাস তাঁর সেই সন্তানদের স্মরণ করেনি কেন? শেষপর্যন্ত তিনি অনুধাবন করেন, মানুষ নিজের কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর অন্তরে বসবাস করে; ধনসম্পদ, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির কারণে নয়। তিনি চিন্তা করেন, উহুদযুদ্ধ থেকে উমর রা.-এর যুগ পর্যন্ত হিজাজের ইতিহাসে হাজারো ব্যবসায়ী, অসংখ্য চিকিৎসাবিদ ও স্থাপত্যবিশারদ অতীত হয়েছেন; কিন্তু ইতিহাস কাউকে এভাবে স্মরণ করেনি, যতটা খালিদ বিন ওয়ালিদকে স্মরণ করে। তাঁর ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকগণ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন এবং তাঁর কর্মযজ্ঞের আলোচনায় ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেন।

মায়ের ইচ্ছা ও তাকদিরের প্রতিদান

ছোটবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল নিজেকে এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত করা, যিনি আল্লাহর পথে খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো জিহাদরত থাকবেন; কিন্তু তাঁর মা চাইছিলেন তিনিও তাঁর অন্য ভাইদের মতো ব্যবসাবাণিজ্যে মনোনিবেশ করবেন। মা শঙ্কিত ছিলেন, ব্যবসাবাণিজ্যে অংশগ্রহণ না করলে তাঁর ভাইয়েরা বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা নিয়ে যাবে এবং তা তাঁর হাতছাড়া হবে। তাই তিনি বলতেন, 'দেখো উসামা, ব্যবসায় মনোনিবেশ না করলে পাঁচ বছর পর তুমি রাস্তায় নেমে আসবে।' কিন্তু শায়খ তাঁর মায়ের কথা কানে তুলেননি।

অশ্বারোহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

শায়খ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অশ্বারোহণ ও পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। ইথিওপিয়ার একজন অশ্বারোহীর কাছ থেকে তিনি ঘোড়দৌড় শিখেছিলেন। আবদাল নামে তাঁর পিতার একজন কর্মচারী ছিল। তিনি মুহাম্মাদ বিন লাদেনের আস্তাবলে ঘোড়ার দেখাশোনা করতেন। প্রতিদিন আস্তাবলে যেতেন। তাঁর আগ্রহের দিকে লক্ষ্য করে আবদাল তাঁকে ঘোড়দৌড়ের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

ঘোড়ার আচরণ, কোন প্রকারের ঘোড়ার কী বৈশিষ্ট্য, ঘোড়াকে কীভাবে বাগে আনতে হয়, এ সবই তিনি আবদালের কাছ থেকে শিখেছিলেন। একবার এক সাক্ষাৎকারে

তিনি বলেছিলেন, 'যদি কেউ মুজাহিদ হতে চায় তাহলে যেন শুরুতেই ঘোড়দৌড় শিখে নেয়। ঘোড়দৌড়ে পারদর্শী হওয়া ব্যতীত ভালো মুজাহিদ হওয়া সম্ভব নয়।'

হজরত মাহদির বাহিনীর জন্য রেখে যাওয়া সম্পদ

শায়খের পিতা মুহাম্মাদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন হজরত মাহদির জন্য একটি ফান্ড সঞ্চয় করেন, যেখানে তিনি জীবনের বহু উপার্জন একত্র করেছিলেন। মুহাম্মাদ বিন লাদেনের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি রিয়াল এ ফান্ডে জমা হয়েছিল। তাঁর পিতা এ বিশাল অর্থ তাঁর মায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে ওসিয়ত করেছিলেন, এ অর্থ যেন মাহদির সহযোগিতায় ব্যয় করা হয়। শায়খ আফগানিস্তানের প্রথম যুদ্ধে তাঁর মায়ের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে জিহাদে ব্যয় করেন। তিনি বলেন, 'আমার পিতা এই সম্পদ জিহাদের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছিলেন।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

আফগানিস্তানের জিহাদ ও উসামা বিন লাদেন

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অঢেল সম্পদ ব্যয়ের পাশাপাশি শায়খ উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে সরাসরি সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নাঙ্গারহারে আরব মুজাহিদদের ক্যাম্পে তিনি প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব যুদ্ধ-ক্যাম্পে ৭০০-এর বেশি আরব ও আফগান মুজাহিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, যাঁদের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মুজাহিদ প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

শায়খ আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একবার রুশবাহিনী অত্যন্ত তৎপর হয়ে তাঁকে খুঁজছিল। তিনি তাদের থেকে মাত্র ৩০ মিটার দূরে ছিলেন। রুশবাহিনীর পক্ষ থেকে ব্যাপক বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। ট্যাংকের একটা গোলা তাঁর খুব কাছে এসে পড়ে। আরও চারটা গোলা তাদের ক্যাম্পেই পতিত হয়; কিন্তু এসবের একটাও বিস্ফোরিত হয়নি। যুদ্ধের ময়দানে তিনি তিন-চারবার আহত হয়েছিলেন। একবার বোমার আঘাতে আহত হন, আরেকবার ঘোড়া থেকে পড়ে তাঁর হাড় ভেঙে যায়। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ অর্থোপেডিক সার্জন ডাক্তার আমির আজিজ তাঁর চিকিৎসা করেন। এই অপরাধে ডাক্তার আমির আজিজকে আইএসআই এবং সিআইএ কয়েক মাস কারাবন্দি করে রাখে।

যুদ্ধ-ময়দানের গোলাবারুদ ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ তাঁকে আতঙ্কিত করত না। এসব শব্দের সঙ্গে তিনি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত ছিলেন। স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ছোটবেলা থেকে পাহাড় খোদাইসহ বিভিন্ন কাজে গোলাবারুদ ও বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে তিনি ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে মেশিনগান চালানোয় ছোটবেলা থেকেই তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি বলতেন, 'আমার পিতা ছোটবেলা থেকে

আমার অন্তরে একমাত্র আল্লাহর ভয় গেঁথে দিয়েছিলেন, তাই আমি আমেরিকা-রাশিয়া ও ইসরাইলকে নিয়ে তটস্থ থাকি না; আমরা চাইলেই তাদের ঘুম হারাম করে দিতে পারি।'

সুদানে অবস্থানকালে প্রচণ্ড গরমেও তিনি এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার করতেন না। বলতেন, 'আমি বিলাসী জীবন পছন্দ করি না। একজন সত্যিকারের মুজাহিদের জীবন কাটে পাহাড়ে, পর্বতে, উপত্যকায়।' আফগান জিহাদে তিনি একজন সাহসী কমান্ডার হিশেবে পরিচিত ছিলেন। পাকতিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অল্প জনবল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তিনি সেখানে বিজয়ী হয়েছিলেন। ওই যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি রুশ-বাহিনীকে পরাজিত করে রাশিয়ার এক জেনারেলের কাছ থেকে একে-৪৭ গনিমত হিশেবে অর্জন করেছিলেন, যা সবসময় তাঁর কাছেই থাকত।

আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়েও তিনি মুজাহিদদের জন্য খাদ্যগুদাম ও হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। এ নির্মাণকাজে তিনি দুঃসাহসিকভাবে রাশিয়ান হেলিকপ্টারের আওতায় গিয়ে স্বয়ং বুলডোজার চালাতেন। এর পাশাপাশি কালাশনিকভ হাতে নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জাজি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাত্র ১৫-২০ জন আরব মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে তিনি রাশিয়ান বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছিলেন। ভয়াবহ প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের পরাজয় নিশ্চিত করেছিলেন।

এক বছর পর তিনি আবার শাবান নামক স্থানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ওই যুদ্ধে মুজাহিদরা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। শত্রুরা মুজাহিদদের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। নিজেদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি রাশিয়ান বাহিনীকে তাঁরা প্রবল-প্রতিরোধের মাধ্যমে পিছপা হতে বাধ্য করেছিলেন।

মুহাম্মাদ হামজা আফগানযুদ্ধে অংশ নেওয়া একজন ফিলিস্তিনি মুজাহিদ। পরবর্তী সময়ে তিনি সুদানে বিন লাদেন কোম্পানির কর্মকর্তা হিশেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'শায়খ ছিলেন আমাদের জন্য একজন সত্যিকারের নায়ক। তিনি সর্বদা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে সকলের আগে থেকে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল নিজের সম্পদই ব্যয় করেননি; স্বয়ং উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করতেন। অঢেল ধনসম্পদ ও বিলাসবহুল অট্টালিকা ছেড়ে আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে অবস্থান করতেন। তাঁদের সঙ্গেই খাবার ও রান্নাবান্না করতেন। তাঁদের সঙ্গেই পরিখা খননে অংশগ্রহণ করতেন।'

তানজিম আল কায়িদা ওয়াল জিহাদ

তানজিম আল কায়িদা ওয়াল জিহাদ—বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে এখন আল কায়দা নামে পরিচিতি, নব্বইয়ের দশকে উসামা বিন লাদেন তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি বর্তমানে আল্লাহর মনোনীত দীনের মর্যাদা সমুন্নত করতে ও রাসুল সা.-এর জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া একটি জিহাদি সংগঠন। আল কায়দা শুধু অনাকয়েক সদস্যের একটি সংগঠন নয়; বর্তমানে এটি একটি আদর্শের নাম। বিশ্বব্যাপী যেখানেই কাফিরদের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হয়, সেখানেই কাফির ও তাগুতি শক্তির চোখে চোখ রেখে উম্মাহর পক্ষে প্রতিরোধে নাম আসে আল কায়দা। উম্মাহর পক্ষ থেকে দুশমনদের বিরুদ্ধে যেখানেই যুদ্ধের ঘোষণা যেখানে আসে, সেখানেই নাম চলে আসে আল কায়দার। বর্তমানে যেন জিহাদ ও আল কায়দা একটি অপরটির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, এটি কোনো গতানুগতিক সংগঠন নয়; উম্মাহর পক্ষ থেকে শরিয়তসম্মত পদ্ধতির যেকোনো প্রতিরোধ ও জিহাদ—চাই তা যেকোনো নামেই হোক, যেন আল কায়দা নামটিই তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

রুশবিরোধী যুদ্ধে উসামা বিন লাদেন

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। আফগানিস্তানের উদ্দেশে আরব মুজাহিদদের প্রথম কাফেলা পেশোয়ারে এসে পৌঁছায়। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ৪০ জন নাগরিক এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম পেশোয়ার পৌঁছে আরব মুজাহিদদের এ দলটিকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁদের অবস্থানের জন্য প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করেন। আফগান মুজাহিদ ও বেসামরিক আফগানিদের জন্য বহু দাতব্য সংস্থা স্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আফগান মুজাহিদ ও শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তাপ্রদান শুরু করেন।

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। মালিক আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে শায়খের সঙ্গে আবদুল্লাহ আজ্জামের পরিচয় হয়। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম ছিলেন সেখানের শিক্ষক। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সহমর্মী হিশেবেও তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ দৃঢ় হয়। ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা উসামা বিন লাদেনের পরিবারের সহযোগিতার কথা কখনো ভুলতে পারবে না। অজ্ঞতার কারণে অনেকে মনে করে, ফিলিস্তিনের সঙ্গে শায়খ উসামা বিন লাদেনের কোনো সম্পর্ক

নেই; বরং তিনি জোর করে তাদের ব্যাপারে কৃতিত্ব নিয়ে নিতে চান। লাদেন-পরিবারের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সম্পর্ক মূলত মুহাম্মাদ বিন লাদেনের যুগ থেকে। এ প্রেক্ষাপটে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম শায়খ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে আফগান জিহাদে আর্থিক সহযোগিতার অনুরোধ জানান। দূরদর্শী শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম বুঝতে পেরেছিলেন, বিন লাদেনের মাধ্যমে শুধু তাঁর একার নয়; উপসাগরীয় আরও বিভিন্ন অঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে।

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম পেশোয়ারের ইউনিভার্সিটি এলাকায় 'মাকতাবুল খিদমাত' নামক দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উসামা বিন লাদেন এ সংস্থার অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি সেখানে বেশ কিছু গেস্ট হাউস ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে আরব থেকে আগত মুজাহিদরা অবস্থান করতেন। সেখানেই তাঁদের আত্মিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বায়তুল আনসার' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা 'মাকতাবুল খিদমাত'-এর সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করত। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার মাধ্যমেই অন্যান্য ইসলামি দেশের দাতব্য সংস্থাগুলো মুজাহিদদের সাহায্য করত। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মাকতাবুল খিদমাত' মার্কিন সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সিআইএর একজন সাবেক অফিসার এক সাক্ষাৎকারে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, 'মাকতাবুল খিদমাত কখনো মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করেনি।' মুসলিমবিশ্বের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ সংস্থার অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। একপর্যায়ে এ সংস্থাটি আরব মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় সংস্থায় পরিণত হয়। এ সংস্থার কর্তাব্যক্তিরাই মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম আরব মুজাহিদদের সঙ্গে স্বয়ং জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

বিন লাদেন ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জালালাবাদে ছয়টি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে যুদ্ধপ্রস্তুতি ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এ ছাড়াও খোস্ত, কান্দাহার, পাকতিয়া এবং লোগোর শহরে সামরিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাশিয়ান সৈন্যদের আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার সময় এ ক্যাম্পগুলো আরব ও অন্যান্য আফগান মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিশেবে গণ্য হতো, যেখানে ফিলিস্তিন ও মিসরের অসংখ্য মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিল। অতঃপর সিরিয়া, জর্দান, আলজেরিয়া, তুরস্ক, ফিলিপাইন, কাতার, ইন্দোনেশিয়া ও সৌদিআরবের বিভিন্ন মুজাহিদ সেখানে যোগদান করতে থাকেন। ইউরোপ-আমেরিকার ধনাঢ্য মুসলমান ও সংস্থা মুজাহিদদের আর্থিক সহায়তা করতে শুরু করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'মাকতাবুল খিদমাত' আমেরিকার ব্রুকলিনে নিজেদের অফিস চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। ইউরোপীয়

বিভিন্ন দেশেও এ ধরনের বেশ কিছু শাখা খোলা হয়; কিন্তু আফগানিস্তানের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর এ সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের ওপর অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। বিশ্বব্যাপী জিহাদি সংগঠন হিশেবে কালো তালিকাভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন 'মাকতাবুল খিদমাত'-এর পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে।

১৯৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো আফগান মুজাহিদদের নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিয়েছিল। তালেবানদের কাছে এর প্রতিরোধের কোনো উপায় ছিল না। এক বছরে বহু হতাহতের শিকার হতে হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা থেকে উত্তরণের জন্য শায়খ তাৎক্ষণিক সৌদিআরব চলে যান। সেখানে বিন লাদেন কোম্পানির হারামাইন শরিফাইনের সংস্কার কাজে ব্যবহৃত বড় বুলডোজার ও পাহাড় ভাঙার মেশিনসমূহ সামুদ্রিক জাহাজে করে করাচি বন্দরে নিয়ে আসেন। অতঃপর সেখান থেকে সড়কপথে আফগানিস্তানে পৌঁছানো হয়। তারপর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তিনি পাহাড়ে খোদাই কাজ আরম্ভ করেন। রুশ বিমানের আক্রমণ এড়িয়ে সুড়ঙ্গপথে মুজাহিদদের চলাফেরার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেন। তাঁর নিকটতম বন্ধু—ইরাকি বংশোদ্ভূত ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ সাআদ—সুড়ঙ্গ খননে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এভাবেই তাঁরা কাবুল শহরের সন্নিকটে ১৫ কিলোমিটারব্যাপী সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে ফেলেন। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ আফগান মুজাহিদদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়।

যেহেতু তিনি বিন লাদেন কোম্পানির পার্টনার ছিলেন, সেই সুবাদে C130 বিমান ও সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে স্থাপত্য কাজের প্রয়োজনীয় বড় বড় মেশিনাদি আফগানিস্তানে আনার কাজ শুরু করেন, যেসব মেশিনের মাধ্যমে পাহাড়ে মুজাহিদদের জন্য গোপন বাংকার ইত্যাদি প্রস্তুত করা হতো। এসব কাজের জন্য মূলত করাচি ও পেশোয়ারের বিমানবন্দর ব্যবহার করা হতো। প্রশস্ত বাংকারসমূহে তাঁদের অবস্থানের পাশাপাশি গোপন অস্ত্রাগারও তৈরি করা হয়। রুশবাহিনীর ব্যাপক গোলাবর্ষণে এসব বাংকার সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকত।

তাঁর বানানো এসব বাংকার ও সেখানে সংরক্ষিত অস্ত্র আর গোলাবারুদ আজও আফগানিদের কাজে আসছে। তোরাবোরা পাহাড়ের প্রসিদ্ধ সেই বাংকার, যেখানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতনের সময় তিনিসহ অসংখ্য আরব মুজাহিদ পরিজনদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন, সেটিও তখনকার নির্মিত। আমেরিকা সেখানে হাজার হাজার টন গোলাবারুদ নিক্ষেপ করেছিল। আফগানিস্তানে তাঁর নেওয়া যন্ত্রপাতির মধ্যে অত্যাধুনিক বুলডোজার ও খোদাই কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছিল

অন্যতম, যার মাধ্যমে পাহাড়ের অভ্যন্তরে মুজাহিদদের বসবাসের ক্যাম্প, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। পাহাড়ের উপরিভাগ ও সুড়ঙ্গপথে বহু রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। তিনি নিজেই এসব কাজ দেখাশোনা করতেন এবং মুজাহিদদের অনুপ্রাণিত করতেন।

জাজি প্রান্তরের যুদ্ধ

জাজির প্রান্তরে শায়খ উসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে মুজাহিদরা রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, যা বর্তমান সমরবিদ্যার ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় হিশেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এ যুদ্ধে তিনি তাঁর সঙ্গে হাতেগোনা কয়েকজন মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে তাঁদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বড় রুশ সেনাদলকে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধের আলোচনায় শায়খ বলেন,

> ১৪০৪ হিজরিতে আমরা আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি সামরিক ক্যাম্প নির্মাণ করি। সর্বশেষ জাজি অঞ্চলে আরও একটি ক্যাম্প স্থাপন করি। গরমের দিনে সেখানে শতাধিক আরব মুজাহিদ অবস্থান করতেন; কিন্তু শীতের শুরুতে তাঁরা সেখান থেকে ফিরে গেলে মাত্র জনাদশেক মুজাহিদ সেখানে অবস্থান করছিলেন। ১৪০৬ হিজরির শেষ ও নতুন বছরের শুরুতে আমরা জাজি অঞ্চলে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমরা ছিলাম মাত্র ১১ জন সাথি। অধিকাংশই ছিল মদিনার নওজোয়ান। আমাদের সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ বলেন, শত্রুদের ঘাঁটির কাছে একটি পাহাড় হেডকোয়ার্টার বানানোর জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত; কিন্তু সেখানে কোনো রসদ পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না বলে হেডকোয়ার্টার বানানো সম্ভব হচ্ছে না। আমি নিয়ত করি, ইনশাআল্লাহ আমরা সেখানে আমাদের হেডকোয়ার্টার বানাব। আমরা তিনজন পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করে দিই। জায়গাটি শত্রুদের অবস্থানের নিকটবর্তী হওয়ায় সেখানে নিয়মিত মিসাইল হামলা হতো। শত্রুবাহিনীর পক্ষ থেকে মিসাইল হামলা শুরু হলে আমরা পাহাড়ের অন্য দিকে চলে যেতাম। সেখানে আমরা তাঁবু ও পরিখা খনন করে অবস্থান করতে থাকি। শত্রুদের ওপর নজরদারি করতে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই দীর্ঘদিন কেটে যায়। এদিকে ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সাতজন, অতঃপর দুই মাসের মধ্যে আমাদের সংখ্যা ৪০ অতিক্রম করে। সে সময় আবু হানিফা নামে এক ভাই আমাদের সঙ্গে অবস্থান করছিল। সে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন

অবস্থান করে পড়ালেখা সমাপ্তির জন্য চলে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে আমাদের সঙ্গে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং চার বছর পরে জালালাবাদে শাহাদাতবরণ করে। সেখানে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর একবার হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ২৩ দিন পর তাঁর সঙ্গে নতুন ২৩ জন সহযোদ্ধা নিয়ে ফিরে আসে। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে সেই মারকাজে অবস্থান করতে থাকে। মা'সাদাতুল আনসার পরিচয়ে আমরা সেখানের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতাম।

১৪০৭ হিজরির রমজান মাসে আমরা শত্রুবাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদ পাই। ১৪ রমজান আমাদের পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলি। আমাদের লক্ষ্য ছিল, শত্রুদের কোয়ার্টার ধ্বংস করা এবং শত্রুদের জন্য জাজি-অভিমুখী রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে ছিল না। ২৬ রমজান শত্রুরা আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করে। তারা আমাদের কেন্দ্র লক্ষ্য করে BM-21 মিসাইল নিক্ষেপ শুরু করে। এ যুদ্ধ তিন সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। তারা দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছিল; কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি ছিল বড়জোর একদিনের। রমজানের দিনগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী ট্যাংকবহর নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করেন। আমরা আমাদের অল্পস্বল্প অস্ত্র নিয়েই তাদের মোকাবিলা করি। এ যুদ্ধ বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয়। শেষপর্যন্ত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে রুশবাহিনী পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আফগানযুদ্ধে বিন লাদেনের উপলব্ধি

আফগানযুদ্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উসামা বিন লাদেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,

> আমি আফগানিস্তানের যুদ্ধ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীত এসবের উপলব্ধি সম্ভব ছিল না। এটি ছিল আমার জন্য একটি সোনালি যুগ। জীবনের হাজার বছরের চেয়ে এ সময়কে আমি সেরা মনে করি। আমি মনে করি, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও সহযোগিতায় আমি এই অনুভূতি লাভ করেছি। রুশবাহিনীর অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে থাকি এবং আল্লাহ্ সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সহযোগিতা করেন। হাজার টনের বেশি বিভিন্ন উপকরণ, বুলডোজার

ও খননকারী মেশিন আমরা বহু দূর থেকে বহন করে আনি। রুশবাহিনীর গোলা ও বোমাবাজি থেকে বাঁচতে আমরা মাটির নিচে হাসপাতাল তৈরি করি। মাটির নিচে বাংকার তৈরি করি। পাহাড়ে চলাচলের রাস্তা তৈরি করি। আল্লাহর অনুগ্রহে এসব কাজে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিও সমৃদ্ধ হতে থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, পরাশক্তির যে ভীতি ও আতঙ্ক আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল, তা একেবারেই মিলিয়ে যায়। হীনম্মন্যতা ও ক্লান্তি আমাদের থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয়। আমেরিকার দুর্জয় প্রতিপত্তি আমাদের মন থেকে মুছে যায়। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে সকল মুসলমানের অন্তর থেকে পশ্চিমা পরাশক্তির প্রভাব দূরীভূত হয়ে ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ ও শক্তির নতুন জাগরণ তৈরি হয়েছে। আমেরিকান চিন্তাচেতনা ও জীবনশৈলী থেকে ইসলামি ভূখণ্ডকে মুক্ত করতে পরস্পরকে পরিপূর্ণ সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়।

আমেরিকা ও মার্কিন জোটভুক্ত শক্তিগুলো ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিল 'মাকতাবুল খিদমাত' ও তাঁদের সমমনা শক্তি আফগানিস্তানে কখনো মার্কিন তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। আফগানিস্তানের মুজাহিদ-নেতৃত্বে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের বেশ প্রভাব ছিল। তিনি শুরু থেকেই পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মুজাহিদদের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে আমেরিকাও পূর্ণ অবগত ছিল। আমেরিকা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল, আবদুল্লাহ আজ্জামের উপস্থিতিতে আফগানিস্তানের অন্যান্য আফগান নেতৃবৃন্দকে বাগে আনা সম্ভব হবে না। তাই ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পেশোয়ারে জুমুআর সালাত আদায়ের উদ্দেশে মসজিদে যাওয়ার প্রাক্কালে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ.-কে গাড়িবোমা হামলায় শহিদ করে দেয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুজন অল্পবয়স্ক ছেলেও শাহাদাতবরণ করে। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের বিপ্লবী ভূমিকায় আরব মুজাহিদদের বিশাল শক্তি সংগঠিত হয়।

আল কায়দা প্রতিষ্ঠা

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের শাহাদাতের পর আরব মুজাহিদরা আমেরিকার গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। নওশাহরাহ জেলার অন্তর্গত জলুজাই মুহাজির ক্যাম্পে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামকে দাফন করা হয়েছিল। তাঁর শাহাদাতের পর শায়খ উসামা বিন লাদেনকে আরব বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তত দিনে মাকতাবাতুল খিদমাত কায়িদাতুল জিহাদ বা জিহাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম তাঁর

অনুসারীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন—যতদিন আমেরিকার শক্তি খর্ব না হচ্ছে, ততদিন এই পৃথিবীতে কোথাও মুসলমানরা ইসলামি শরিয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কাফিরদের অধিকৃত মুসলিম অঞ্চলসমূহ, বিশেষত প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিসও হানাদারমুক্ত করা যাবে না।

বায়তুল মাকদিসকে ইহুদিমুক্ত করা, হারামাইনের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র আমেরিকান সৈনা থেকে নিরাপদে রাখা এবং বিশ্বব্যাপী আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত করা ছিল আল কায়দা প্রতিষ্ঠার মৌলিক লক্ষ্য। অধিকাংশ আরব-মুজাহিদ তখন আফগানিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তাই এখান থেকেই তাঁদের জন্য সামরিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক সম্মিলিত যুদ্ধের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ ছিল আরব-মুজাহিদদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির সূচনা। বর্তমানে তানজিম আল কায়িদাতুল জিহাদ পৃথিবীব্যাপী আল কায়দা নামে পরিচিত, যা বিশ্বজুড়ে মার্কিন সন্ত্রাসবাদের পতন, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা ও রাসুল সা.-এর জীবনপদ্ধতির মর্যাদা রক্ষায় জিহাদরত একটি সংগঠন।

আল কায়দা শুধু জনাকয়েক সদস্যের সংগঠন নয়, বর্তমানে এটি একটি আদর্শের নাম। বিশ্বব্যাপী যেখানেই কাফিরদের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হয়, সেখানেই কাফির ও তাগুতি শক্তির চোখে চোখ রেখে উম্মাহর প্রতিরোধে নাম আসে আল কায়দার। উম্মাহর পক্ষ থেকে দুশমনদের বিরুদ্ধে যেখানেই যুদ্ধের ঘোষণা হয়, সেখানেই নাম চলে আসে আল কায়দার। বর্তমানে জিহাদ ও আল কায়দা, যেন একটি অপরটির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, আল-কায়দা এখন আর গতানুগতিক কোনো সংগঠন নয়, উম্মাহর পক্ষ থেকে শরিয়তসম্মত পদ্ধতির যেকোনো প্রতিরোধ ও জিহাদ—চাই তা যেকোনো নামেই হোক—যেন আল কায়দা নামটিই তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিল, লাল-সেনারা যেখানে যায় সেখান থেকে ফিরে আসে না। দুর্জয় এই রুশবাহিনীকে মুজাহিদরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আফগানিস্তান থেকে পরাজিত করে ফেরত পাঠিয়েছে। রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের পাশাপাশি আরব-মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ.-এর বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা ও শায়খ উসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে আরব মুজাহিদগণ বিশ্ব-পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ ও পরাজিত করার সাহস লাভ করেছিলেন।

অনুসারীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন—যতদিন আমেরিকার শক্তি খর্ব না হচ্ছে, ততদিন এই পৃথিবীতে কোথাও মুসলমানরা ইসলামি শরিয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কাফিরদের অধিকৃত মুসলিম অঞ্চলসমূহ, বিশেষত প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিসও হানাদারমুক্ত করা যাবে না।

বায়তুল মাকদিসকে ইহুদিমুক্ত করা, হারামাইনের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র আমেরিকান সৈনা থেকে নিরাপদে রাখা এবং বিশ্বব্যাপী আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত করা ছিল আল কায়দা প্রতিষ্ঠার মৌলিক লক্ষ্য। অধিকাংশ আরব-মুজাহিদ তখন আফগানিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তাই এখান থেকেই তাঁদের জন্য সামরিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক সম্মিলিত যুদ্ধের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ ছিল আরব-মুজাহিদদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির সূচনা। বর্তমানে তানজিম আল কায়িদাতুল জিহাদ পৃথিবীব্যাপী আল কায়দা নামে পরিচিত, যা বিশ্বজুড়ে মার্কিন সন্ত্রাসবাদের পতন, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা ও রাসুল সা.-এর জীবনপদ্ধতির মর্যাদা রক্ষায় জিহাদরত একটি সংগঠন।

আল কায়দা শুধু জনাকয়েক সদস্যের সংগঠন নয়, বর্তমানে এটি একটি আদর্শের নাম। বিশ্বব্যাপী যেখানেই কাফিরদের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হয়, সেখানেই কাফির ও তাগুতি শক্তির চোখে চোখ রেখে উম্মাহর প্রতিরোধে নাম আসে আল কায়দার। উম্মাহর পক্ষ থেকে দুশমনদের বিরুদ্ধে যেখানেই যুদ্ধের ঘোষণা হয়, সেখানেই নাম চলে আসে আল কায়দার। বর্তমানে জিহাদ ও আল কায়দা, যেন একটি অপরটির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, আল-কায়দা এখন আর গতানুগতিক কোনো সংগঠন নয়, উম্মাহর পক্ষ থেকে শরিয়তসম্মত পদ্ধতির যেকোনো প্রতিরোধ ও জিহাদ—চাই তা যেকোনো নামেই হোক—যেন আল কায়দা নামটিই তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিল, লাল-সেনারা যেখানে যায় সেখান থেকে ফিরে আসে না। দুর্জয় এই রুশবাহিনীকে মুজাহিদরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আফগানিস্তান থেকে পরাজিত করে ফেরত পাঠিয়েছে। রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের পাশাপাশি আরব-মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ.-এর বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা ও শায়খ উসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে আরব মুজাহিদগণ বিশ্ব-পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ ও পরাজিত করার সাহস লাভ করেছিলেন।

সৌদিআরব প্রত্যাবর্তন এবং জাজিরাতুল আরবে মার্কিনদের আগমন

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদদের হাতে রুশদের বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সফলতা ধরা দেয়। রুশবাহিনী আফগানিস্তান থেকে পরাজিত হয়ে পিছু হটে। আফগান মুজাহিদ সংগঠনসমূহের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বে শায়খ উসামা বিন লাদেন চরম ব্যথিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের ফল যেন ব্যর্থ না হয় এবং আফগান মুজাহিদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় যেন আফগানিস্তানে ইসলামি শরিয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এ জন্য তিনি তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সফল হতে পারছিলেন না। এ পরিস্থিতিতে তিনি সৌদিআরব চলে যান। তখন তিনি মিসর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়ামেন ও ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামি দল ও জিহাদি সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধকে পুঁজি বানিয়ে আমেরিকা হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে নিজেদের সেনা পাঠায়। উসামা বিন লাদেন জাজিরাতুল আরবে মার্কিন বাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি সৌদি রাজপরিবারের ক্ষমতাসীন বাদশাহ ফাহাদের কাছে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠান—'যদি তিনি আমেরিকার সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে মুজাহিদগণ আল্লাহর ওপর ভরসা করে ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং তাদের পরাজিত করবে।' কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাদশাহ ফাহাদ শায়খের কথায় কর্ণপাত না করে আমেরিকার আশ্রয়গ্রহণই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। ফলে শায়খ তাঁর এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন শহরের মসজিদসহ গণজমায়েতে সচেতনতামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলমানদের এ ব্যাপারে সোচ্চার করতে থাকেন। জাজিরাতুল আরবে মার্কিন-বাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে পাঁচ শতাধিক আলিমের স্বাক্ষরযুক্ত ফাতওয়া প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের কারণে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারিভাবে তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শায়খ বলতেন, 'রাশিয়া কমিউনিস্ট ব্লকের পরাশক্তি। রাশিয়ার অধঃপতনে পূর্ব ইউরোপ থেকে কমিউনিজম বিলীন হয়েছে। যদি আমেরিকার পতন হয়, তাহলে আরব ভূখণ্ডে রাজতন্ত্রের পতন ঘটবে। পবিত্র ভূমিতে নিজেদের সেনা জমায়েত করে আমেরিকা সবচেয়ে বড় ভুল করেছে। ১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন সৈন্য সৌদিআরবে কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? আজ মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ কোথায়? তারা কি নিজেরা আল্লাহর পবিত্র ঘরের হিফাজত করতে পারে না? রাসুল সা.-এর জন্মের

পূর্বে আবরাহার বাহিনী পবিত্র মক্কায় হামলা করলে আল্লাহ আবাবিলের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করেছিলেন। আজ পৃথিবীতে এক বিলিয়ন মুসলমান রয়েছে। এখন তো আর আবাবিল আসবে না। মুসলমানদের নিজেদেরই দাঁড়াতে হবে। হোয়াইট হাউসের পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত আল্লাহর ঘর নিয়ে চিন্তা করা।'

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মার্কিন সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলেন; কিন্তু দেড় বছরে তিনি ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিলেন, সৌদি-সরকার কোনোভাবেই মার্কিন সৈন্যদের সৌদিআরব থেকে বের করতে পারবে না। শেষপর্যন্ত তিনি সৌদিআরব থেকে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থানের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় তাঁকে নজরবন্দি করা হয়। বাদশাহ ফাহাদের অত্যন্ত আস্থাভাজন তাঁর এক ভাইয়ের মাধ্যমে তিনি বাদশার কাছে বার্তা পাঠান, 'তিনি ব্যবসায়িক কাজে পাকিস্তান যেতে চান।' স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহজাদা আহমাদের সঙ্গেও তাঁর ভাইয়ের গভীর সখ্য ছিল। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহজাদা নায়েফ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহজাদা নায়েফ কোনো এক বিদেশযাত্রায় গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহজাদা আহমাদ উসামা বিন লাদেনের বিদেশযাত্রার নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সৌদিআরব থেকে প্রথমে পাকিস্তান, অতঃপর আফগানিস্তানে পৌছান। আফগানিস্তানে তখনো মুজাহিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল চরম পর্যায়ে। শায়খ তাঁদের পারস্পরিক সন্ধি করাতে বহুমুখী চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত তিনি সেখান থেকে সুদান চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত সেনারা আফগানিস্তান থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এটি ছিল আফগান মুজাহিদদের এক বিশাল অর্জন। বহু শতাব্দী পর মুসলমানরা এমন বিজয় উদযাপন করেছে। জিহাদের সুফল ভোগ করা ও আফগানিস্তানে ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য এটি ছিল একটি সোনালি সুযোগ; কিন্তু পাকিস্তান ও সৌদি কূটনীতিকদের অপতৎপরতায় আফগান মুজাহিদদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শায়খ মুজাহিদদের অন্তর্দ্বন্দ্বে কোনো অংশের পক্ষাবলম্বন করেননি; তিনি বরং নিরপেক্ষ থেকে তাঁদের পারস্পরিক সন্ধি করাতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো প্রচেষ্টাই সফলতার মুখ দেখছিল না। এক পর্যায়ে তিনি আফগানিস্তানকে বিদায় জানিয়ে সৌদিআরব ফিরে যান। সেখানে তিনি নিজের বাণিজ্যিক কাজে জড়িয়ে পড়েন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর তিনি মুসলিমবিশ্বের শাসকদের

আমেরিকান ব্লকে যেতে দেখে চরম ব্যথিত হয়ে ওঠেন। এটা তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। আমেরিকার চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। আফগান জিহাদের পর আমেরিকা নিজের ধূর্ত খেলা শুরু করে। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের আড়ালে হারামের পবিত্র ভূমিতে মার্কিনদের দখলদারি শুরু হয়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন বাহিনী জাজিরাতুল আরবে প্রবেশ করলে শায়খ তা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেননি। ইরাকি আগ্রাসনের অব্যবহিত পরে তিনি হারামাইন শরিফাইনের শাসকদের কাছে নিজের সহযোদ্ধাদের নিয়ে পবিত্র ভূমির প্রতিরক্ষায় ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আল্লাহর সাহায্যে তাঁরা ইরাকি বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবেন, যেন এর পরিবর্তে সৌদি শাসকরা মার্কিন বাহিনীকে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে আসা থেকে বিরত রাখে; কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন পত্রিকা ও সাংবাদিকদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,

> পবিত্র আরব-ভূখণ্ডে মার্কিন লবির দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তারা পুরো অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর। মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ তাদের দখলদারির শিকার। এ প্রেক্ষিতে পুরো বিশ্বের মুসলমানদের নিজেদের এসব পবিত্রভূমি কাফিরদের নাগাল থেকে মুক্ত করতে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। সৌদিআরবসহ বিশ্বের ইসলামি গবেষক ও মুফতিগণ পবিত্র ভূমিতে মার্কিনদের অবস্থানের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করেছেন। কাবা শরিফের চতুর্দিকে আমেরিকান বাহিনী অবস্থান করছে। জিদ্দার মার্কিন ঘাঁটি ও মক্কা মুকাররমার মধ্যে মাত্র ৭০ কিলোমিটারের পার্থক্য। মক্কা শরিফের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলেও আমেরিকান বাহিনী ঘাঁটি তৈরি করছে। মুসলিম উম্মাহর এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড আজ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আগ্রাসনের শিকার। তাই তাদের আগ্রাসন থেকে এসব ভূখণ্ড মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব।

১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শায়খ তিনটি জিহাদি বার্তা প্রেরণ করেন, যার মধ্যে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিনদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও অন্যান্য ইসলামি পবিত্র স্থানের ওপর মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া ছিল অন্যতম। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক জিহাদের ঘোষণা দেন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট তিনি নিজের প্রথম বার্তা প্রেরণ করেন, যার শিরোনাম ছিল 'উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেনের পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা।' ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠনের

ঘোষণা দেন, যার নেতৃত্বে আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। আমেরিকা ও অন্যান্য কুফরি শক্তিকে সৌদিআরবের পবিত্র ভূমি থেকে বহিষ্কার, ইসরাইল ও আমেরিকার আগ্রাসন থেকে মুসলমানদের মুক্ত করা ছিল তাঁর মৌলিক লক্ষ্য।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সিএনএন রিপোর্টার পিটার আরনেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কয়েকটি কারণ তুলে ধরেন,

> আমার সামনে যখনই আমেরিকার আলোচনা করা হয়, তখন আমার সামনে লেবাননের কানআ অঞ্চলে ইসরাইলের নির্যাতনের চিত্র ভেসে ওঠে। নিরীহ অসহায় শিশুদের ওপর তাদের বোমাবর্ষণের সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারি না। অসংখ্য নিরীহ শিশু মৃত্যুর শিকার হয়েছিল। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারাও অঙ্গহানির শিকার হয়ে বেঁচে ছিল। এ ঘৃণ্য নৃশংসতার সঙ্গে আমেরিকা জড়িত থাকার এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে—এ জঘন্য বোমা হামলার শিকার অসহায় শিশুদের জন্য তারা কোনো শোকবার্তাও পাঠায়নি। অন্যায়-অবিচারের সকল সীমাই তারা লঙ্ঘন করেছিল। ইতিপূর্বে কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষ থেকে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটানো হয়নি। মার্কিন সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার বানিয়ে রেখেছে। খাদ্য ও ওষুধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরাকের ৬০ লাখেরও বেশি শিশুর জন্য মৃত্যুর দুয়ার খুলে দিয়েছে। নিজেদের এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের দায় মার্কিনদেরই নিতে হয়। এ যুদ্ধ এখন শুধু সামরিক পর্যায়ে নয়; সাধারণ মার্কিনরাও এর আওতায় চলে এসেছে।'

আরব ভূখণ্ডে আমেরিকান ঘাঁটি

আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তি জাজিরাতুল আরবে ২৩ টি ঘাঁটি স্থাপন করেছে। শায়খ তাঁর দেয়ালে লটকানো মানচিত্রে একবার লাঠি দিয়ে জাজিরাতুল আরবে কোথায় কোথায় মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে তা চিহ্নিত করে দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আরব ভূখণ্ডে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ঘাঁটিগুলো জিদ্দা, তায়েফ, তাবুক, রিয়াদ, খাদরুল বাতন, আল-জাওফ, দাম্মাম, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, আবুধাবি, আম্মান, মাসকাট, জর্দান, মিসর ও জিবুতিতে অবস্থিত।'

তিনি আরও বলেন, 'আমেরিকা জাজিরাতুল আরব থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার ব্যারেল তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। মসজিদে নববির ইমাম শায়খ হুজাইফি

সৌদিআরবে আমেরিকান সৈন্যের উপস্থিতির ব্যাপারে বলেছিলেন, "হিংস্র প্রাণী কি কখনো বকরির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে?' আরব-ভূখণ্ডে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ঘাঁটিগুলোই মূলত শায়খের মূল লক্ষ্য ছিল। যেকোনো মূল্যে তিনি এসব ঘাঁটি ধ্বংস করতে তৎপর ছিলেন। ১৯৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সামনে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি তাঁর এ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানে আসা বিভিন্ন সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালেও তিনি তাঁর এ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন।

উম্মাহর উপকরণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ উসামা বিন লাদেন মুজাহিদদের সামনে এক বক্তব্যে বলেন,

> আমেরিকা আরব দেশসমূহের খনিজ ভান্ডার দখলের পরিকল্পনা করেছে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুর মূল্যমাত্রা ঊর্ধ্বগতির হলেও সেই তুলনায় পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত পেট্রোলের দাম ব্যারেলপ্রতি মাত্র ৮ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে অন্যান্য বস্তুর মূল্য প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবের তেলের মূল্য ২৪ বছরে মাত্র কয়েক ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, আমেরিকার বন্দুক আরবদের কপালে তাক করা। আমরা প্রতিদিন প্রতি ব্যারেলে ১১৫ ডলার হারাচ্ছি। শুধু সৌদিআরবই প্রতিদিন ১০ কোটি ডলার ক্ষতির মুখে পড়ছে। গত ১৩ বছরে আমেরিকা আমাদের ৫৪ ট্রিলিয়ন ৫৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি করেছে। এ ক্ষতিপূরণ আমেরিকার কাছ থেকে উশুল করা উচিত। পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা ১ বিলিয়নের বেশি। এ বিশাল অর্থ থেকে প্রতিটি মুসলমান পরিবারকে ৫০ হাজারের বেশি ডলার করে বণ্টন করে দেওয়া যায়। স্মরণ রাখা উচিত, এ অর্থমূল্য শুধু সৌদিআরব থেকে যে তেল উত্তোলন করা হয়েছে, তার একটি সাদামাটা হিসাবমাত্র। মুসলমানদের অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে আমেরিকা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করছে, তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য।

মার্কিন পণ্য বয়কটের আহ্বান

এক বক্তব্যে শায়খ উসামা বিন লাদেন বলেন,

> জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক; কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারগুলো মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রমজি ইউসুফকে

সৌদিআরবে আমেরিকান সৈন্যের উপস্থিতির ব্যাপারে বলেছিলেন, "হিংস্র প্রাণী কি কখনো বকরির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে?' আরব-ভূখণ্ডে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ঘাঁটিগুলোই মূলত শায়খের মূল লক্ষ্য ছিল। যেকোনো মূল্যে তিনি এসব ঘাঁটি ধ্বংস করতে তৎপর ছিলেন। ১৯৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সামনে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি তাঁর এ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানে আসা বিভিন্ন সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালেও তিনি তাঁর এ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন।

উম্মাহর উপকরণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ উসামা বিন লাদেন মুজাহিদদের সামনে এক বক্তব্যে বলেন,

> আমেরিকা আরব দেশসমূহের খনিজ ভান্ডার দখলের পরিকল্পনা করেছে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুর মূল্যমাত্রা ঊর্ধ্বগতির হলেও সেই তুলনায় পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত পেট্রোলের দাম ব্যারেলপ্রতি মাত্র ৮ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে অন্যান্য বস্তুর মূল্য প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবের তেলের মূল্য ২৪ বছরে মাত্র কয়েক ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, আমেরিকার বন্দুক আরবদের কপালে তাক করা। আমরা প্রতিদিন প্রতি ব্যারেলে ১১৫ ডলার হারাচ্ছি। শুধু সৌদিআরবই প্রতিদিন ১০ কোটি ডলার ক্ষতির মুখে পড়ছে। গত ১৩ বছরে আমেরিকা আমাদের ৫৪ ট্রিলিয়ন ৫৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি করেছে। এ ক্ষতিপূরণ আমেরিকার কাছ থেকে উশুল করা উচিত। পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা ১ বিলিয়নের বেশি। এ বিশাল অর্থ থেকে প্রতিটি মুসলমান পরিবারকে ৫০ হাজারের বেশি ডলার করে বণ্টন করে দেওয়া যায়। স্মরণ রাখা উচিত, এ অর্থমূল্য শুধু সৌদিআরব থেকে যে তেল উত্তোলন করা হয়েছে, তার একটি সাদামাটা হিসাবমাত্র। মুসলমানদের অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে আমেরিকা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করছে, তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য।

মার্কিন পণ্য বয়কটের আহ্বান

এক বক্তব্যে শায়খ উসামা বিন লাদেন বলেন,

> জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক; কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারগুলো মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রমজি ইউসুফকে

তাদের হাতে তুলে দেয়। গণতন্ত্র ও মানবতার ধ্বজাধারী আমেরিকার নির্দেশে আমার চার পুত্র আজও কারারুদ্ধ। ৪ বছরের শিশুকন্যাকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বলা হচ্ছে, বাদশাহ ফাহাদ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে মুখ পুরোপুরি বন্ধ রাখলে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমি মার্কিন অনুকম্পার ভিখারি নই। আমেরিকার সাহস থাকলে আমাকে গ্রেপ্তার করুক। আমার মৃত্যু হবে আল্লাহর ইচ্ছায়; মার্কিনদের ইচ্ছায় নয়।

আমি মুসলমানদের কাছে অনুরোধ করছি, তারা যেন সব ধরনের মার্কিন পণ্য বয়কট করেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের কী দিয়েছে? কাপুরুষ মার্কিনরা মৃত্যুকে ভয় পায়। রাশিয়া টুকরো টুকরো হয়েছে, আমেরিকাও একদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

লন্ডনের সানডে টাইমসে সিএনএন টিমের নেওয়া শায়খের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছি। কারণ, তারা অত্যাচারী, সন্ত্রাসী। তারা মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধে লিপ্ত। তারা প্রকাশ্যে ইসরাইলের অত্যাচার সমর্থন দিচ্ছে। রাসুল সা.-এর মিরাজের পবিত্র ভূমি দখল করতে হানাদার ইসরাইলকে সহযোগিতা করছে। আমরা মনে করি, ফিলিস্তিন ও ইরাকে মুসলমানদের গণহত্যার দায়ে মার্কিনরা সরাসরি দায়ী।

আমেরিকার এসব মানবতাবিরোধী অপরাধের কারণে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ধর্মের নির্দেশনা—যখন অত্যাচার-নিপীড়ন সীমালঙ্ঘন করবে, তখন আল্লাহর বিধান সমুন্নত করতে যেকোনো মূল্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ জন্য আমেরিকাকে আমরা বিশ্বের সকল ইসলামি ভূখণ্ড থেকে সমূলে উৎখাত করতে চাই। এ যুদ্ধ আমেরিকার প্রতিটি সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করছে বা আমাদের বেসামরিক মানুষদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নিপীড়নকে সমর্থন করছে।

তবে আমাদের এই যুদ্ধ সর্বপ্রথম সে-সকল মার্কিন সেনার বিরুদ্ধে, যারা আমাদের পবিত্র ভূমিতে হানা দিয়েছে। আমাদের ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে—আমাদের পবিত্র ভূমিগুলো মুসলিমবিশ্বের অন্য সকল ভূখণ্ডের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল। পবিত্র ভূমিতে কোনো কাফির হানাদারের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। এ জন্য যে-সকল মার্কিন বেসামরিক নাগরিক, যারা এসব অঞ্চল ছেড়ে

চলে যেতে চায় না, আমরা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেব না। পৃথিবীতে আজ আমরা সোয়া ১ বিলিয়ন মুসলমান। যেকোনো মুহূর্তে আমাদের প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। ইরাকে আমাদের ৬ লক্ষ নিষ্পাপ শিশু মার্কিনদের কারণে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত। আমাদের এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার দায় আমেরিকার ওপরই বর্তায়। মার্কিনী অত্যাচারের সীমালঙ্ঘনের কারণে আজ এ যুদ্ধ মার্কিন যোদ্ধাদের পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিকদেরও ঘিরে নিচ্ছে।

বেসামরিক মানুষও এ দায় থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন। কেননা, তারা নিজেদের ভোটের মাধ্যমে মার্কিন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত রাখছে; অথচ তারা জানে, তাদের এ সরকার ফিলিস্তিন, লেবানন ও ইরাকে প্রতিনিয়ত মানবতাবিরোধী অপরাধ করে যাচ্ছে। শুধু এসব অঞ্চলে নয়; পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তারা নিজেদের গোপন এজেন্টদের মাধ্যমে আমাদের আত্মীয়-পরিজন ও ইসলামি ব্যক্তিদের কারাগারে আবদ্ধ করছে। আল্লাহ্ সকলের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

সুদানে পাঁচ বছর অবস্থান

সুদানের ধর্মীয় নেতা হাসান আত তুরাবি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে খারতুমে উসামা বিন লাদেনকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি আফগান রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করা আরব মুজাহিদদের অংশ ছিলেন। আগেই তিনি আফগানিস্তান থেকে সুদানে ফিরে যান এবং বিন লাদেন কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে উমর আল বাশিরের সেনা বিপ্লবের তখন মাত্র দুই বছর পূর্ণ হয়েছিল। হাসান আত তুরাবি উমর আল বাশির সরকারের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। এ সুবাদে শায়খ সুদানে পাঁচ বছর অবস্থান করেন। *চারটি অঞ্চলে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা* শিরোনামে সুদানে তাঁর অবস্থানের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত সুদান সরকার মার্কিনদের চাপে হাল ছেড়ে দেয় এবং শায়খের কাছে সুদান ছেড়ে যাওয়ার আবেদন করে।

সুদান থেকে আফগানিস্তান

সুদান থেকে আফগানিস্তান হিজরতের বিবরণ উসামা বিন লাদেনের ভাষায়,

> আমরা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে জালালাবাদে। তখন কাবুলে আহমাদ শাহ মাসুদ এবং রাব্বানি সরকারের কর্তৃত্ব ছিল। আমাদের জালালাবাদে পৌঁছার পূর্বেই রাব্বানি সরকার মার্কিন সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে গোপন চুক্তি সম্পাদন করে। গোপন চুক্তি অনুযায়ী আমাকে মার্কিনদের হাতে তুলে

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এ চুক্তিপত্রে রাব্বানি, আহমাদ শাহ মাসুদ এবং হাজি কাদিরসহ রাব্বানি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর ছিল। জালালাবাদে অবস্থানরত তালেবানদের মিত্র কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ শহিদ এবং উসতাজ সাজনু শহিদের মাধ্যমে এ চুক্তির কথা আমরা আগেই জেনে যাই। তারা তখন জালালাবাদের বিমানবন্দরে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই দুই কমান্ডারকে তালেবানদের সহযোগিতার দায়ে শহিদ করে দেওয়া হয়।

রাব্বানির সরকারের সঙ্গে সমঝোতার আলোকে মার্কিনরা দুটি মার্কিন বিমান জালালাবাদে পাঠাতে চেয়েছিল; কিন্তু কমান্ডার মাহমুদ শহিদ এবং সাজনু শহিদ যেকোনো মূল্যে আমাদের নিরাপত্তা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা মার্কিন বিমান অবতরণে বাধা দেওয়ার ঘোষণা দেন। রাব্বানির সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডাও হয়। অন্যদিকে তালেবানরা মোল্লা বুরজানের নেতৃত্বে বিজয়গাথা রচনা করতে করতে জালালাবাদের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। পরের দিন তালেবানরা মোল্লা বুরজানের নেতৃত্বে জালালাবাদ শহরে হানা দেয়। ভয়ংকর আক্রমণের মুখে রাব্বানি সরকার—যারা মার্কিনদের হাতে আমাদের তুলে দেওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল—জালালাবাদ শহর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পর পর দুদিনে লাগমান ও কনটর প্রদেশও তাদের হাতছাড়া হয়। পটপরিবর্তনে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমরা সকলেই নিরাপদে পৌঁছে আমাদের নাজমুল জিহাদ হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করি।

উত্তর জোটের কমান্ডার সাইয়িদ জিয়া ফ্রান্সের বোমন্ড পত্রিকার প্রতিবেদককে জানান, 'আমরা জানি, উসামা বিন লাদেন অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি; কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি দুবার রুশসৈন্যদের ঘেরাওয়ে পড়েছিলেন। একবার রুশবাহিনী তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করছিল। সে যুদ্ধ প্রায় ২৪ দিন স্থায়ী হয়েছিল। সেটা ছিল আমার দেখা সবচেয়ে দীর্ঘ যুদ্ধ। তখন উসামা বিন লাদেন তাঁর শতাধিক আরব সহযোদ্ধা নিয়ে সাত দিন পাহাড়চূড়ার একটি গুহায় আটকে ছিলেন। চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ বোমা হামলা করা হচ্ছিল। উসামা বিন লাদেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁদের অবস্থানের আশপাশে স্থলমাইন পুঁতে রেখেছিলেন, যেন রুশসৈন্যরা পাহাড়ে আরোহণ করতে না পারে। সপ্তম দিন তাঁরা সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে রুশদের উপর আক্রমণ করেন এবং বিজয় লাভ করেন।

উসামা বিন লাদেন ও আরব মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। এমন ভয়াবহ যুদ্ধ আমি জীবনে দেখিনি। আমাদের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদের কমতি ছিল। আমরা

চাচ্ছিলাম যেন শত্রুরা আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসে এবং আমরা তাদের উপর ফায়ার করি; কিন্তু আরব যোদ্ধারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে সাহসের প্রদর্শনী করতেন। তাঁরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে রুশবাহিনীর সামনে গিয়ে আক্রমণ চালাতেন।'

মার্কিনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা ও মসজিদে আকসার স্বাধীনতা

তিনি বিশ্বাস করতেন—বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের নির্যাতন বিশেষত ফিলিস্তিনের মুসলিম গণহত্যার আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা আমেরিকা। এ জন্য আল কায়দা বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আমেরিকান স্বার্থসংশ্লিষ্ট জায়গায় আঘাত হেনেছে। ফিলিস্তিন ও লেবাননে মুসলিম গণহত্যা, দুটি পবিত্র ভূমিতে মার্কিন দখলদারত্ব, মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মার্কিনদের হস্তক্ষেপ ও সৌদিআরবের পটপরিবর্তন বিশেষত আলিম ও মুজাহিদদের পাইকারিহারে গ্রেপ্তার হওয়ায় শায়খ উসামা বিন লাদেন ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্টে তিনি উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেনের পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা শিরোনামে তাঁর প্রথম বার্তা প্রকাশ করেন। এ বক্তব্যে তিনি মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, যেন তারা অতিসত্বর মুসলমানদের পবিত্র ভূমি ছেড়ে চলে যায়, অন্যথায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা মুজাহিদরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

শায়খ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, বায়তুল মাকদিসে ইহুদিদের দখলদারত্ব ও মুসলিম দেশসমূহ মার্কিনদের হস্তক্ষেপ মুসলিমবিশ্বের মূল সমস্যা। মার্কিনশক্তি খর্ব হলে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা দুর্বল হয়ে যাবে; আর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

নাইন ইলেভেন ও বিন লাদেনের বিশ্বব্যাপী পরিচিতি

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন ইতিহাসে এক কালো দিন। আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদরদপ্তর পেন্টাগন ও নিউ ইয়র্কের বাণিজ্যকেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে তিনটি বিমান আছড়ে পড়ে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) এর বাইরে গাড়িবোমা বিস্ফোরিত হয়। আত্মঘাতী এ হামলায় হাজারো মার্কিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, হতাহত হয় অসংখ্য। এ হামলায় মার্কিনদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বিলিয়ন ডলার। দেশব্যাপী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং হোয়াইট হাউসসহ সকল সরকারি ভবন খালি করে নেওয়া হয়।

শায়খ আমেরিকায় হামলার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে মূলত চারের অধিক বিমান হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ৬ থেকে ১০টি বিমানের সাহায্যে মার্কিনদের উপর হামলা করা; কিন্তু দুটি কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলেন :

১. তিনি শঙ্কাবোধ করেছিলেন, মার্কিনরা তাদের হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে যেতে পারে। তাই তিনি দ্রুত অতর্কিত হামলা করে তাদের হতভম্ব করে দিতে চেয়েছিলেন।

২. ফিলিস্তিনি জনসাধারণের উপর জঘন্য নিপীড়নে তিনি চরম ব্যথিত ছিলেন। ফলে দ্রুত হামলার সিদ্ধান্ত নেন। এ কারণে তিনি সময়ক্ষেপণ না করে চারটি বিমানের মাধ্যমে হামলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন।

তাঁর ছবি নিয়ে ফিলিস্তিনের নারী ও শিশুদের মিছিলের দৃশ্য তাঁকে এ হামলা দ্রুত বাস্তবায়নে তাড়িত করে। এ দৃশ্য দেখে তিনি চরম ব্যথিত ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই সেপ্টেম্বরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে খুশির জোয়ার এনে দেয়। ফিলিস্তিনিরা বাতাসে ফায়ারিং, মিষ্টি বণ্টন ও একে অপরকে অভিনন্দন

জানানোর মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে। অতঃপর তিনি ফিলিস্তিনিদের সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধ সেই শপথ করেছিলেন, যা বহু বছর ধরে আলোচিত ছিল।

সেপ্টেম্বরের এই ঘটনার পূর্বে মিসরের এক পরমাণু বিজ্ঞানীকে পরমাণু বোমা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শায়খ বিন লাদেন এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁরা পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষাও করেছিলেন। এ সফলতায় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। শায়খ নিজেই এ প্রকল্পের দেখাশোনা করতেন।

১১ সেপ্টেম্বরের পর সে বিষয়গুলো সবার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যা এতদিন কেবল বিশেষ শ্রেণির মানুষের জানা ছিল। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তো ইসলামের চিরকালীন শত্রু। আর মুসলিমবিশ্বের ক্ষমতার আসনে চেপে থাকা দানবগুলো ইউরোপ-আমেরিকার আশ্রয়-প্রশ্রয়েই ক্ষমতায় টিকে আছে। তাদের শাসনের স্থিতিও ওদের করুণার উপর নির্ভরশীল। মুসলিমবিশ্ব—বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিনদের বিমান ও নৌঘাঁটি বিদ্যমান। মুসলিমবিশ্বের নেতৃবৃন্দ ওই মার্কিন সৈন্যদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তারা এদের প্রতিহতের চিন্তাও করে না।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর শায়খ বিন লাদেন বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং মার্কিনদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিশেবে গণ্য হন। মার্কিন সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার বা হত্যার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে। মার্কিনরা তাঁকে সন্ত্রাসী হিশেবে পরিচিত করাতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি মুসলিমবিশ্বের একজন মহান নেতা ও বিপ্লবী যোদ্ধার ভূমিকায় আবির্ভূত হন। ধীরে ধীরে বিশ্বমুসলিমের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। সারা বিশ্বে মুসলমানদের ওপর নিপীড়নে ভারাক্রান্ত ও মুসলিমবিশ্বে বিপ্লবের প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেন আশার আলো। ১১ সেপ্টেম্বরের পর অসংখ্য মুসলমান আল কায়দার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকে।

চারিত্রিক মানদণ্ডে বিন লাদেন

শায়খ উসামা তাঁর ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণরূপে সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। শায়খের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী আরব মুজাহিদদের কমান্ডার শায়খ আবু বাসির নাসির আবু উহাইশি শপথ করে বলেন, 'আমি ব্যক্তিজীবনে কাউকে উসামা বিন লাদেনের চেয়ে সুন্নাহর বেশি অনুসারী দেখিনি। যারাই তাঁর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন তারাই স্বীকার করেন, তিনি ছিলেন ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অত্যন্ত কোমল স্বরে কথা বলতেন; কিন্তু ধর্মীয় যেকোনো ইস্যুতে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ

ছিল অত্যন্ত প্রখর। ধর্মীয় ইস্যুতে তিনি জোরালো কণ্ঠে কথা বলতেন।' খ্যাতিমান সাংবাদিক আবদুল বারি আতওয়ান বলেন, 'বর্তমানে আরবদের মধ্যে তাঁর মতো বিনয়ী মানুষ পাওয়া দুষ্কর।'

ক্রুসেডযুদ্ধে ১০ বছর মুজাহিদদের নেতৃত্ব

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার সময় শায়খ বিন লাদেন নিজে মুজাহিদদের নেতৃত্বে ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সবার আগে থাকতেন এবং মুজাহিদদের দেখাশোনা করতেন। তোরাবোরা পাহাড়ে মার্কিনদের বোমা হামলার সময় সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি বের হন। তাঁর সহযোদ্ধারা সকলেই নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পরই তিনি বের হতে সম্মত হন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সদ্য যোগদান করা জনৈক মুজাহিদ তাকে বলেছিল, 'শায়খ! আপনি এমনটি না করলেই বরং ভালো হতো', উত্তরে তিনি তাকে যা বলেছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। বলেছিলেন, 'জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আমল। যে ব্যক্তি এর শিখরে অবস্থান করবে, সে তার নিচের সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাবে; যে নিচের দিকে থাকবে, সে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাবে না।'

তিনি আমিরের নেতৃত্ব মানার গুরুত্ব বুঝাতে তাঁর সহযোদ্ধাদের বলতেন, 'যদি আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা নিহত হই, তাহলে যেন আমার ভালোবাসায় কেউ নিজের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়; বরং তোমাদের মধ্যে যাকেই নেতা নির্বাচিত করা হবে, তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে এবং তার কথা মানবে।'

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার শুরুতে মুজাহিদরা একটি গুহায় অবস্থান করেছিলেন। শায়খ স্বপ্নে দেখেন সে গুহায় একটি বিচ্ছু প্রবেশ করেছে। তিনি তাৎক্ষণিক সে গুহা ছেড়ে সবাইকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। দুই-তিন দিন পর মার্কিন বোমা হামলায় সে গুহা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

মূলত শত্রুদের জনৈক চর সে গুহায় জিপিএস চিপ রেখেছিল, যা মার্কিন বিমানবাহিনীকে রাস্তা দেখাচ্ছিল। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে শায়খকে হিফাজত করেন।

তিনি শুধু আফগানিস্তানেই মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেননি; বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানার কার্যকর কর্মপন্থাও নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে মুজাহিদরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিষ্টান ও ইহুদি-বাহিনীকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়েছে। ইরাকি মুজাহিদদের সফল প্রতিরোধে আমেরিকা ও তার সহযোগী জোটকে লজ্জাজনক

পরাজয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। আজ আমেরিকা ইরাক থেকে সেনাদল ফিরিয়ে নিচ্ছে। আফগানিস্তানেও তারা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি। সেখান থেকেও তারা নিজেদের সেনা ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

বিন লাদেনের শাহাদাতের তামান্না

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার এয়ারপোর্টের কাছে গোপন অবস্থান থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শায়খ বার বার তাঁর সম্ভাব্য শাহাদাতের আলোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি এ কথা ভালোভাবেই জানি, আমার শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী; কিন্তু আমি তোমাদের এ কথারও আশ্বাস দিতে চাই, তারা হয়তো কখনো আমাকে হত্যা করতে পারবে; কিন্তু আমাকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করতে পারবে না। যদি আমি মৃত্যুবরণও করি, আমেরিকার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ সমাপ্ত হবে না। আমি আমার বন্দুকের শেষ গুলি পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। শাহাদাত আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। আমি এ কথার বিশ্বাস করি, আমার শাহাদাতের পর আরও বহু উসামার জন্ম হবে।'

তিনি বহুবার ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখেও প্রতিশ্রুতি পূরণ থেকে বিচ্যুত হননি। কখনো অস্ত্র সমর্পণ করেননি। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। শাহাদাতের স্বপ্ন নিয়ে তিনি রাজকীয় জীবন ছেড়ে পাথুরে পাহাড়ি ভূমিতে আবাস গেড়েছিলেন। টানা ৩২ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। শেষপর্যন্ত তিনি ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করতে তৎপর অসংখ্য প্রশিক্ষিত বীরসেনানী রেখে মহান প্রভুর দরবারে হাজিরা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর মনোনীত আম্বিয়া ও বুজুর্গ বান্দাদের সঙ্গে মিলিত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু স্থান দান করুন। আমিন।

সিআইএর সঙ্গে গোপনযুদ্ধ

তিনি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে কতটা আহত করেছিলেন, কাফির নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকেই বার বার এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৪ বছর ৮ মাস ১০ দিন পর্যন্ত লাজুক মুচকি হাসি নিয়ে নম্রভাষী দীর্ঘদেহী ব্যক্তিটি যেন কাফিরবিশ্বকে আক্রান্ত করেছিলেন। তাকদিরের ফায়সালায় তিনি চলে গেলেও কাফিরবিশ্বের বুকে এমন এক ক্ষত রেখে গিয়েছেন, যা ইনশাআল্লাহ কখনো মুছে যাবে না—কিয়ামত পর্যন্ত সে বেদনা তাদের বয়ে বেড়াতে হবে। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের

২৩ আগস্ট উসামা বিন লাদেন *মুসলমানদের দুটি পবিত্র স্থানে হানাদার মার্কিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা* শিরোনামের বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। তখন থেকে এই সময়কালের গণনা শুরু করা হয়েছে, যে বার্তায় তিনি পুরো বিশ্বের মুসলমানদের, বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের মুসলমানদের তাগুতি শক্তি মার্কিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান করেছিলেন। যদিও বাস্তবে এর বহু বছর আগে থেকেই তিনি কাফিরবিশ্বের চোখের বালি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বিন লাদেনকে হত্যা বা গ্রেপ্তারে মার্কিন প্রচেষ্টা

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মার্কিন এজেন্টদের গোপন হামলায় শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের শাহাদাত প্রমাণ করে আমেরিকা তত দিনে তার শত্রুদের চিনে ফেলেছে। তারা বুঝতে পেরেছিল, এরা যদিও এখনো আফগানিস্তানের লড়াই করছে; কিন্তু দৃষ্টি তাদের ফিলিস্তিনে নিবদ্ধ। আল্লাহর অনুগ্রহ, মার্কিনরা তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারেনি; তবে আফগান যুদ্ধপরবর্তী সময়ে স্বদেশী ও মার্কিন দোসররা তাঁদের জীবন বিষিয়ে তুলে। ফলে শায়খ উসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটি দল সুদানে হিজরত করতে বাধ্য হন।

আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা দলটি সুদানে গিয়েও চুপ থাকেনি। তাঁদের ভয়ে তখনো কাফিররা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। এ কারণেই আমেরিকা শায়খকে নিষ্প্রভ করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। সুদানে গোপন হামলায় তাঁকে শহিদ করার চেষ্টা করা হয়। এতে ব্যর্থ হয়ে সুদানের ওপর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, যেন তারা শায়খকে সৌদিআরব বা আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। কমপক্ষে কোনোভাবে যেন তাঁকে সুদানে অবস্থান করতে দেওয়া না হয়। আলে সালুল (আলে সাউদ) এই বীরযোদ্ধার ভারবহনে অক্ষম ছিল, তাই সৌদিআরব থেকে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। শেষপর্যন্ত সুদান মার্কিন চাপের মুখে স্থির থাকতে পারেনি।

পরিস্থিতি বিবেচনায় শায়খ আবার আফগানিস্তানের পথ ধরেন। সেখানে ততদিনে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে শায়খের স্বপ্নের ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর স্বপ্ন ছিল, পৃথিবীর বুকে এমন একটি ভূখণ্ড তৈরি হওয়া, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কেন্দ্রবিন্দু হবে। অতঃপর তিনি আফগানিস্তানে অবস্থান করে পৃথিবীর শীর্ষ সন্ত্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা দেন।

সিআইএর বিন লাদেন ইউনিট গঠন

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সিআইএ শায়খকে জীবন্ত গ্রেপ্তার বা শহিদ করার নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে অ্যালেক স্টেশন Alec Statoin নামে একটি বিশেষ গোপন বাহিনী সাজানো হয়। সিআইএর সাবেক প্রধান জর্জ টেন্টের ভাষ্যমতে এই ইউনিটের কাজ ছিল, উসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করা, তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন গোপন তথ্য একত্র করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করা। তাঁর অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং কর্মতৎপরতার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবগত করা।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ হামলা এ বাহিনীর ব্যর্থতার প্রমাণ বহন করে; কিন্তু এ বাহিনী শায়খের ব্যাপারে যেসব তথ্য একত্র করেছিল, তা মার্কিনদের মনে বিন লাদেনের প্রভাব বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯৭-৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে এক গোপন হামলার মাধ্যমে শায়খকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়; কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এবারও তারা ব্যর্থ হয়।

সুদান ও আফগানিস্তানে ক্রুজ মিসাইল হামলা

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট কেনিয়া ও তানজানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমাহামলা মার্কিন শাসকদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলে। দিশেহারা মার্কিন সরকার তখন সুদান ও আফগানিস্তানে ৭৫টি ক্রুজ মিসাইল হামলা চালায়। আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে ৫ কোটি ডলার ব্যায়ের এই হামলা মার্কিনদের হাতে তেমন কোনো সফলতা ধরিয়ে দিতে পারেনি। জনাকয়েক মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। মার্কিনদের অহংকার ধুলোয় মিশে যায়। এ ঘটনার পরই মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থা এফবিআই শায়খের নাম তাদের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে সংযোজন করে। তাঁর মাথার মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২৫ মিলিয়ন ডলার।

Operation Jawbreaker-5

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে সিআইএর বিন লাদেন ইউনিট একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালিত করে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে কোনো এক সোমবার এই ইউনিটের প্রধান এবং কাউন্টার টেরোরিজম সেন্টারের কয়েকজন কর্মকর্তা তাজিকিস্তান হয়ে উত্তর আফগানিস্তানের পাঞ্জশির অঞ্চল সফর করে। সেখানে তারা আহমদ শাহ মাসুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে এ ঘৃণ্য চক্রান্তে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

আহমদ শাহ মাসুদ উসামা বিন লাদেনের গ্রেপ্তার বা হত্যাকাণ্ডে যেকোনো মূল্যে মার্কিনদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মার্কিনদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিশেবে তাদের এ কথাও জানিয়ে দেন—তারা কোনোভাবে যদি উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করতেও পারে, তবু এ সমস্যার সমাধান হবে না, তাদের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত অধরাই থেকে যাবে। কেননা, এটা শুধু বিন লাদেন ও তার কয়েকজন আরব যোদ্ধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটা আফগানিস্তান থেকে আরব পর্যন্ত বিছানো এমন এক সুনিপুণ কর্মযজ্ঞ, যাকে ব্যর্থ করার ক্ষমতা মার্কিনদের নেই।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর আহমদ শাহ মাসুদ এক আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যুবরণ করে; সে সঙ্গে মার্কিনদের এই অপারেশনেরও সমাধি ঘটে।

তোরাবোরার হামলা

নাইন ইলেভেনের পর আমেরিকা পাগলা কুকুরের মতো ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলার উদ্দেশ্য ছিল আল কায়দার নেতৃত্ব, বিশেষত উসামা বিন লাদেনকে জীবিত গ্রেপ্তার বা হত্যা করা। আমেরিকা তোরাবোরা পাহাড়ে বিন লাদেনের সদলবলে উপস্থিতি জানতে পেরে সর্বাধুনিক সমরপ্রযুক্তি ও পূর্ণ শক্তি নিয়ে ছোট পাহাড়টি ঘিরে ফেলে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শুরুতে আরম্ভ হওয়া এ যুদ্ধে আমেরিকা F-15, F-18, B-52 ও C-130-সহ ৫০-এর অধিক বিমান ও ২০টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ এলাকায় প্রায় ৭ লাখ পাউন্ড গোলাবারুদ খরচ হয়। ১৫,০০০ পাউন্ড ওজনের ডেইজি কাটারের মতো বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে! শায়খ তাঁর অধিকাংশ সহযোদ্ধা নিয়ে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে ১৪ জন ও অন্য একটি সূত্রমতে ৪০ জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। মার্কিনরা এখানেও কাপুরুষতার পরিচয় দেয়। জীবিত কোনো তালেবানরা সেখানে নেই, এ মর্মে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা তোরাবোরা পাহাড়ে নিজেদের সৈন্য অবতরণের ঝুঁকি নেয়নি। শুধু উত্তরাঞ্চলীয় জোটের যুদ্ধবাজ সেনা ও নিজেদের বিমানবাহিনীর ভরসায় তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; কিন্তু তাদের সকল সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তি ব্যর্থ হয়।

তোরাবোরা পাহাড় থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসার পর ১০ বছর শায়খ শুধু মার্কিনদের নয়; পুরো কাফিরবিশ্বের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছিলেন। আমেরিকা ও তার মিত্ররা হন্যে হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ইসলামের

সিংহপুরুষ বিন লাদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মিথ্যা অভিযোগে অসংখ্য লোককে গ্রেপ্তার করে গুয়ানতানামো বের মতো জঘন্য কারাগারে বন্দি করে রাখে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশাল গোয়েন্দাবাহিনীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ১০ বছর শায়খের কাছেও ঘেঁষতে পারেনি তারা।

তাবৎ কুফুরবিশ্বের জন্য শায়খের নাম একটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে ওঠে। পাহাড়ি ধুলির দরবেশ অজ্ঞাত জায়গা থেকে শুধু একটি অডিও টেপ প্রকাশ করতেন; আর এতেই বিশ্ব-পরাশক্তির নিদ্রা হারাম হয়ে যেত। জর্জ বুশ ইরাকেও শায়খের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় এবং সেখানেও আমেরিকাকে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের পর আমেরিকায় সংঘটিত দুটি জাতীয় নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারে তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ঘোষণা দেয়, যা থেকে মার্কিনদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব কতটা হুমকি ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

শেষপর্যন্ত মহান প্রভু যখন তাঁর প্রিয় সিংহের ললাটে শাহাদাতের মুকুট স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন, তখন শত্রুরা তাঁর অবস্থানের সন্ধান পায়। আল্লাহর এ প্রিয় শার্দূল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে যান। তাঁর মৃত্যুতে যেন বীরত্বের আকাশ থেকে একটি তারকা খসে পড়ে জান্নাত অভিমুখে যাত্রা করে।

মার্কিনদের জন্য জীবিত বিন লাদেন যতটা ভয়ংকর ছিলেন, মৃত বিন লাদেন যেন এর চেয়েও ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ান। তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের অজ্ঞাত স্থানে ভাসিয়ে দেওয়া ও শাহাদাতের কোনো প্রমাণ উপস্থাপন না করা তাদের এই ভীতির প্রমাণ বহন করে।

মার্কিনদের অর্থনীতি ভঙ্গুর করতে বিন লাদেনের পরিকল্পনা

মার্কিন অর্থনীতিতে শায়খ এমন কী ধাক্কা দিয়েছিলেন, যা আজও তাদের শান্তিতে ঘুমোতে দিচ্ছে না? এ প্রশ্নের পুরোপুরি পরিসংখ্যানভিত্তিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সোমালিয়া থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত মার্কিন স্বার্থে শায়খের আঘাতের বিবরণ তুলে ধরতে এই গ্রন্থটিও যথেষ্ট হবে না; কিন্তু শায়খের শাহাদাতের পর যে প্রশ্নটি আলোচনায় এসেছে, সেটা হচ্ছে বিন লাদেনকে শহিদ করতে মার্কিনদের কত মূল্য চুকাতে হয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও একেবারে সহজ নয়। আমেরিকার অস্তিত্ব ও তাদের রাজনীতিই এর বাস্তব মূল্য। মার্কিনদের বিশ্বের পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্ন তত দিনে অধরা হয়ে আসছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো যেকোনো সময় আমেরিকাও

বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। তবে বিন লাদেনের মৃত্যুর জন্য আমেরিকাকে যে মূল্য চুকাতে হয়েছে, ডলারের হিশেবে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান আমরা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই।

তাঁকে হত্যায় ক্রুজ মিসাইল হামলার ব্যয় ৫০ কোটি ডলার। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় মার্কিনদের প্রত্যক্ষ ক্ষতি প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। পরোক্ষ ক্ষতি ৩ হাজার বিলিয়ন ডলার। আফগানিস্তানের যুদ্ধে সরাসরি সামরিকখাতের ব্যয় ৫৬০ বিলিয়ন ডলার। ইরাকযুদ্ধের সামরিক ব্যয় ৮৫০ বিলিয়ন ডলার। স্বরাষ্ট্রখাতে নিরাপত্তাব্যয় ১ হাজার বিলিয়ন ডলার। সর্বসাকুল্যে ব্যয় ৫,৪৪০.৫ বিলিয়ন ডলার।

এখানে এসব যুদ্ধের পরোক্ষ ক্ষতি ও যুদ্ধখাতের বরাদ্দের জন্য গৃহীত ঋণের সুদের হিসাব করা হয়নি। তবু এ অঙ্ক মার্কিনী বার্ষিক জিডিপির ৩৬ শতাংশ ও মার্কিনদের বার্ষিক ট্যাক্সের প্রায় ২১০ শতাংশের সমান।

ড. শহিদ আবদুল্লাহ আজ্জামের চোখে বিন লাদেন

অধুনাকালের জিহাদি ফিকহের মুজাদ্দিদ শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ. বলেন, 'আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রিয় ভাই আবু আবদুল্লাহ উসামা বিন লাদেনকে হিফাজত করেন। পৃথিবীপৃষ্ঠে আমি তাঁর মতো ব্যক্তির দেখা পাইনি।'

অন্যত্র শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম বলেন, 'এই ব্যক্তি একাই একটি জাতির সমান। আল্লাহর শপথ, মুসলিমবিশ্বে আমি তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। আল্লাহ তাঁর দীন ও সম্পদের হিফাজত করুন। তাঁর হায়াতে বরকত দান করুন।'

চোখ খুলে বহু মানুষ দেখতে পাই; কিন্তু তাঁর মতো কাউকে দেখতে পাই না।

যুগের সিংহপুরুষ ইস্পাতকঠিন মনোভাবের অধিকারী আবদুল্লাহ আজ্জামের চোখে বিন লাদেন কীভাবে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন? এর উত্তর অত্যন্ত পষ্ট। কারণ, শায়খ উসামা বিন লাদেন আল্লাহর বাণী পড়েছিলেন,

> হে ইমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো! তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। [সুরা তাওবাহ : ৩৮]

এ আয়াতদৃষ্টে তিনি পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, 'এমনটি কখনোই হবে না।' অতঃপর তিনি নিজের জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিয়ে শাহাদাতের মৃত্যুর

তালাশে বেরিয়ে পড়েন। কবি বলেন,

> *নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বুদ্ধিমান বান্দা রয়েছেন, যাঁরা জীবনের সকল বিনোদন ত্যাগ করে ফিতনা থেকে বেঁচে গেছেন। পৃথিবীকে দেখেই তাঁরা অনুধাবন করেছেন যে, এটি জীবিত ব্যক্তিদের স্থায়ী নিবাস নয়, তখন তাঁরা একে সমুদ্র মনে করেছেন এবং নেক আমলসমূহকে নৌকায় পরিণত করেছেন।*

আবদুল্লাহ আজ্জাম বিন লাদেনের অবস্থার বিবরণে বলেন, 'তিনি অসহায় দরিদ্রদের মতো জীবনযাপন করেন। হজে গেলে তাঁর বাসায় গিয়ে যে-কেউ দেখতে পেত তাঁর ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই; অথচ তাঁর চার জন স্ত্রী ছিল। মিসর বা জর্দানের সাধারণ কোনো কর্মচারীর ঘরও তাঁর ঘরের চেয়ে সুসজ্জিত ছিল; কিন্তু তাঁর কাছে মুজাহিদদের জন্য অর্থ-সহযোগিতা চাওয়া হলে মুহূর্তেই তিনি কয়েক মিলিয়ন রিয়ালের চেক লিখে দিতেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আফগানরা দেখেছে তিনি এমন একজন আরব, যিনি তাঁর কোম্পানি, ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থসম্পদ সৌদিআরব, মধ্যপ্রাচ্যে বা জর্দানে ছেড়ে এসে পাহাড়ের গুহায় শুকনো রুটি ও চায়ের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করছেন। তাঁরা আরও দেখেছে, বিন লাদেন মদিনার মসজিদে নববির সংস্কারকাজ ও নিজের কামাই-রোজগার ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছেন; এ জন্যই তারা এই মর্দে মুজাহিদের জন্য হৃদয় উজাড় করে দুআ করত।'

শায়খ আজ্জাম আরও বলেন, 'বিন লাদেন একবার তাঁর এক বোনের কাছে জিহাদের জন্য সম্পদ খরচ-সংক্রান্ত ইবনু তাইমিয়ার ফাতওয়া তুলে ধরেন। এতে তিনি ৮ মিলিয়ন রিয়ালের চেক শায়খের হাতে তুলে দেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বোনের পরামর্শদাতারা বোনকে বোঝায়—"আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আপনার ভাইয়ের কথায় আপনি এতগুলো অর্থ দিয়ে দিলেন; অথচ আপনি নিজে ভাড়া বাসায় থাকেন। গৃহনির্মাণের জন্য কম করে হলেও ১ মিলিয়ন রিয়াল যদি রেখে দিতেন!" তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলেন, "হে আমার ভাই, আমাকে ১ মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে দাও। আমি ঘর নির্মাণ করতে চাই।" তিনি বলেন, "না, আল্লাহর কসম, আমি একটি রিয়ালও ফিরিয়ে দেবো না। তুমি তো এখনো তোমার ভাড়া ফ্ল্যাটে আয়েশি জীবনযাপন করছ; অথচ আফগানিস্তানের মুসলমানরা মৃত্যুর সময়ও তাঁবুর ছায়া পাচ্ছে না।"'

দুনিয়ার অর্থসম্পদ শায়খকে ধোঁকা দিতে এলে তিনি তাকে বলেন, 'অন্য কাউকে

ধোঁকা দাও। নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এমন তিন তালাক দিয়েছি, যারপর আমি আর ফিরিয়ে নেব না।'

হুংকার দিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে দেওয়া এই সিংহপুরুষের বিনয়ের আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম বলেন, 'আর যখন তিনি আপনার সঙ্গে বসবেন, মনে হবে তিনি একজন সেবকমাত্র। ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি অন্যকে সম্মানপ্রদর্শন ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি সর্বদা যুদ্ধের ময়দানে অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ করতেন। যখন তিনি আমার বাসায় থাকতেন, ফোনের রিং বাজলে তিনি নিজে ফোন উঠিয়ে আমার কাছে এনে দিতেন, যেন আমাকে নিজের জায়গা থেকে উঠতে না হয়। এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিষ্টাচারের নমুনা। আল্লাহ্ তাঁর হিফাজত করুন। প্রথম বার রমজানে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে দাওয়াত করেন। ইফতারের সময় আমার সামনে একটি পাত্র নিয়ে আসেন, যাতে সামান্য ঝোলের মাঝে অল্প মাংসবিশিষ্ট কয়েকটি হাড্ডি ছিল।'

সে সুন্দর মুহূর্তগুলোর কল্পনা করুন, যা শায়খ আবদুল্লাহর ভাষায় ফুটে উঠেছে, 'যদি আজকের সকল মুসলমান নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ওই বাস্তবতাসমৃদ্ধ মুহূর্তগুলো অনুভব করত, যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে এবং বিপদ সামনে চলে আসে। সাহসী ব্যক্তিদের ব্যাপারে চক্রান্ত হতে থাকে আর বেহেশতি হুরের প্রেমিকগণ যুদ্ধ-ময়দানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তখন আপনি অগ্রগামী যোদ্ধাকে বাধা দিলে তাঁর চোখের কোণায় যেন আশাভঙ্গের অশ্রুরা মিছিল করে। তাঁদের প্রত্যেকেই শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করেন; অথচ আশাহত হয়ে যেন তাঁরা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর চেয়ে অগ্রগামী ভাইটিই হয়ে যায় তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। মৃত্যু থেকে তাঁকে নিবৃত্ত রাখার দৃশ্য হয় ক্ষুধার্ত সিংহকে শিকার থেকে বাধা দেওয়ার মতো। যদি যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির অবাধ্যতার ভয় না থাকত, তাহলে তাঁরা যুদ্ধময়দানে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা দস্তরখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর উসামা বিন লাদেন! তাঁর অবস্থা তো এমন, যেন তৃষ্ণার্ত ঘোড়াকে পানি পান থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে।'

বিন লাদেনের অসুস্থতা নিয়ে মিথ্যা প্রচার

১১ সেপ্টেম্বরের পর ন্যাটোর ক্রুসেড-শক্তি নিজেদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেও তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। তাদের উন্নত প্রযুক্তির জন্য এটা ছিল মারাত্মক ব্যর্থতা। নিজেদের এই ব্যর্থতা আড়াল করতে তারা মিডিয়ার সামনে তাঁর সুস্থতা নিয়ে ধারাবাহিক মিথ্যা সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। তারা

প্রমাণ করতে চেয়েছিল, এত দিনে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে, তিনি আর পৃথিবীতে নেই। আমরা এখানে শায়খ উসামা বিন লাদেনকে একান্তভাবে দেখা দুই ব্যক্তির বক্তব্য তুলে ধরছি। তাঁরা স্পষ্টভাবে বলেছেন, বিন লাদেন কিডনিজনিত অসুস্থতাসহ কোনো ধরনের প্রাণঘাতী অসুস্থতায় ভুগছিলেন না।

প্রসিদ্ধ সার্জন ডাক্তার আমির আজিজ, যিনি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিশেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'বিন লাদেনের শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁর মধ্যে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি কিডনিরোগে আক্রান্ত নন, তাঁকে নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে' এসব তথ্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নাইন ইলেভেনের পর কাবুলে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি সেখানে অসুস্থ রোগীদের দেখাশোনা করতাম। সেখানে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁকে সুস্থ অবস্থায় চলাফেরা করতে দেখছি। তিনি স্বাভাবিক পরিমাণে খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, ডায়ালাইসিসের ওপর নির্ভর কোনো ব্যক্তি এত স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে।

কান্দাহারে অবস্থানকালে একবার তালেবানদের পক্ষ থেকে একজন আহত রোগীর চিকিৎসার জন্য আমাকে কান্দাহারের রেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, আহত ব্যক্তিটি স্বয়ং বিন লাদেন—ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হয়েছিলেন তিনি। আমি তাঁর শারীরিক চেকআপ করি। অবস্থা মোটেও শঙ্কাজনক ছিল না। কোমরের হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল। আমি প্লাস্টার করে দিই এবং কিছু ব্যায়াম ও ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিই। সেখানে এ-ই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিবরণ। অতঃপর কান্দাহার এয়ারপোর্টের কাছে আমাদের দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। যেখানে আমাদের ভালোভাবে আপ্যায়ন করা হয়।'

আল কুদস আল আরবি পত্রিকার সম্পাদক আবদুল বারি আতওয়ান একজন আরব সাংবাদিক, যিনি তালেবান শাসনামলে শায়খের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তিনি বিন লাদেনের অসুস্থতার ব্যাপারে বলেন, 'বিন লাদেন কিডনি-সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছেন, আমার জন্য এটা অবিশ্বাস্য সংবাদ। কিডনিরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ডায়ালাইসিস ব্যতীত সম্ভব নয়। আমি তাঁর সঙ্গে তিন দিন কাটিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল ছিলেন। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত কিডনিরোগে আক্রান্ত হন; কিন্তু বিন লাদেন

অত্যন্ত কড়া মিষ্টি-চা পান করতেন। ডায়াবেটিসের রোগী হলে এত মিষ্টি সেবন করতেন না। তাঁর চা এত মিষ্টি হতো, যা আমাদের জন্য পান করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে সাধারণত কিডনি-সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সবসময় নিজের কাছে পানি রাখতে হয়; কিন্তু তাঁর অবস্থা এমন ছিল না।'[২]

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বিন লাদেন পঞ্চম বিয়ে করেন। নাইন ইলেভেনের কিছুদিন পর সে স্ত্রীর গর্ভে এক শিশুকন্যার জন্ম হয়, নাম রাখা হয় সাফিয়া। বিন লাদেন বলেন, 'তিনি তাঁর এই শিশুকন্যার নাম রাসুল সা.-এর ফুফু সাফিয়া বিনতু আবদুল মুত্তালিবের নামে রাখেন, যিনি আহজাবযুদ্ধে একজন ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন।' তিনি প্রত্যাশা করতেন, তাঁর এই শিশুকন্যাও একদিন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হত্যা করবে।

কিডনির জটিল রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি কীভাবে বিয়ে করতে পারে? সে তো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেই অক্ষম থাকার কথা; অথচ তিনি বিয়ে করেন এবং সেখানে তাঁর শিশুকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। বস্তুত বিন লাদেনের অসুস্থতা ও মৃত্যু নিয়ে এসব প্রোপাগান্ডা ছিল স্পষ্ট মিথ্যাচার, এতে সত্যের লেশমাত্র ছিল না।

মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের চোখে বিন লাদেন

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহ.-এর চোখে বিন লাদেন ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আরব মুজাহিদদের জন্য নিজের হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। এ জন্যই বিন লাদেন আফগানিস্তানকে নিজের বাসস্থান বানিয়েছিলেন। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর কাফিরশক্তির প্রচণ্ড চাপের মুখেও বিন লাদেনের সাহায্য থেকে অস্বীকৃতি জানান। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতনের শঙ্কা তৈরি হলেও তিনি তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিতে রাজি হননি। ইসলামের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

শায়খুল হাদিস মাওলানা ডাক্তার শের আলি শাহ দা. বা. মোল্লা উমরের সঙ্গে এক সাক্ষাতের বিবরণ তুলে ধরেন। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতনের কিছুকাল পূর্বে পাকিস্তানের আলিমগণের একটি প্রতিনিধিদল আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের সঙ্গে এক পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হন। সেই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের আলোচনার বিবরণ শায়খুল হাদিস মাওলানা ডাক্তার শের আলি সাহেবের ভাষায়,

---

২ আল-জাজিরা টেলিভিশনের ডকুমেন্টারি (I knew bin Laden : Part-1)

'আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কাছে যে আলিম প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি। আমি দোভাষীর কাজ করছিলাম। তাকি উসমানির উরদু বক্তব্য পশতু ভাষায় ও মোল্লা উমরের পশতু ভাষার উত্তর উরদুতে অনুবাদ করতাম। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের ইমানি আত্মমর্যাদাবোধ দেখে মাওলানা সলিমুল্লাহ খানসহ অন্য সকল আলিম কান্না করতে থাকেন। তাঁরা বলেন, "আল্লাহর শপথ, এঁরা সাহাবিযুগের লোক, বর্তমান যুগে চলে এসেছেন।" মোল্লা মুহাম্মাদ উমর তখন বলেন, "আমি বিন লাদেনের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ তাঁর জীবন বৃদ্ধি করুন। আমি সারা রাত কান্না করি। যে লোক পবিত্র মদিনা থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে আগমন করেছে, আমি কীভাবে তাঁকে কাফিরদের হাতে তুলে দিতে পারি?"'

মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কাছে শায়খের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা তাঁর এসব বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়,

- পুরো পৃথিবীর সকল শক্তিও যদি আমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়, তবু পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই, যা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের ব্যাপারে আমাদের বাধ্য করতে পারে। তিনি আমাদের মেহমান। আমরা কোনো চাপের মুখে বা কোনো লালসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে কারও হাতে তুলে দিতে পারি না। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাফিরের হাতে তুলে দিতে পারে না। আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর হিফাজত করব। তাঁর নিরাপত্তার জন্য রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত।'
- যদি পুরো আফগানিস্তান ধ্বংস হয়ে যায় তবু আমরা কোনো মূল্যে বিন লাদেনকে কারও হাতে তুলে দেবো না। কোনো মুসলমানকে কাফিরের হাতে তুলে দেওয়া আমার আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থি। আমরা ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি, এর জন্য যেকোনো বিপদাপদ সহ্য করতে আমরা রাজি।
- আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত বাকি থাকতেও আমরা বিন লাদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। যদি আফগানিস্তানের সকল ঘর ধ্বংস হয়ে যায়, পাহাড়গুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, লোহা গলে যায়, তবু আমরা তাঁকে কারও হাতে তুলে দেবো না।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ এ মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে, যদি আফগানিস্তান এক মাসের মধ্যে বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে না দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে। এ ব্যাপারে *বিবিসি*

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা উমরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সেখানে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো।

বিবিসি : জাতিসংঘ আপনাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য এক মাসের সময়সীমা দিয়েছে। এর মধ্যে আপনারা পারস্পরিক সংলাপে বসছেন না কেন?

আমির : আমরা সংলাপের জন্য প্রস্তুত; কিন্তু বিন লাদেনের হস্তান্তর আমাদের জন্য স্পর্শকাতর ইস্যু।

বিবিসি : তালেবানদের সফলতা ঈর্ষণীয়। তদুপরি একজন ব্যক্তির জন্য পুরো দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে; এটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না?

আমির : বিষয়টি এমন নয় যে, ইসলামবহির্ভূত কোনো বিষয়ের ওপর আমরা একগুঁয়েমি করছি; অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি; বরং এটাই ইসলামি বিধান। ইসলাম আমাদের এতে সম্মত হওয়ার অনুমতি দেয়নি। আমাদের ধর্মীয় বিধানমতে, কোনো মুসলমানকে কাফিরের হাতে তুলে দেওয়া যায় না।

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের ইমানদীপ্ত এসব বক্তব্য বড় বড় শক্তির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি নিজ অবস্থানে অটল ছিলেন। ফলে শেষপর্যন্ত আমেরিকা আফগানিস্তানের ওপর হামলা করে এবং ইসলামি সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের পতন ঘটায়, তবু তিনি একজন মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদাসংক্রান্ত ইসলামি বিধানের গায়ে তিলমাত্র আঁচড় লাগতে দেননি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিন লাদেনের স্মরণীয় কীর্তি

হিজরি পঞ্চদশ শতকের শুরুতে মুসলিম উম্মাহর তিন শতকের দাসত্ব ও লাঞ্ছিত জীবনের পরিবর্তে সম্মান, মর্যাদা ও প্রগতির পথে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে রাসুল সা.-এর দেখানো পদ্ধতিতে জিহাদ ও কিতালের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। পূর্ব-পশ্চিমের ইসলামি শার্দূলেরা ছিল এই যুদ্ধের সৈনিক। এই জিহাদি কাফেলার নকিবের ভূমিকা পালন করেছিলেন শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রাহ., যাঁর সম্মোহনী দাওয়াত ও আলোকিত ব্যক্তিত্ব উম্মাহর সিংহপুরুষদের আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করেছিল। এই বীর যুবাদের মধ্যে আলোকিত একটি নাম উসামা বিন লাদেন।

আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের ভরসায় মুজাহিদরা লাল সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত তাঁদের সামনে টিকতে না পেরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজয়বরণ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আরব-আজমের সম্মিলিত মুজাহিদ কাফেলা তখনো বিশ্রামের কথা ভাবেননি। কৃত্রিম প্রভুত্বের দাবিদারদের মসনদ গুড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য। বিশ্বের একক পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্নদর্শী আমেরিকা তাঁদের টার্গেটে পরিণত হয়, যেন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে তাগুতি শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে আল্লাহর দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের শাহাদাতের পর এ বরকতময় কাফেলার নেতৃত্বে আবির্ভূত হন শায়খ উসামা বিন লাদেন। তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া অনুগ্রহের সকল উপকরণ জিহাদের ময়দানে ঢেলে দেন। এভাবেই মহান রাব্বুল আলামিন বর্তমান যুগের হুবল দেবতার মসনদ গুড়িয়ে দিতে 'জাইশে উসামা' গঠন করেন। নিঃসন্দেহে শায়খ উসামা বিন লাদেন ছিলেন এই উম্মাহর কল্যাণকামী। আমরা এখানে তাঁর জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তির সংক্ষিপ্ত

আলোচনা করছি। আমরা শুধু তাঁর জীবনের ওই সব বড় বড় কীর্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি, যার বিস্তারিত বিবরণ মহান রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে তাঁর আমলনামায় লেখা হয়েছে। হয়তো-বা মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর আমলনামা নিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সামনে গর্বভরে আলোচনা করছেন,

এই বান্দা তো উভয় জগত থেকে বিরূপ শুধু আমার কারণেই।

মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা

রাসুল সা. বলেছেন, 'ইসলাম সর্বদা বিজয়ী থাকবে, কখনো বিজিত হবে না।'[৩] রাসুলের এই হাদিসকে কেন্দ্র করে উসামা বিন লাদেন তাঁর সকল কর্মযজ্ঞ পরিচালিত করতেন।

আফগানিস্তানের প্রথম যুদ্ধের পূর্বে পুরো বিশ্বে মুসলমানরা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জীবনযাপন করছিল। ইসলামের পরিচয় দেওয়া ছিল নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার সমার্থক। ইসলামি সংস্কৃতি গ্রহণকে অপরাধ হিশেবে গণ্য করা হতো। পূর্ববর্তী বুজুর্গদের আলোচনা থেকে বেঁচে থাকাই কল্যাণকর মনে করা হতো; কিন্তু আফগানযুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ এ হীনম্মন্যতা বদলে দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা ইসলামবিরোধী শক্তি হিশেবে সামনে আসে। উসামা বিন লাদেন এ কথা বলে মুসলিম যুবকদের মনোবল বাড়িয়ে তুলছিলেন— 'নিশ্চয়ই তোমরা তাওহিদের বলে বলিয়ান।' আল্লাহ ইসলামের জন্য যে সম্মান, মর্যাদা ও প্রগতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা শুধু জিহাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। তিনি মুসলিম যুবকদের আল্লাহর প্রতিশ্রুতিগুলোর ব্যাপারে অবগত করেন। পাশাপাশি জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং কুরআন-সুন্নাহর দীক্ষার আলোকে জিহাদ করতে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন,

> আজ মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর দীন ও জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি ভোগ করছে। ইবনু উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমরা ইনা (একপ্রকার সুদের লেনদেন) পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন। তোমরা দীনের প্রতি ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের এই অপমান থেকে মুক্তি দেবেন না।'[৪]

---

৩ *সুনানু বায়হাকি* : ১২১৫৫।

৪ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৪৬২।

হাদিসের ভাষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা এসব কারণেই আমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা দীনের পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত এসব লাঞ্ছনা-বঞ্চনা দূরীভূত করা হবে না।

হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা, এ কথা ভালোভাবে স্মরণ করে নাও, দীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং জিহাদের পথ অবলম্বন করা ব্যতীত আমাদের কোনো উপায় নেই। যদি আমরা দীনের ওপর সঠিকভাবে টিকে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের দিকনির্দেশনা নিতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। এ কথা রাসুল সা. আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর রাহে সর্বাত্মক জিহাদ করেছেন, দীনের দাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর কাছে দেওয়া আল্লাহর আমানত সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।'

এভাবে শায়খ উসামা বিন লাদেন মার্কিনদের শোষণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হিশেবে থাকবে। তাঁর জীবনাদর্শের অনুকরণে প্রজন্মকে সামসময়িক তাগুতি শক্তি ও যুগের ফিরআউনদের অহংকার মাটিতে মিলিয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা বিশ্বের একক সুপার পাওয়ার হিশেবে আবির্ভূত হয়। তখনই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার থিউরির পরিচিতি দেওয়া হয় যে, পৃথিবীতে এমন নিয়ম চলবে, যা মার্কিনদের সমর্থিত হবে। পৃথিবীর ঐতিহ্য হবে এমন, যা মার্কিনরা প্রতিষ্ঠা করবে। পৃথিবীর সকল কিছু মার্কিনদের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। সারকথা, পৃথিবীর সকল আবালবৃদ্ধবনিতা মার্কিনদের ইশারার কাঠপুতুল হয়ে চলবে; কিন্তু পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হওয়া মস্তক কখনো মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদারদের মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে না। এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার পর আমেরিকা ও তার মিত্ররা মুজাহিদদের পরবর্তী লক্ষ্যে পরিণত হয়। যে আমেরিকাকে অজেয় কল্পনা করা হতো, তা মুজাহিদের হামলার শিকারে পরিণত হয়। উসামা বিন লাদেনের হাতে ছিল এমন একদল মুজাহিদের নেতৃত্ব, যাঁরা আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অস্বীকার করে পৃথিবীব্যাপী মহান রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদ ছড়িয়ে দিতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। শায়খ উসামা বিন লাদেন এমন এক সময় আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যখন পুরা বিশ্বনেতৃত্ব মার্কিনদের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়েছিল।

মার্কিন জনগণকে লক্ষ্য করে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন,

ইনশাআল্লাহ আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে ভেতরে-বাইরে লড়াই করতে থাকব,

> মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মঘাতী হামলা অব্যাহত থাকবে। অথবা তোমরা অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে ফিরে এসো, অন্যায় দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করো এবং নিজেদের ব্যর্থ শাসকদের লাগাম টেনে ধরো। স্মরণ রেখো, আমরা আমাদের শহিদদের ভুলে যেতে পারি না। বিশেষত ফিলিস্তিনে আমাদের যে-সকল ভাই তোমাদের মিত্রদের হাতে শহিদ হয়েছে, আমরা তাঁদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। নিঃসন্দেহে তোমাদের রক্তে আমরা এর শোধ নেব, যেমনটি আমরা নাইন ইলেভেনে করেছিলাম। যত দিন পর্যন্ত আমাদের অস্ত্রধারণের শক্তি থাকবে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব, পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রজন্ম এ দায়িত্ব পালন করবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে তোমাদের অপবিত্র অস্তিত্ব বিলীন করতে না পারলে আমরা ব্যর্থ।

শায়খ উসামা বিন লাদেন মুসলিম নওজোয়ানদের মার্কিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে নাইন ইলেভেনের মতো ঘটনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, যার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অপরাজেয় মার্কিনসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধুলিসাৎ হয়ে যায়। সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দু পেন্টাগন আক্রান্ত হয়। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বিন লাদেন বিশ্বব্যাপী আমেরিকার সেই প্রভাবকে মুহূর্তেই মাটিতে মিলিয়ে দিতে সক্ষম হন, যা তারা কয়েক দশক ধরে অর্জন করেছিল।

তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন,

> সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর আমেরিকা একক পরাশক্তি হিশেবে আবির্ভূত হয়ে অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের ওপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে শুরু করেছে। নামসর্বস্ব মুসলমান শাসকরা তাদের আজ্ঞাবহ সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তারা আরও নির্বিঘ্নে জায়নবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফিলিস্তিনে হানাদারের ভূমিকা পালন করছে। তখনই উম্মাহর বীর যুবাদের ছোট একটি দল যুগের হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। আমরা এক শিংওয়ালা দৈত্যের দাম্ভিকতার শিং ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছি। তাদের কেল্লা ধূলিসাৎ করে দিতে পেরেছি। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধুলোয় মিলিয়ে দিতে পেরেছি। যার প্রতিশোধ নিতে তারা মুজাহিদ-নেতৃত্বকে ধ্বংস করে বিশ্ববাসীর সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছে। এ জন্য শাস্তিস্বরূপ আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা ঠিক বদরযুদ্ধের আবু জাহলের মতো, যারা নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও জনবল নিয়ে দাম্ভিকতার সঙ্গে বেরিয়েছিল; কিন্তু আমরা তাদের অস্ত্র নিষ্ক্রিয় প্রমাণ করেছি। তাদের সামরিকবাহিনীকে জাহান্নামের

জ্বালানিতে পরিণত করতে পেরেছি। তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এসব কিছুই হয়েছে একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে।

কাপুরুষ মার্কিনদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদেন বলেন,

আমরা বিগত দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যের পতন ও মার্কিন সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছি, যারা স্নায়ুযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত; কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য আগ্রহী নয়। বৈরুত হামলার সময়ই আমরা দেখেছি, তাদের সৈন্যরা দুটি হামলার পরই পালিয়ে গিয়েছিল। ২৪ ঘণ্টাও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে পারেনি। সোমালিয়াতেও আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখতে পেয়েছি। অন্যদিকে আমরা সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করি।[৫]

মার্কিন সেনাদের বীরত্ব নিয়ে শায়খের আলোচনায় পৃথিবীব্যাপী মার্কিনদের ভয়ে কম্পমান জাতির জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। তিনি মার্কিনদের উদ্দেশে বলেন,

১৪০৩ হিজরিতে বৈরুতে যখন তোমাদের উপর হামলা করা হয়, তখন তোমাদের বীরত্ব কোথায় ছিল? যে হামলায় তোমাদের ২৪১ জন সেনা নিহত হয়, যাদের অধিকাংশ ছিল মেরিন সেনা। সে হামলা তোমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এডেনে তোমাদের উপর যখন হামলা করা হয়, তখন তোমাদের বীরত্ব কোথায় ছিল? দুটি বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা সবকিছু ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলে!

সোমালিয়া তোমাদের জন্য ছিল চরম লাঞ্ছনার জায়গা। মার্কিন পরাশক্তি হিশেবে প্রতিষ্ঠা ও স্নায়ুযুদ্ধের পর তোমরা জাতিসংঘের অধীনে ২৮ হাজার মার্কিন সেনাসহ লক্ষাধিক আন্তর্জাতিক সেনা সোমালিয়ায় প্রবেশ করেছিলে। সামান্য লড়াইয়ের পর তোমাদের বহুসংখ্যক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে এবং একজন পাইলটকে মোগাদিসুর রাস্তায় টানাহ্যাঁচড়া করা হলে তোমরা কাপুরুষের মতো অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছনা নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলে। বিশ্ববাসীর সামনে বিল ক্লিনটন দাম্ভিকতামূলক হুমকি-ধমকি দিলেও তা ছিল পালিয়ে যাওয়ার কৌশলমাত্র। লাঞ্ছিত হয়ে তোমরা পালিয়ে এসেছিলে, যা তোমাদের কাপুরুষতার প্রমাণ। বৈরুত, এডেন ও মোগাদিসুর হামলা ও তোমাদের লাঞ্ছনার ইতিহাস সারা বিশ্বের মুসলমানদের আত্মা প্রশান্ত করে।

---

৫ মার্কিন সাংবাদিক জন মিলারকে দেওয়া সাক্ষাৎকার : ১৯৯৮।

দুই পবিত্র ভূমিতে মার্কিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

মসজিদে আকসাকে বৈশ্বিক সমস্যার কেন্দ্র নির্ধারণ

শায়খ উসামা বিন লাদেন প্রমাণ করেছেন, মসজিদে আকসা বর্তমান বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তিনি বিশ্ববাসীকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হন, 'ফিলিস্তিন ইস্যু বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা।' তিনি মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া এক বক্তব্যে বলেন,

> হে মুসলিম উম্মাহ, নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিন ও তার অধিবাসীরা প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হাতে নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে আসছে। তারা আলোচনার মাধ্যমে নয়; বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে হানা দিয়েছে। অতএব, আলোচনার টেবিল নয়; বরং শক্তি প্রদর্শন করেই এটি ফেরত আনতে হবে। শুধু লোহার মাধ্যমেই লোহা কাটা যায়। আল্লাহ আমাদের জন্য এটি ফিরে পাওয়ার পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে,
>
> 'আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কারও জিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে থাকুন, শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।' [সুরা নিসা : ৮৪]

তাই যুদ্ধ ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই কাফিরদের শক্তি খর্ব হবে। পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে দজলা ও ফুরাতের পবিত্র ভূমিতে চলমান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে নিজেদের মোর্চা শক্তিশালী করার মাধ্যমেই মসজিদে আকসা হানাদারমুক্ত করা সম্ভব। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও আল্লাহর ওপর একান্ত ভরসার মাধ্যমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অকল্পনীয় সাহায্যের প্রত্যাশা করা যায়।

শায়খ উসামা বিন লাদেন ফিলিস্তিনে ইসরাইলের অত্যাচার-নিপীড়নকে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার মুখ্য কারণ হিশেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নাইন ইলেভেনের সফল আক্রমণের পর মার্কিনদের লক্ষ্য করে দেওয়া তাঁর বক্তব্যে ঐতিহাসিক এক শপথ করেছিলেন,

> আমি ওই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি স্তম্ভবিহীন আসমানকে সমুন্নত করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিলিস্তিনে সত্যিকারার্থে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পারব না, যতদিন পর্যন্ত মার্কিনরা মুহাম্মাদ সা.-এর পবিত্র ভূমি থেকে বেরিয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা ও তার অধিবাসীরা নিরাপদে শ্বাস নিতে পারবে না।[৬]

ফিলিস্তিনিদের মনোবল ও সাহস ধরে রাখতে তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন,

> আমরা আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের শিশুদের রক্ত আমাদেরই সন্তানের রক্ত, তোমাদের রক্ত আমাদেরই রক্ত। তোমাদের রক্তের বদলা আমরা তাদের রক্তের মাধ্যমে নেব। তোমাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের বদলা আমরা তাদের ধ্বংসের মাধ্যমে অর্জন করব। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা কখনো তোমাদের একা ছেড়ে যাব না। হয়তো এ পথে বিজয় অর্জিত হবে; অথবা আমরা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব রা.-এর পরিণতি বরণ করব। আমরা তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, ইসলামকে বিজয়ী করার যোদ্ধারা যাত্রা শুরু করেছে, ইয়ামেন থেকে আসা সাহায্য-সহযোগিতা ইনশাআল্লাহ আর বন্ধ হবে না।

তিনি তাঁর আরেক বক্তব্যে বলেন,

> আল্লাহর নির্দেশে যত দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে একজন মুসলমানও অবশিষ্ট থাকবে, ফিলিস্তিনের এক ইঞ্চি জায়গা আমাদের দখল থেকে চলে যেতে দেবো না। কাঁটার চাষ করে কেউ আঙুরের আশা করতে পারে না।

হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন দখলদারত্ব প্রকাশ

ফিলিস্তিন ও মসজিদে আকসা দখলের পর ইহুদি-খ্রিষ্টান লবি হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে হানা দিয়েছে। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে কুয়েতের উপর ইরাকের দখলদারত্বের অজুহাত ও সৌদি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতায় মার্কিন সেনারা হারামাইনের পবিত্র

---

৬ ১১ সেপ্টেম্বরের পর দেওয়া বক্তব্য।

ভূমিতে প্রবেশ করেছে। মুসলমানদের প্রিয় ভূমি হারামাইন শরিফাইন আজ অপবিত্র মার্কিন সৈন্যদের বিচরণস্থল। উম্মাহর অধিকাংশ সদস্য আজ এই ব্যাপারে অনবগত। তারা এ কথা জানে না, বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববির আশেপাশে আজ কী হচ্ছে? আলে সালুল তথা সৌদিআরবের শাসকরা আজও উম্মাহর বেশিরভাগ সদস্যের কাছে 'খাদিমুল হারামাইন আশ-শরিফাইন' নামে পরিচিত।

শায়খ উসামা বিন লাদেন বলেন,

> আজ মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে তাদের শত্রুরা আল্লাহর ঘরের পবিত্র ভূমিতে হানা দিয়েছে, যে ভূমিতে আমাদের প্রিয় নবিজির মসজিদ অবস্থিত। শত্রুদের কূটকৌশল ও আমাদের অবহেলায় আমাদের প্রথম কিবলা, মিরাজের স্মারক মসজিদে আকসা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ক্রুসেডীয় শক্তি আজ ইসলামের জন্মভূমি ও আমাদের পবিত্র হিজাজভূমিকে নিজেদের ঘাঁটি বানিয়েছে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোনো উপায় নেই। আমাদের সামনে বিপদাপদ এসেছে; কিন্তু নিঃসন্দেহে মক্কা ও মদিনায় কাফিরদের হানা সবচেয়ে ভয়ানক। রাসুল সা.-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে এত বড় বিপদ আসেনি। কাফিররা কখনো আল্লাহর ঘরের দিকে হাত বাড়ানোর দুঃসাহস করেনি; কিন্তু আজ এই পবিত্র ভূমি ইহুদি-খ্রিষ্টান নারী-পুরুষদের বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই অপবিত্র মানুষগুলো আমাদের প্রিয় নবির জন্মস্থান, জিবরাইল আ.-এর আগমনের স্থানকে পদদলিত করছে। মুসলমানরা নিষ্ক্রিয় হয়ে আল্লাহর সাহায্যের আশা করে কত দিন বসে থাকবে? শত্রুদের প্রতিবাদ না করে কত দিন নিস্পৃহ থাকবে? পৃথিবীর ইমানদার ব্যক্তিরা কবে জাগ্রত হবে? কবে ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যদের অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে এই পবিত্র ভূমি মুক্ত করবে? এটিই যে আল্লাহর বিধান।
>
> 'হে ইমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের দিকে না আসে। [সুরা তাওবা : ২৮]
>
> 'তোমরা আরব-ভূখণ্ড থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।'
>
> মুসলমানরা কি আজ রাসুল সা.-এর মৃত্যুশয্যায় দেওয়া এই নির্দেশ ভুলে গেছে? মক্কা ও মদিনার পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সৈন্যদের প্রবেশের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আজ মুহাম্মাদে আরাবির উম্মতগণ, জাজিরাতুল আরবের কারাগারে বন্দি; অন্যদিকে অপবিত্র মার্কিন সেনারা রাসুলের পবিত্র

ভূমিতে নির্দ্বিধায় ঘোরাফেরা করছে। মানুষের অন্তর থেকে কি ইমানের শেষ বিন্দুটুকুও বিলীন হয়ে গেছে? মানুষের মনে কি রাসুলের দীনের জন্য সামান্য আত্মমর্যাদাবোধও নেই?

শানে রিসালাতের হিফাজত

আজ বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টান রাষ্ট্রসমূহে রাসুল সা.-এর মর্যাদাহানি যেন এক স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্য এ নিয়ে ব্যথিত। উসামা বিন লাদেন রাসুল সা.-এর মর্যাদা রক্ষায় মিছিল-মিটিং ও বিভিন্ন কাগুজে দাবি-দাওয়ার মরীচিকায় বিভ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহসী কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন,

> যদি তোমাদের বাকস্বাধীনতার কোনো মূলনীতি না থাকে, তাহলে আমাদের প্রতিক্রিয়ার স্বাধীনতার মূল্য চুকাতে প্রস্তুত থেকো। তোমরা সাম্য ও নিরাপত্তার কথা বলো; অথচ তোমাদের সামরিকবাহিনী বিভিন্ন দেশে আমাদের অসহায় বেসামরিক নাগরিকদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে। তোমরা এই গণহত্যা থামিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ক্রুসেডারদের উসকানি দিতে ভ্যাটিকানের ফরমুলায় নতুন রূপরেখা প্রকাশ করছ। যার স্পষ্ট অর্থ এই, তোমরা মুসলমানদের অবিরত জিহাদে লিপ্ত থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করছ। তোমরা যেন মুসলমানদের সামনে প্রশ্ন রাখছ—তাদের কাছে তাদের সহায়-সম্পত্তি ও জীবনের চেয়ে তাদের নবি অধিক প্রিয় কি না? শুনে রেখো, তোমরা আমাদের উত্তর শুনবে না; দেখতে পাবে। যদি আমরা রাসুলের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে না পারি, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। নিরাপত্তা হিদায়াতের অনুসারীদের জন্য।

জীবনের মৌলিক লক্ষ্য

শায়খ উসামা বিন লাদেন নিজের জীবনের মৌলিক লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছেন,

> আমার জীবনের মৌলিক লক্ষ্য, জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বহিষ্কার করা। আমাকে সহযোগিতা করায় পৃথিবীর সকল মুসলমানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এটা শুধু আমার একার নয়; প্রতিটি মুসলমানেরই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাসুল সা. নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব-ভূখণ্ড থেকে বের করে দাও।' ইসলামি শরিয়াই আমাদের জন্য এ লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমি আবেগতাড়িত হয়ে বলছি না; বরং শরিয়তের স্পষ্ট দলিলের আলোকেই

বলছি। ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গোরিয়ান বলেছিলেন, 'আমরা গণতন্ত্র বা সামরিক বিপ্লবের ভয় করি না; আমাদের শঙ্কা একমাত্র ইসলাম।'

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধে মুসলমান মুজাহিদদের জিহাদি আবেগের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন ইহুদি জেনারেল বলেছিলেন, 'এদের কাছে সরকারি নীতিমালার আওতায় গতানুগতিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নাম জিহাদ নয়; এরা অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। এরা আমাদের ইসরাইলি সেনাদের মতো শুধু দেশরক্ষার তাগিদে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না; এসব উগ্র মুসলমানরা মৃত্যুর অন্বেষায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।' এটাই আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য। বস্তুত ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য শঙ্কা মনে করে। যদিও অধিকাংশ মুসলমান এ ব্যাপারে বেখবর। ইহুদি ও নাসারাদের সকল চক্রান্ত সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ ইসলামই বিজয়ী হবে। বস্তুত রাসুল সা.-এর মাধ্যমে আমরা এ সুসংবাদ পেয়েছি, যা হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ।

বিন লাদেন নিজের জীবনের লক্ষ্য হিশেবে যে দর্শনের লালন করেছেন, তা শুধু বাস্তবায়নই করেননি; তাঁর হাতেগড়া বীরসেনানীরা এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিজেদের জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছেন। তাগুতি শক্তির কেন্দ্র আমেরিকার ধ্বংস, ইসলামি খিলাফতের পুনর্জন্ম দান ও মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদে আকসা ইহুদিদের হাত থেকে মুক্ত করাই এ দর্শনের সারকথা। এই কয়েকটি শব্দকে ব্যক্তিগতজীবনে বাস্তবায়ন করা ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়; কিন্তু বিন লাদেন ও ইসলামি বীরসেনানীদের ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞায় কঠিন লক্ষ্যও সহজে ধরা দেয়। আল্লাহর ওপর ভরসা ও আস্থা থাকে তাঁদের নিত্যসঙ্গী। আর তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহায্য এসে পৌঁছায়। তাঁদের সাহায্যে অবতরণ করেন আসমানের ফেরেশতারা।

বিন লাদেন ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষকতা করা মার্কিনদের অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থে হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার আলোকে সৌদিআরব, কেনিয়া, সোমালিয়া ও তানজানিয়া থেকে শুরু করে মার্কিন ভূখণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ধারাবাহিক হামলা চালানো হয়। শেষপর্যন্ত নাইন ইলেভেনের ঘটনায় বিশ্ববাসী অবাক হয়ে বিশ্ব-পরাশক্তির পতনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে।

এখানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে করছি :

- ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে আল কায়দা ইয়ামেনের এডেন শহরের গোল্ড মোহর

হোটেলে অবস্থানরত সোমালিয়াগামী মার্কিন সৈন্যদের উপর বোমা হামলা করে।

- ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পার্কিংয়ে রামজি ইউসুফ গোলাবারুদ-ভরতি ট্রাক বিস্ফোরণ ঘটান। রামজি ইউসুফ বিন লাদেনের আস্থাভাজন শায়খ উমর আবদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।
- ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর সৌদিআরবের রিয়াদে গাড়িবোমা হামলায় পাঁচ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।
- ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুন সৌদিআরবের আল খুবর আজ-জাহ্রান শহরের মার্কিন বিমানঘাঁটিতে মুজাহিদরা ট্রাক দিয়ে হামলা চালায়। ওই হামলায় ২৯ জন মার্কিন সৈন্য নিহত।

এটাই মূল অর্জন নয়; এ হামলার ফলে মার্কিনরা সৌদি নাগরিকদের আক্রোশ এড়াতে বিনা নোটিশে সৌদিআরবে অবস্থিত তাদের সকল সেনাঘাঁটি ও অফিসগুলো শহর থেকে দূরবর্তী মরু অঞ্চলে নিয়ে যায়। এ ফলাফল থেকে বিন লাদেনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দুটি ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত, এ হামলায় প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সেনাদের প্রাণহানি ঘটে। আবার এ হামলার প্রেক্ষিতে তারা হারামাইন শরিফাইনের কাছ থেকে দূরে গিয়ে মরু অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, সৌদিআরবের জনসাধারণের মধ্যে বিন লাদেনের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি হারামাইন শরিফাইন থেকে হানাদার মার্কিনদের বিতাড়নের দাবিকে জনসাধারণের মধ্যে এতটাই গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন যে, এখন মার্কিন সৈন্যরা তাদের আক্রোশ এড়াতে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এসব হামলার ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদেন বলেন, 'ইরাকে খাদ্য ও ওষুধের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমাদের লাখ লাখ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে; অথচ মার্কিনরা একে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে গণ্য করছে না। তাই মার্কিনদের কথায় আমাদের প্রভাবিত হওয়া যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হবে এবং শেষপর্যন্ত আমরাই বিজয়ী হব ইনশাআল্লাহ। রিয়াদ ও আল খুবরানের মার্কিনঘাঁটিতে হামলাকারীরা আমাদের হিরো। তাঁরা স্বজাতির মাথা উঁচু করে দিয়েছে। তাঁরা সত্যিকারার্থে আমাদের বীর।'

- ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আল কায়দা বিভিন্ন দেশে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা চালায়। কেনিয়ার নাইরোবি ও তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা চালানো হয়। এসব হামলায় ফলে প্রায় ২০০ মার্কিন সৈন্য নিহত ও পাঁচ হাজারের অধিক আহত হয়।

- ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে ইউএসএসকোল নামের একটি মার্কিন নৌযান জাহাজ আল কায়দার হামলায় ধ্বংস হয়।
- ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর আল কায়দা আমেরিকার ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ হামরা করে। ১৯ জন মুজাহিদ চারটি বিমান ছিনতাই করে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে এ হামলা চালায়। ফলে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি আকাশচুম্বী ভবন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এ হামলায় ৩ হাজারের বেশি মার্কিনী নিহত হয়।
- ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডিসির ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে জন এলেন মুহাম্মাদ তিন সপ্তাহে ১৩ জন মার্কিনীকে হত্যা করেন। ২৩ অক্টোবর জন এলেন মুহাম্মাদকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তিনি নও-মুসলিম ছিলেন। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর পূর্বে তিনি মার্কিন বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।
- ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে নাইটক্লাবে আল কায়দার মুজাহিদরা হামলা করে। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকসহ ২০২ জন নিহত হয়।
- ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর কেনিয়ার মোম্বাসা হোটেলের কাছে আত্মঘাতী হামলায় ১৩ জন ইসরাইলি নিহত হয়।
- ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ব্রিটেন-দূতাবাসের বাইরে বোমা হামলায় ৫৭ জন নিহত ও ৭০০-এর অধিক আহত হয়।
- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের খ্রিষ্টানদের বহনকারী একটি জাহাজে হামলা চালোনো হয়। এতে ১১৭ জন নিহত হয়।
- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ স্পেনের মাদ্রিদে ট্রেনে বোমা হামলা চালানো হয়, ওই হামলায় ১ হাজার ১০১ জন নিহত ও ২ হাজার ৫০ জনের অধিক আহত হয়।
- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে সৌদিআরবের আল-খুবর শহরে তেল শোধনাগারে মুজাহিদরা হামলা চালায়। ওই হামলায় ১৯ মার্কিনীসহ ২২ জন নিহত হয়।
- ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই লন্ডনের মেট্রোরেল ও বাসে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। হামলায় ৫৬ জন নিহত ও ৭০০-এর অধিক আহত হয়।
- ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুলাই মিসরের শারম আল শায়খে হামলা চালিয়ে

কয়েকজন খ্রিষ্টানকে হত্যা করে।

- ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে আম্মানের হোটেল হায়াত আম্মান ও অন্য দুটি হোটেলে একযোগে হামলা চালানো হয়। এসব হামলায় ৬০ জন নিহত হয়।
- ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর মার্কিন বাহিনীর মেজর হাসান নাদাল তার দুই সহযোগীকে নিয়ে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সেনাক্যাম্প টেক্সাসের পোর্ট হুডে ফায়ারিং করে আফগানিস্তানগামী ১৩ জন মার্কিন সৈন্যকে হত্যা করেন। এই হামলায় ৩১ জন আহত হয়। এ ঘটনায় আমেরিকাজুড়ে শোকের মাতম শুরু হয়।
- ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের অবকাশে নাইজেরিয়ান মুজাহিদ উমর ফারুক আবদুল মুত্তালিব আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংসের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যদিও তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি; কিন্তু এ হামলায় আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
- ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে আবু দুজানা খোরাসানি খোস্তের সিআইএর সদরদপ্তরে হামলা চালিয়ে সিআইএর ১০ জন কর্মকর্তাকে জাহান্নামে পাঠান। মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনীর ইতিহাসে এটি ছিল এক ভয়াবহ হামলা।

শায়খ উসামা বিন লাদেন তাঁর পুরো জীবন রাসুল সা. মুখনিঃসৃত চূড়ান্ত যুদ্ধসমূহের ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। এ বিশ্বাসের ফলে আল্লাহ তাঁর হাতেই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হওয়া চূড়ান্ত যুদ্ধের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি বিশ্বের কুফরি শক্তির নেতৃত্বদানকারী মার্কিনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করে হক-বাতিলের এমন যুদ্ধের সূচনা করেছেন, যা কাফিরদের পরাস্ত করে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করবে ইনশাআল্লাহ।

মার্কিনদের ছায়া থেকে জিহাদ পবিত্র রাখা

জিহাদের মতো পবিত্র ইবাদতকে তাগুতি শক্তির প্রভাবমুক্ত রাখা উসামা বিন লাদেনের স্মরণীয় কীর্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংঘটিত জিহাদের শেষ কয়েক বছরে কিছু জিহাদি সংগঠন কর্তৃক মার্কিনদের গোপন সাহায্য ও পাকিস্তান-সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদের মতো পবিত্র ইবাদাতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। কাফির মিডিয়া বিশ্বজুড়ে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে, মার্কিন ডলার ও স্টিঙ্গার মিসাইলের সাহায্যে মুজাহিদরা রুশদের পরাজিত করেছে। টানা এক দশক অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে রিক্তহস্তে

সাধারণ মুজাহিদরা রুশদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বগাথা রচনা করেছেন, জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে তা গোপন করা হয়। মিডিয়ার মাধ্যমে এভাবেই জিহাদকে মার্কিন ব্র্যান্ডে পরিণত করা হয়। পাশাপাশি কাশমিরি জিহাদকেও পাকিস্তানের গোয়েন্দা এজেন্সি আইএসআইর হাতে জিম্মি করার চেষ্টা করা হয়।

উসামা বিন লাদেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা ইসলামি জিহাদের কায়া থেকে মার্কিন ছাপ পরিপূর্ণরূপে মুছে ফেলতে সক্ষম হন। তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, রুশদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে আরব-আজমের মুজাহিদদের অসাধারণ আত্মত্যাগের ফলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তৎকালীন বিশ্ব-পরাশক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল। এরপর তিনি এ প্রোপাগান্ডা সমূলে বিনাশ করতে আমেরিকাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ মার্কিন ডলার ব্যতীতই পরিচালিত হয়। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করেই মার্কিনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ইঙ্গ-মার্কিন জোটকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে টেনে এনেছেন।

একদিকে ছিল আমেরিকা ও তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। তাদের পাশে ছিল সংঘবদ্ধ মিত্রশক্তি ও আজ্ঞাবহ নামধারী মুসলিম শাসকশ্রেণি। ছিল সুবিশাল সামরিক শক্তি ও তৎপর গোয়েন্দাবাহিনী। অন্যদিকে ছিল গাজওয়ায়ে আহজাবের দৃশ্য মঞ্চায়নে অল্পসংখ্যক মুজাহিদের বাহিনী। তাদেরকে দিনের পর দিন কাটাতে হতো শুকনো খেজুরের ভরসায়। অস্ত্র বলতে ছিল জংধরা বন্দুক ও দেশীয় গোলাবারুদ। যারা ইসলামকে বিজয়ী করার মানসে আত্মঘাতী হতেও দ্বিধা করতেন না। অতঃপর বিশ্ববাসী অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করে শুকনো রুটি খেয়ে আফগান মুজাহিদদের দুর্জয় রুশবাহিনীকে আমু নদী পর্যন্ত ধাওয়া করছে। সেই বীরপুরুষেরাই আজ মার্কিন জোটকে পরাজয়ের দুঃস্বপ্ন দেখাচ্ছেন। শায়খ উসামা বিন লাদেন যেন বিশ্ববাসীর সামনে সেই কবিতার বাস্তবতা উপস্থাপন করেছিলেন,

বদরের পরিবেশ তৈরি করো, আজও ধুলির বুক চিরে ফেরেশতারা
দলে দলে তোমার সাহায্যে আসতে পারে।

আমিরুল মুজাহিদিন শায়খ উসামা বিন লাদেন বদরের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, উহুদের ময়দানের দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন। নিজের সহযোদ্ধাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের অবস্থার বিবরণ যেন কুরআনের ভাষায় আগেই তুলে ধরা হয়েছিল,

> যাদের লোকেরা বলেছে, তোমাদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য লোকেরা একত্র করেছে বহু সাজসরঞ্জাম, তাদের ভয় করো। তখন তাঁদের বিশ্বাস

> আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তাঁরা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কতই-না চমৎকার কামিয়াবি দানকারী। [সুরা আলে ইমরান : ১৭৩]

আহজাবযুদ্ধের মতোই নিজেদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সংঘবদ্ধ বাহিনী দেখে তাদের অবস্থান ছিল কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ,

> যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ইমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। [সুরা আহজাব : ২২]

যার ফলে যে-সকল পাপী ও দুর্বল মনের লোক জিহাদ ও জিহাদের দর্শন নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, তারা স্তব্ধ হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের পরাজয় প্রত্যক্ষ করে। শায়খ উসামা বিন লাদেন প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা মার্কিন সাহায্য ব্যতীতই আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহে বিজয়ের দেখা পেয়েছিলেন।

জিহাদি বিপ্লবের মাধ্যমে বিন লাদেন আল ওয়ালা ওয়াল বারার দর্শনকে যতটা ব্যাপক করে তুলেছিলেন, খিলাফত পতনের পর এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ব্যক্তিগত চাহিদা ও মনস্কামনার স্বার্থে এ দর্শনকে সবাই বিকিয়ে দিচ্ছিল। সাধারণ মানুষও এ ব্যাপারে ছিল বেখবর; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তিনি ইসলামের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার দর্শনকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তুলছিলেন। বক্তব্য ও লেখালেখির মাধ্যমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এই ইসলামি আকিদার ব্যাপক আলোচনা করতেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকেই নিজেদের হৃদ্যতা-শত্রুতা, আন্তরিকতা ও বিদ্বেষের সম্পর্কগুলো নির্ধারণ করে।

তিনি বলেন,

> আল ওয়ালা ওয়াল বারা ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ, আমরা এমন ব্যক্তির সঙ্গে ভালোবাসা পোষণ করব, যে রাসুলের সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করে এবং এমন ব্যক্তির সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দুশমন। দুনিয়া পূজারিরা সাধারণত ক্ষমতাসীনদের অনুগত হয়। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যার বন্ধুত্ব আছে, তাকে নিজের বন্ধু মনে করে এবং ক্ষমতাসীনদের শত্রুকে নিজের শত্রু বলে গণ্য করে। নিজের বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদার বিপরীতে এমন অন্ধত্ব কি মনুষ্যত্বের আচরণ হতে পারে? একজন সুনাগরিক হওয়ার জন্য আমরা কি আমাদের ধর্ম ও বিবেকের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করতে পারি?

ইসলামি গবেষকগণ বলেন, কাফিরদের সঙ্গে যে হৃদ্যতা পোষণ করবে, তাদের নিজের নেতা হিশেবে গ্রহণ করবে, সে কুফরি অবলম্বন করল। বক্তব্য বা লেখার মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডের সহযোগিতা করাও তাদের সঙ্গে হৃদ্যতার প্রমাণ। অতএব, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে জর্জ বুশ ও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে, সে যেন কুফরি অবলম্বন করল। আল্লাহ্ বলেন,

> বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদের আপনি দেখবেন দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে আমরা আশঙ্কা করি, পাছে-না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সে দিন দূরে নয়, যে দিন আল্লাহ্ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন; অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবে, এরাই কি সে-সকল লোক, যারা আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। [সুরা মায়িদা ৫২]

উক্ত আয়াতের তাফসিরে ইবনে কাসির রাহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যে কাফির, তা অনেক সাহাবিও জানতেন না। মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধলে বিষয়টি যখন রাসুল সা.-এর সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন সে ইহুদিদের সমর্থন করে। তখনই উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়, কোনো মুসলমান যদি কাফিরদের সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতা করে, তাহলে সে তার কৃতকর্মের কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। কিছু কারণে যেমন অজু ভঙ্গ হয়, তেমনি কিছু কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন মানুষ ইমানহারা হয়ে যায়। কাফিরদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও মুসলমানদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেওয়া কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম।

তাই যারা কাফিরদের নেতা হিশেবে গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করে, তাদেরকে মুক্তিদাতা মনে করে, নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে কুফরিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলেন,

> হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো

তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। [সুরা মায়িদা : ৫৪]

তাই মুসলমানদের স্পষ্টভাবে বলতে চাই, তারা যেন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করে। তাদের সমর্থনে অজ্ঞাতসারে একটি শব্দ বেরিয়ে পড়লেও যেন একান্ত মনে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে।[৭]

ইসলামি ভূখণ্ডে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান

শায়খ উসামা বিন লাদেন তাঁর সম্মোহনী বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন ও জিহাদের জন্য উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ইসলামের দৃষ্টিতে মুরতাদের বিধানের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তাদের সামনে তুলে ধরেন। মুসলমানদের দেশে মুসলিমবিদ্বেষীদের শাসনের বিপদ ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধিবিধান আলোচনা করেন। সর্বাত্মক জিহাদের ফরজ আদায়ের জন্য জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। প্রতিটি মুসলমানকে সম্বোধন করে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন,

> মুফতি নিজাম উদ্দিন শামজায়ি ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের হামলার পর প্রকাশ করা তাঁর প্রসিদ্ধ ফাতওয়ায় বলেন, 'যদি কোনো ইসলামি সাম্রাজ্যের শাসক কাফিরদের সহযোগিতা করে, তাহলে মুসলমানদের উচিত তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা। তাকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিশ্বাসঘাতক হিশেবে চিহ্নিত করা উচিত।'
>
> হে পাকিস্তানের প্রিয় মুসলমানরা, নিঃসন্দেহে মুফতি নিজাম উদ্দিন শামজায়ি নিজের দায়িত্ব আদায় করেছেন। নির্ভীকভাবে সত্য উপস্থাপন করেছেন, শাসকের অত্যাচারের ভয়ে তিনি নিশ্চুপ থাকেননি। তিনি সবার সামনে পারভেজ মোশাররফের ব্যাপারে ইসলামের বিধান তুলে ধরেছেন। পারভেজ মোশাররফ ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা আবশ্যক। এ ফাতওয়ার কারণে পারভেজ মোশাররফ ও তার মার্কিন প্রভুরা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল। আমার ধারণা, তারাই মুফতি সাহেবের হত্যাকারী।
>
> মুফতি নিজাম উদ্দিন শামজায়ি নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন

---

৭ *জাদিদ সালিবি জঙ্গে।*

করেছেন। সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরিবর্তন করেননি। আমাদের উচিত আমরা যেন অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। আমরা দায়িত্বপালনে যথেষ্ট বিলম্ব করেছি। এ ফাতওয়া প্রকাশের আজ প্রায় ৬ বছর হয়েছে। আমাদের ত্রুটির মার্জনা পেতে এখনই জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। হয়তো আল্লাহ আমাদের ত্রুটির ক্ষমা করে দেবেন।[৮]

এই ছিল শায়খ উসামা বিন লাদেনের জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। বস্তুত তাঁকে ইতিহাসের এমন মহামানবদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁরা আল্লাহর বাণী সমুন্নত করতে নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন। চতুর্মুখী বিরোধিতা সহ্য করে নিজের দলকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে রেখে মহান প্রভুর দরবারে হাজিরা দিয়েছেন। ইসলামের এই বীরপুরুষ দয়াময়ের জান্নাতে পৌঁছেছেন, করুণাময় স্বয়ং সেখানে তাঁর মেহমানদারি করবেন। নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য হিজরত করা এই মুহাজিরের চিরস্থায়ী ঠিকানা কতই-না সুন্দর হবে, আমাদের সীমিত মস্তিষ্ক ও বিবেক হয়তো তার কল্পনাও করতে পারবে না। হয়তো তাঁর পার্থিব দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যদি তাঁর আত্মাকে ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতারা স্বাগত জানান, এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে? আরশে আজিমের নিচে হয়তো রাসুল সা. তাঁর সাহাবিদের নিয়ে তাঁর দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই মর্দে মুজাহিদকে স্বাগত জানাবেন। আমার আল্লাহ চাইলে হয়তো শায়খ উসামা বিন লাদেন জান্নাতের প্রাসাদে বসে তাঁর সহযোদ্ধাদের বিজয়গাথা অবলোকন করবেন। হয়তো আল্লাহ তাঁকে মুমিনদের চূড়ান্ত বিজয় ও কাফিরদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দৃশ্য সেখান থেকেই প্রত্যক্ষ করাবেন, যাতে তাঁর চক্ষু শীতল হবে।

চারটি ভূখণ্ডে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়

ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারের জন্য নিজস্ব ভূখণ্ডের প্রয়োজন। এমন একটি ভূখণ্ডের প্রয়োজন, যা এই দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ও মারকাজ হবে। এই দর্শনে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই রাসুল সা. নবুওয়াতের শুরুলগ্ন থেকে এমন একটি ভূখণ্ডের সন্ধান করছিলেন, যাকে ইসলামপ্রচারের কেন্দ্র হিশেবে গ্রহণ করা যায়। প্রথমে তিনি পবিত্র মক্কায় ১৩ বছর অতিবাহিত করেন। রাসুল সা. অসাধারণ বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করা হতো। ইসলামপ্রচারের যাবতীয় উপাদান পূর্ণ বিদ্যমান সত্ত্বেও মক্কা অবস্থানকালে হাতেগোনা কয়েকজন ইসলামগ্রহণ

৮ লাল মসজিদের শাহাদাতের পরের বয়ান।

করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাওহিদের বাণীর পর্যাপ্ত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এর ব্যাপক প্রসারে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন, যা ইসলামের বাণী প্রচারে সহযোগিতা করবে।

আল্লাহ দীর্ঘ ১০ বছর পর মদিনার পবিত্র ভূমিতে রাসুল সা.-এর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেন। আনসার সাহাবিগণ রাসুলের আহ্বানে সাড়া দেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলামি দাওয়াতের জন্য আঞ্চলিক শক্তির প্রয়োজন অপরিসীম। এ জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় শক্তির অন্বেষণ করা আবশ্যক। এর বাস্তবতা বর্তমানে আরও স্পষ্ট। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যখন ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, বহুসংখ্যক ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা-মসজিদ ও গ্রন্থাগার থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, পৃথিবীতে ইসলামের শক্তি দিন দিন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ রাসুলের জীবনপদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ছেড়ে দিয়েছে; অথচ রাসুলের জীবনপদ্ধতি অত্যন্ত স্পষ্ট। শরিয়তের বাণীসমূহে রাসুলের জীবনপদ্ধতি অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শায়খ উসামা বিন লাদেন জীবনভর রাসুলের জীবনাদর্শের অনুসারী ছিলেন। একদিকে তিনি নিজের যাবতীয় সামর্থ্য ও উপকরণ জিহাদের ময়দানে ব্যবহার করেছিলেন, অন্যদিকে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আলিম ও শাসকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ রক্ষা করে পৃথিবীর কোনো একটি ভূখণ্ডে ইসলামি শরিয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছিলেন, যে ভূখণ্ড থেকে বিশ্বজনীন জিহাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। যেখান থেকে কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে মোর্চা সামলানো হবে। এ চিন্তাধারা বাস্তবায়নে তিনি জাজিরাতুল আরব (সৌদিআরব), সুদান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে প্রথম টার্গেট বানান।

তাঁর মৌলিক লক্ষ্য ছিল মুসলিমবিশ্বের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ ও আলিমগণের মাধ্যমে জনসাধারণকে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা ও মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করা। এ ব্যাপারে তাঁর দর্শন ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি মুসলিমবিশ্বের আলিম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে অত্যন্ত গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করেন। এটি ছিল তাঁর ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার গভীর পরিচায়ক। এসব অঞ্চলের শাসকদের ইসলামি শরিয়তের অনুসারী করে এসব ভূখণ্ডে ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠার যথাসম্ভব প্রক্রিয়া শুরু করা। অতঃপর এ ভূমি থেকেই মসজিদে আকসা উদ্ধারসহ সকল লক্ষ্য অর্জনের অভিযান পরিচালনা করা। যেখান থেকে কাফিরবিশ্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের প্রয়োজনীয়

প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির পর্বও সমাধা করা হবে। বর্তমানে ইসলামি শরিয়ার আলোকে জিহাদের নেতৃত্বদানকারীদের তাঁর এ দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-উপাদান রয়েছে। এসব অঞ্চলে তিনি কীভাবে দীন প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের ভূমিতে পানি সিঞ্চনের প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা লক্ষ করা উচিত।

পাকিস্তান

জিহাদে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে আফগানিস্তানে পৌঁছার ক্ষেত্রে শায়খ উসামা বিন লাদেন সর্বপ্রথম পাকিস্তানে আগমন করেছিলেন। স্বভাবতই পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর গভীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা তৈরি হয়। যখন আফগানিস্তানে রুশবাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন পাকিস্তানের পরিস্থিতিও দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। পশ্চিমারা সেখানে নিজেদের অনুকূল ব্যক্তিদের ক্ষমতায় বসাতে তৎপর হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে তিনি নওয়াজ শরিফের সঙ্গে পাঁচ বার সাক্ষাৎ করেন। তন্মধ্যে এক বার মদিনার গ্রিন প্যালেস হোটেল, এক বার জিদ্দা ও একবার লাহোরে সাক্ষাৎ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি পাকিস্তানে ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠা ও আফগান জিহাদে সহযোগিতার জন্য যেকোনো মূল্যে আইজেআই[১] কে ক্ষমতায় আনতে নওয়াজ শরিফকে কোটি কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন, যেন তারা আইজেআইকে যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় আনার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন, যেকোনো মূল্যে বেনজির ভুট্টোকে ক্ষমতায় আসতে বাধা দেওয়া। মার্কিনরা বেনজির ভুট্টোকে নিজেদের এজেন্ডা ও সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল।

অন্যদিকে শায়খ উসামা পাকিস্তানের প্রভাবশালী ইসলামি দল ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ বহাল রাখেন, যাদের মধ্যে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাওলানা সামিউল হক, মাওলানা ফজলুর রহমান ও জামাআতে ইসলামির আমির কাজি হোসাইন আহমাদ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানি আলিমদের মধ্যে মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি, মুফতি রশিদ আহমাদ, মাওলানা সলিমুল্লাহ খান, মাওলানা হাকিম আখতার, মাওলানা সাইয়িদ শের আলি শাহ ও মাওলানা আবদুল্লাহ শহিদ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। তাঁর অনুরোধে পাকিস্তানি আলিমগণ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন :

---

১ পাকিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক ইসলামি জোট (ইসলামি জমহুরি ইত্তেহাদ)। পাকিস্তনের সেনাশাসক জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর পিপলস পার্টির বিরুদ্ধে এ জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।—অনুবাদক।

- হারামাইন রক্ষা পরিষদ গঠন

আমেরিকার ইরাকে হামলা ও ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পবিত্র হারামাইন ভূমিতে দখলদারির প্রতিবাদে মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়িসহ প্রসিদ্ধ আলিমগণের অংশগ্রহণে 'তাহাফফুজে হারামাইন পরিষদ' গঠন করা হয়।

- ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতা

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর উসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের আলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করেন। এ পরিকল্পনায় তিনি সফল হয়েছিলেন। পাকিস্তানের বহু আলিম আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হন।

- আফগানিস্তান রক্ষা কাউন্সিল গঠন

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে জামিয়া হাক্কানিয়াহ খটক-এর আহ্বানে 'আফগানিস্তান সুরক্ষা কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এই আফগান প্রতিরক্ষা কাউন্সিলই পরবর্তী সময়ে 'মুত্তাহিদা মজলিসে আমল' নামে পরিচিত হয়।

সৌদিআরব

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিন লাদেন সৌদিআরব ফিরে যান। সেখানে তিনি নিজের ব্যবসায়িক কাজকর্ম দেখাশোনার পাশাপাশি বৈশ্বিক জিহাদের নিয়মতান্ত্রিক রূপরেখা গঠন শুরু করেন। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক কুয়েত দখল করে নিলে তিনি সৌদিআরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সুলতান আবদুল আজিজকে প্রস্তাব করেন, যদি সৌদিআরব মার্কিনদের সাহায্য গ্রহণ না করে, তাহলে তাঁর মুজাহিদবাহিনী কুয়েত থেকে ইরাকি সেনাদের বের করে দেবে। তিনি সুলতান বিন আবদুল আজিজকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কোনোভাবেই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর ভরসা করা ঠিক হবে না। সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী শায়খ উসামা বিন লাদেনকে জিজ্ঞেস করেন, 'তারা ইরাকি এয়ারক্রাফট ও রাসায়নিক বোমার বিরুদ্ধে কীভাব লড়বেন?' উত্তরে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এটাই বলেছিলেন, 'আমরা ইমানি শক্তির মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করব।'

মার্কিনদের হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে আগমনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে শায়খ সৌদিআরবের বিভিন্ন শহরের বড় বড় মসজিদে গিয়ে বক্তব্য দিতেন। জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বহিষ্কারের ধর্মীয় বিধান কিয়ামতকাল পর্যন্ত বলবৎ,

এ মর্মে পাঁচ শতাধিক আলিমের স্বাক্ষরযুক্ত ফাতওয়া প্রকাশ করেন। বাদশাহ ফাহাদের সামনে এটি পেশ করা হলে বাদশাহ ফাহাদ উসামা বিন লাদেনকে নজরবন্দি ও অন্যান্য আলিমদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। উসামা বিন লাদেন সৌদি বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হারামাইনের পবিত্র ভূমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০ হাজার মুজাহিদকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন; কিন্তু বাদশাহ ফাহাদ আমেরিকার সাহায্য গ্রহণকেই শ্রেয় মনে করেন।

আরব ভূখণ্ডে মার্কিন হানাদারদের আগমনের পর শায়খ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

১. হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সেনাদের অবস্থানের বিরুদ্ধে ফাতওয়া সংগ্রহ করেন। যে ফাতওয়ার সমর্থনে মসজিদে নববির ইমাম শায়খ আলি আবদুর রহমান, ইবনু উসাইমিন ও সালিহ আল ফাওজানসহ পাঁচ শতাধিক আলিম স্বাক্ষর করেন।

২. আলিমগণের ওপর জনসাধারণের আস্থা ধরে রাখতে আলিমদের বেসরকারি সংগঠন তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

৩. বিভিন্ন শহরের মসজিদে জনসাধারণের সামনে এ ব্যাপারে শরিয়তের নীতিমালা স্পষ্ট করে ব্যাপক জনমত গঠনের চেষ্টা করেন।

মসজিদে নববির বয়োবৃদ্ধ ইমাম, বহু আলিমের উসতাজ আলি আবদুর রহমান আল হুজাইফি জুমুআর খুতবায় সৌদিআরবে মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কড়া সমালোচনা করেন। শায়খ হুজাইফি বিন লাদেনের প্রিয়ভাজনদের একজন ছিলেন। সৌদিআরবের তৎকালীন বাদশাহ ফাহাদের ভাই তালাল বিন আবদুল আজিজ বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমেরিকা-ব্রিটেনের ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যরা আরব ভূখণ্ডে সৌদিআরবের মতামতের তোয়াক্কা না করে জোরপূর্বক অবস্থান করছে।'

বিবিসি তাঁকে প্রশ্ন করে, 'ব্রিটেনের বাহিনী আরব ভূখণ্ডে অবস্থান করা সম্পর্কে আপনার মত কী?' উত্তরে তালাল বিন আবদুল আজিজ বলেন, 'আমেরিকা ও ব্রিটেনের ব্যাপারে মত দিয়ে লাভ নেই। যদি তাদের আরব ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়, তারা বের হবে না। আর জাজিরাতুল আরবের শাসকরাও তাদের সামনে অসহায়।'

আরবের রাজপরিবারের সঙ্গে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দহরম-মহরম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। এ অভিযোগে তিনি সৌদিআরবের রাজপরিবারের বিরোধিতা শুরু করেন। পরিস্থিতি

এ পর্যায়ে পৌঁছায়, বাদশাহ ফাহাদ এক অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের রানির সঙ্গে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নতজানু ভূমিকাতেই ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের অজুহাতে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সৈন্যদের দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি চেয়েছেন আরব শাসকরা যেন একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর ওপর ভরসা করে। তারা যেন খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের পবিত্র ভূমিতে ডেকে আনার পরিবর্তে মুসলমান মুজাহিদদের পাশে দাঁড়ায়, যাতে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের পবিত্র ভূমিতে দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে; কিন্তু তাঁর এ সকল প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তরে তাঁকে নজরবন্দি করা হয়, ফাতাওয়াদাতা আলিমগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। শুধু তা-ই নয়; এর তিন বছর পর ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সৌদি সরকার তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে। তিনি তখন সুদানে অবস্থান করছিলেন।

সুদান

সৌদিআরবে নজরবন্দি অবস্থায় জীবনযাপন করা তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে তিনি হিজরতের সুন্নাতের ওপর আমল করতে সুদানে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুতরাং ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সুদান-অভিমুখে হিজরত করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে আরব মুজাহিদদের বড় একটি দলও সুদানে হিজরত করেন।

সুদানে তখন উমর আল বাশিরের নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরা সুদানে শরিয়াভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যয়ী হয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটা দেখে শায়খ উসামা বিন লাদেন এই ভূখণ্ডকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেন।

দক্ষিণ সুদানে খ্রিষ্টান কাবায়েলি গোত্রগুলোর পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে বিদ্রোহ চলে আসছিল। সুদানের ইসলামপন্থি সরকার বিদ্রোহ দমনে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল; কিন্তু এ সফলতা ব্যর্থ করতে আমেরিকা উত্তর সুদান-সীমান্তে মিসরের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে দরিদ্র দেশটির ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে দেশটিতে ইথিওপিয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা-পরিকল্পনার শাস্তি দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ এড়াতে বিন লাদেন সুদানের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয়, সুদান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে দক্ষিণ সুদানের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও দুর্ভিক্ষ থাকেনি।

এ দিকে বিন লাদেন খারতুম বিমানবন্দরের সংস্কার কাজ শুরু করেন। খারতুম থেকে লোহিত সাগরের পোর্ট সুদান পর্যন্ত ১২০০ কিলোমিটারের পুরাতন রাস্তা নতুনভাবে সংস্কারের কাজে হাত দেন, এর ফলে খারতুম থেকে পোর্ট সুদানের দূরত্ব ৮০০ কিলোমিটারের চলে আসে। ইরাকি বংশোদ্ভূত ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ সাআদ এসব উন্নয়ন প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সুদানে অবস্থানকালে বিন লাদেন ৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে 'আশ-শিমালুল ইসলামি' নামে অর্থনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলেন। এ ছাড়া তিনি সুদানের মূল্যবান খনিজদ্রব্য আহরণ ও বিপণনের জন্য 'আল-আকিক' নামে নতুন কোম্পানির গোড়াপত্তন করেন। তিনি পাকিস্তান-আফগানিস্তান, ইয়ামেনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন, যার লভ্যাংশ জিহাদের জন্য ব্যয় করা হতো। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সুদান সরকার বিন লাদেনকে জাতীয় পদকে ভূষিত করে। সুদানের প্রেসিডেন্ট উমর আল বাশিরের নেতৃত্বে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এ পদক দেওয়া হয়।

সুদানকে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে বিন লাদেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেন। আল-হিজরাহ কনস্ট্রাকশন ডেভেলপমেন্টের ভিত্তিস্থাপন করেন। পোর্ট সুদানে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব সুদানে 'আস-সামারুল মুবারক' নামে কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নেন। নিম্ন আয়ের এ দেশটির জন্য বিশ্ববাজার থেকে সস্তায় তেলও সংগ্রহ করেন।

সুদানে পাঁচ বছরের অবস্থানকালে স্থানীয় আলিম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। এর মধ্যে একবার তাঁর ওপর হত্যা-আক্রমণ চালানো হয়। সুদানে অবস্থানকালে তিনি আফগানিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়া, ইয়ামেনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জিহাদি সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা করতে থাকেন।

তিনি সুদানে আল কায়দার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। আমেরিকা সুদানের রাষ্ট্রপতি উমর আল বাশির ও দার্শনিক গুরু হাসান আত তুরাবিকে আল কায়দার কার্যক্রম বন্ধের জন্য চাপ দিতে থাকে। আল কায়দার জন্য সুদানের ভূখণ্ড ব্যবহার বন্ধ না করলে কঠিন পরিণতি ভোগ করার হুমকি দেয়। ইতিমধ্যে সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে, মার্কিন সৈন্যরা আল কায়দাকে সুদানছাড়া করেই ক্ষান্ত হবে; কিন্তু তত দিনে বিন লাদেনের নেতৃত্বে সোমালিয়ায় আল কায়দা শক্তিশালী অবস্থান অর্জন করেছিল। তাঁরা সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্যদের বহনকারী একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। পাইলট প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাকে

ধরে এনে সোমলিয়ার রাস্তায় টানাহ্যাঁচড়া করা হয়। মার্কিন টিভি-চ্যানেল সিএনএন কয়েকদিন পর্যন্ত এ দৃশ্য সম্প্রচার করে। এতে মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের মধ্যে সোমালিয়ার আল কায়দা দমনে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা তাদের সেনাদের ডেকে পাঠায়। অল্পসময়ের ব্যবধানে মার্কিন সেনাদের সোমালিয়া থেকে ফিরিয়ে নেওয়ায় বিন লাদেন বলেন, 'মার্কিনরা কাগুজে বাঘ, আমি তাদের অনেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভেবেছিলাম।'

বিন লাদেনকে সুদান থেকে বহিষ্কার করার মার্কিন চাপের মুখে সুদানি নেতৃবৃন্দ তেমন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তবে সেখানে অবস্থানকালে তিনি সুদান ও সোমালিয়ায় আল কায়দার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। এ কারণেই সোমালিয়া আজ মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তখন ডাক্তার আইমান আল জাওয়াহিরি, আবু হামজা আল মুহাজির, খালিদ শেখ মুহাম্মাদ, আবু আইয়ুব আল ইরাকি ও আবু মুসআব আজ জারকাবির মতো নেতৃবৃন্দ একে ওপরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সুদানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে মার্কিনরা নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠায়। তারা জানিয়ে দেয়, যত দিন বিন লাদেনকে সুদান থেকে বহিষ্কার করা না হচ্ছে, তত দিন তারা সুদানে নিজেদের রাষ্ট্রদূত পাঠাবে না। শেষপর্যন্ত মার্কিন চাপের মুখে সুদান সরকার বিন লাদেনকে সুদান ত্যাগের অনুরোধ জানায়।

আফগানিস্তান

সুদানকে আল-বিদা বলার সময় চলে আসে বিন লাদেনের। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আফগানিস্তান সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে ছিল তখন তালেবানদের উত্থানের সূচনাকাল। লৌহমানব মোল্লা উমরের হাতে আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তখনই পাহাড়ি মরুর এ বীরযোদ্ধা মিলিত হন ইস্পাতকঠিন মনোভাবের অধিকারী মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের সঙ্গে। এভাবেই বিন লাদেনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। বিশ্বজুড়ে তাওহিদের ডঙ্কা বাজানো মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিতে আল্লাহ মোল্লা মুহাম্মাদ উমরকে নির্বাচিত করেছিলেন, যাঁর অনুসারী মুজাহিদদের হাতে ছিল তথাকথিত বিশ্ব-পরাশক্তির লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের পয়গাম। বিন লাদেন পাকিস্তান, সৌদিআরব ও সুদান থেকে প্রায় রিক্তহস্তে ফিরলেও শেষপর্যন্ত এই পাহাড়ি দরবেশের মাধ্যমে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়।

মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের হাতে বায়আত

প্রথম দিকে বিন লাদেন মৌলভি ইউনুসের কর্তৃত্বাধীন আফগানিস্তানের পূর্ব-জালালাবাদ অঞ্চলে অবস্থান করেন। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাঁকে তালেবানদের মেহমান হিশেবে ঘোষণা করেন। তিনি তালেবানদের সরকার প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সহযোগিতা করেন। আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে মোল্লা মুহাম্মাদ উমর আমিরুল মুমিনিন হিশেবে স্বীকৃত হন। বিন লাদেন তখন আমিরুল মুমিনিনের হাতে বায়আত হন এবং তাঁকে একটি বোমা-অভেদ্য ঘর উপহার দেন।

আমেরিকা অনেকবার বিন লাদেনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে; কিন্তু বরাবরই তারা ব্যর্থ হয়। ১৯৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন কমান্ডো ও এফবিআইয়ের সদস্যরা আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে একাধিকবার তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালায়। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের অপারেশন চালানো হয়। পাকিস্তান ও আমেরিকা এ অপারেশনের কথা গোপন রাখে। ১৭ জন মার্কিন কমান্ডো এ অপারেশনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এফবিআইয়ের সাতজন কর্মকর্তা অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট পদ্ধতির সাহায্যে এ অপারেশন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করছিল। এবারও বিন লাদেনের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মার্কিন কমান্ডোদের ভয়াবহ সংঘাত হয়। শেষপর্যন্ত মার্কিনরা ব্যর্থ হয় এবং ১২জন মার্কিন কমান্ডো নিহত হয়।

আফগানিস্তানের ইসলামি বাতাবরণ থেকে বিন লাদেন নতুনভাবে আল কায়দাকে বিন্যস্ত করা ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকেন। জালালাবাদের নিকটবর্তী তোরাবোরা পাহাড়ি অঞ্চল থেকে তাঁর অধিকাংশ সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বিন লাদেনকে তাদের হাতে প্রত্যার্পণের জন্য তালেবানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তালেবান সরকার তাঁদের মেহমানকে মার্কিনদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তালেবানদের সঙ্গে আমেরিকার তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে কেনিয়া ও তানজানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা হয়। সেসব হামলায় বিপুল পরিমাণ মার্কিনী নিহত হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা আফগানিস্তান ও সুদানে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালায়। এ হামলায় তারা বিন লাদেনকে হত্যা করতে পেরেছে বলে দাবি করে। এসব হামলার কারণেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। আর মার্কিনদের বর্বরতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে আল কায়দা তাদের বিরোধীশক্তি হিশেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। এসব হামলার পর থেকে

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা আল কায়দামুখী হতে থাকে। তবে এসব হামলার পর তিনি চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন করেন। জনসমাগম এড়িয়ে চলতে শুরু করেন।

তালেবানদের সম্ভাব্য বিপদের মুখোমুখি হতে দেখে তিনি তখন আফগানিস্তান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কাছে এ প্রস্তাব তুলে ধরলে তিনি বলেন, 'প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আমাদের একজন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।'

এভাবেই মুজাহিদরা জিহাদের দায়িত্ব পালন, প্রস্তুতিগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের ধাপগুলো সহজেই পরিচালনার জন্য উপযোগী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এবার তাঁরা সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও প্রশান্তচিত্তে দিনযাপন করতে শুরু করেন। তবে তাঁরা বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার ও জায়নবাদী শক্তির কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে মোটেও অবহেলা করেননি। শুধু তা-ই নয়; তাদের কুপরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেওয়ার যাবতীয় পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে থাকেন। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিষ্ঠার কারণেই এসব কর্মযজ্ঞ সমাধা করা সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুজাহিদরা দলে দলে সেখানে আগমন করতে শুরু করেন।

ইসলামের এ সকল সিংহপুরুষের চেষ্টা ও কৌশলেই শেষপর্যন্ত শয়তানি শক্তির পতাকাবাহী আমেরিকা নিজের ভূখণ্ড ছেড়ে পরাশক্তিসমূহের কবরে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ তারা হন্যে হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে; কিন্তু মুজাহিদরা এখনো নিজেদের প্রতাপ নিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। আফগানিস্তান আবারও তাঁদের নেতৃত্ব বরণ করে নিতে অপেক্ষমাণ। বিন লাদেনের হাতেগড়া কাফেলা আজও জিহাদের পথে তাঁদের ওই লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে, যা তিনি তাঁদের জন্য নির্ধারিত করেছিলেন—'ইহুদিদের হাত থেকে ফিলিস্তিন ও মসজিদে আকসা উদ্ধার, হারামাইনের পবিত্র ভূমি ক্রুসেডারদের হানামুক্ত করা ও বিশ্বব্যাপী শয়তানি শক্তিকে পরাস্ত করে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ধর্মকে সমুন্নত করা।

বৈশ্বিক জিহাদে বিন লাদেনের অবদান

মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন যুগসন্ধিক্ষণে আল্লাহ তাঁর দীনের সাহায্যে এমন ব্যক্তিদের পাঠিয়েছিলেন, যাঁরা একাই ছিলেন একটি জাতির সমান। চতুর্দিক থেকে যখনই কুফরি শক্তির আগ্রাসন শুরু হয়, তখনই আল্লাহ ইসলামের পক্ষে এমন ব্যক্তির উত্থান ঘটিয়ে থাকেন, যাঁর নেতৃত্বে আল্লাহর বীরসেনানীরা কুফরি শক্তির মোকাবিলা করে, যিনি খোদাদ্রোহীদের পরাজিত করে মুসলিম উম্মাহকে এক আল্লাহর সাহায্যের

ওপর ভরসা করতে শেখান। কুফরির অন্ধকার দূর করে ইসলামের মশাল জ্বালিয়ে পুরো বিশ্বকে আলোকিত করে তুলেন।

বর্তমানে মহান আল্লাহ তাঁর দীনকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ী করতে এমন ভূখন্ডের এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছেন, যে ভূখণ্ডের ব্যাপারে রাসুল সা. বলেন, 'ঈমান ইয়ামেনবাসীর মধ্যে এবং হিকমাতও ইয়ামেনবাসীর মধ্যে।'[১০] শায়খ উসামা বিন লাদেনকে আল্লাহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদের মশাল জ্বালাতে নির্বাচিত করেছিলেন, যাঁর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ওপর চেপে বসা বস্তুবাদের লাগাম, লাঞ্ছনা ও দাসত্বের শৃঙ্খল ঢিলে করা হয়েছে—যিনি রুখে দিয়েছিলেন কাফিরশক্তির আগ্রাসন; ইহুদি-খ্রিষ্টান ও তাদের মিত্রশক্তির বিপুল সেনাবাহিনী যেন তাঁর অনুসারী ছোট দলটির সামনে অত্যন্ত অসহায় প্রতিপন্ন হয়।

এই ব্যক্তির একনিষ্ঠতা, শাহাদাতের তামান্না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, আল্লাহর রাহে খরচের স্পৃহা, সাহসিকতা, বীরত্ব ও দৃঢ়তার ফলে বিশ্বের আনাচে-কানাচের মুসলমানরা তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করে। এই এক ব্যক্তির কারণেই আজ বিশ্বের শয়তানের পূজারিরা ভীতসন্ত্রস্ত। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের কাফিরশক্তি তার ভয়ে তটস্থ। আল্লাহর মনোনীত এ বান্দার ইমানি শক্তির সামনে তাদের অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ব্যর্থ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন তাদের বিশাল সামরিকবাহিনী তাঁর অনুগত জিহাদি কাফেলার সামনে অসহায় প্রমাণিত। তাঁর হাতে সুবিন্যস্ত জিহাদি কাফেলা বিশ্বব্যাপী আল্লাহর দীনের সহযোগিতা করতে নিয়োজিত। তাঁর হাতে দীক্ষা নেওয়া জিহাদি কাফেলার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদে আকসা পুনরুদ্ধার ও ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক মার্কিনদের ধ্বংস নিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহে তাঁরা কাফিরদের ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তাঁর ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীদের ব্যাপারে বলেন,

> আমি সাহায্য করব রাসুল ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবন ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। [সুরা আল মুমিন : ৫১]

শায়খ উসামা বিন লাদেনের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তির ব্যাপারে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের মন্তব্য একেবারেই যথার্থ—'বিশ্বব্যাপী এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম, যারা ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহের দায়িত্ব পালন করেন। আর বিশ্বব্যাপী এর প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা আরও কম। আর এসব প্রাথমিক বিষয়সমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন ও ধনসম্পদকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিদের

---

১০ *সহিহ মুসলিম : হাদিস নং-৯৪।*

সংখ্যা এরচেয়েও কম। আর এই অল্পসংখ্যকদের রাস্তা ব্যতীত মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করা সম্ভব নয়, এটিই সফলতা ও সম্মান অর্জনের একমাত্র পথ।'

বিন লাদেন ও তাঁর চিন্তাদর্শন বিশ্বব্যাপী জিহাদি কর্মকাণ্ডের যেভাবে পুনর্জীবন দান করেছিল, পাঠকদের সামনে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

ইয়ামেন

ইয়ামেন একটি মুসলিম দেশ, যার সঙ্গে ভাষা ব্যতীত আফগানিস্তানের মিল পরিপূর্ণ। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশটিকে আফগানিস্তানের জমজ বলা যায়। বিন লাদেন ছিলেন ইয়ামেনি বংশোদ্ভূত। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুজাহিদরা ইয়ামেনে প্রশিক্ষণের জন্য কিছু ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এডেন থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে এডেন ও জানজিবারের মাঝামাঝি অবস্থিত 'জিবাল আল-মারাকিশায়' আল কায়দার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আল কায়দার এই প্রশিক্ষণঘাঁটির কারণে আমেরিকা এ অঞ্চলকে যথেষ্ট ভয় করে। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বিন লাদেন সৌদিআরবে ফিরে এসে দক্ষিণ ইয়ামেনে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামেনের 'জামাআতুল জিহাদ' নাম পরিবর্তন করে 'জাইশে আদন' নাম ধারণ করে। আফগানিস্তানের বাইরে ইসলামি জিহাদের জন্য ইয়ামেনকে নতুন কেন্দ্র হিশেবে গড়ে তুলতে বিন লাদেনের পরামর্শে এই নাম পরিবর্তন করা হয়। এই অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যেন তাঁদের হামলার মুখে এ অঞ্চল থেকে মার্কিন সৈন্যরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এ দলের প্রভাবশালী নেতা জায়নুল আবিদিন ইবনু আলি আবু বকর আল মিহজার ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কাছে সশস্ত্র ৫০ হাজার সদস্যের বাহিনী আছে। আর তখন ইয়ামেনের জাজিরায়ে সুকুত, এডেন ও হাদিদা শহরে মার্কিন ঘাঁটি বিদ্যমান।

দীর্ঘদিন দুভাগে বিভক্ত থাকার পর ইয়ামেন একীভূত হয়। প্রথমে কমিউনিস্ট ব্লকের মিত্র ইয়ামেনের দক্ষিণাঞ্চল, তাদেরকে উত্তর-ইয়ামেনের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হয়। ফলে ইয়ামেনজুড়ে শুরু হয় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। বিন লাদেন তখন সুদান থেকে কিছুদিনের জন্য ইয়ামেনে চলে যান। গৃহযুদ্ধ স্থায়ী রাখতে মার্কিনদের পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর ইয়ামেনের প্রতিরোধব্যবস্থা মজবুত করে তোলেন এবং দক্ষিণ ইয়ামেনের বিদ্রোহীবাহিনীকে পরাস্ত করেন। ফলে ইয়ামেনের উভয় ইয়ামেন পুনরায় একীভূত হয়।

২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর মুজাহিদরা মার্কিনদের কলিজায় কাঁপন ধরানো এক

ভয়াবহ হামলা চালায়। ইয়ামেনের এডেন বন্দরে মার্কিন রণতরী USS Cole-এর উপর আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ হামলায় ১৭ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়। হামলার পর বিন লাদেন ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য ইয়ামেন থেকে আগত সাহায্য ইনশাআল্লাহ এখন আর থামবে না।' ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর মুজাহিদরা ইয়ামেনের রাজধানী সানার মার্কিন দূতাবাসে আত্মঘাতী হামলা করে। এতে ১৬ মার্কিনী নিহত হয়।

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাপরিষদের চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র সিনেটর জোসেফ লিবারম্যান ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে ইয়ামেন সফর করেন। তিনি বলেন, 'ইয়ামেন এখন যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।' ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ইয়ামেনের ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থিদের দমনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। গর্ডন ব্রাউনের কার্যালয় থেকে প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন ছিল। তালেবান ও আল কায়দার ওপর জাতিসংঘের দেওয়া নিষেধাজ্ঞাসমূহের মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত কমিটির প্রধান রিচার্ড বার্ট বলেন, 'যদি আল কায়দার নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিত্ররা সহজেই ইয়ামেনে আশ্রয় গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে, তাহলে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমাদের অর্জন ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

ধীরে ধীরে ইয়ামেনের মুজাহিদরা সংগঠিত হতে থাকেন। আবু বাসির নাসির আল উহাইশির নেতৃত্ব এবং শায়খ আনওয়ার আল আওলাকির দিকনির্দেশনায় তাঁরা কাফিরদের আতঙ্কে পরিণত হয়ে ওঠেন। আবু বাসির নাসির আল উহাইশি তানজিম আল কায়িদার জাজিরাতুল আরব শাখার দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। তিনি আফগানিস্তানে বিন লাদেনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। ইয়ামেন ও গুয়ানতানামো বে কারাগারে কারাভোগও করেন। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ২৩ জন সহযোদ্ধাসহ ইয়ামেনের রাজধানী সানার কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ইয়ামেনের মুজাহিদরা প্রেসিডেন্ট-ভবনে হামলা করলে প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালিহ মারাত্মক আহত হন। এরপর শায়খ আবু বাসির নাসির আল উহাইশি সৌদিআরবে পালিয়ে যান। মুজাহিদরা ইয়ামেনের আবাইন প্রদেশ ও জানজিবার শহরসহ বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুন মুজাহিদরা ইয়ামেনের দক্ষিণাঞ্চলের আল মুকাল্লা শহরের কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে ৪০০-এর অধিক মুজাহিদকে কারামুক্ত করেন। এভাবেই ইয়ামেন জিহাদের উর্বর ভূমি হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইনশাআল্লাহ কাফিরশক্তি পরিপূর্ণভাবে নিপাত হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ইসলামের বীরসেনানীরা আত্মপ্রকাশ করতে থাকবেন।

সোমালিয়া

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে আরব ভূখণ্ডে মার্কিন সেনাবাহিনীর দখলদারত্বের পর বিন লাদেন সুদান-অভিমুখে হিজরত করেন। তাঁর সঙ্গে আরব মুজাহিদদের বড় একটি অংশও সুদানের মুহাজির হয়েছিলেন। সুদানেই সোমালিয়ার নেতা ফারাহ্ আইদিদের সঙ্গে বিন লাদেনের সম্পর্ক তৈরি হয়। সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহী শক্তির অপতৎপরতায় সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে মার্কিনরা সোমালিয়া প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায়। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে শান্তিরক্ষাবাহিনী অবতরণের করে আইদিদবিরোধীদের সাহায্য করা শুরু করে।

আমেরিকার পরিকল্পনা ছিল এ অস্থিরতা তৈরির মাধ্যমে লোহিতসাগর ও ভারত উপসাগরের মোহনা পর্যন্ত কর্তৃত্ব বহাল রাখা, যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনির আশেপাশে সমগ্র এলাকায় মার্কিনদের দখলদারত্ব নিশ্চিত হয়; কিন্তু সোমালিয়ায় সৈন্য প্রবেশ করানো ছিল তাদের এক অদূরদর্শী পরিকল্পনার ফল। বিন লাদেন ও ড. আইমান আল জাওয়াহিরি জেনারেল ফারাহ্ আইদিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ফলে সোমালিয়ার গেরিলা বাহিনী ও আরব মুজাহিদদের সমন্বিত বাহিনী মার্কিনদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামে।

এ হামলা এতটাই সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত ছিল যে, ১০ মাসের মধ্যেই আমেরিকা সোমালিয়া থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। জেনারেল ফারাহ্ আইদিদের বাহিনী ও আল কায়দার মুজাহিদরা মার্কিনদের বিরুদ্ধে এমন গেরিলাযুদ্ধের অবতারণা করেছিল, যার ফলে মার্কিনরা হতভম্ব হয়ে যায়। এ যুদ্ধে মার্কিনদের নজরদারি এড়াতে আল কায়দা কোনো ইলেকট্রিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেনি। এর পরিবর্তে তাঁরা পশুধ্বনির অনুকরণ ও নারিকেলের খোলের শব্দের মতো আফ্রিকার প্রাচীন যোগাযোগকৌশল ব্যবহার করতেন।

এ যুদ্ধে ৩০০ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। বহু মার্কিন সৈন্যের মৃতদেহ মোগাদিসুর রাস্তায় টানাহ্যাঁচড়া করা হয়। সিএনএন শেষপর্যন্ত এসব দৃশ্য সম্প্রচার করা থেকে বিরত থাকে।

এ দিকে মার্কিনদের লাশের সারি দীর্ঘ হতে থাকলে মার্কিন জনসাধারণ নিজেদের সেনাবাহিনী ফেরত নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে এবং এক পর্যায়ে লাঞ্ছিত হয়ে তারা সোমালিয়া ত্যাগ করে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে আল কায়দার এটি ছিল একটি সফল যুদ্ধ। আমেরিকা তত দিনে আল কায়দার শক্তির ধারণা পেয়ে যায়। সোমালিয়ায় আমেরিকার বিরুদ্ধে বিন

সোমালিয়ার বৃহৎ অঞ্চলের ওপর নিজেদের দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এটি শায়খ উসামা বিন লাদেনের পরিশ্রম ও স্বপ্নের ফল, যেখানে ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠার ফল মুসলমান প্রজন্ম উপভোগ করবে ইনশাআল্লাহ।

ইরাক

শায়খ আবু মুসআব জারকাবি ছিলেন বিন লাদেনের একান্ত আস্থাভাজন। আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড়ে তিনি শায়খের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আফগানিস্তান থেকে ইরাকে যান এবং সেখানের মুজাহিদদের সংঘবদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শায়খ আজ-জারকাবি 'জামাআতুত তাওহিদ ওয়াল জিহাদ' নামে ইরাকে জিহাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা শুরু করেন। ফলে ইরাকে ইসলামি জিহাদের এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটে। শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অব্যাহত আত্মঘাতী হামলা শায়খ জারকাবিকে 'আত্মঘাতী বাহিনীর নেতা' হিশেবে পরিচিত করে তোলে।

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ শায়খ জারকাবি 'তানজিম আল কায়িদাতুল জিহাদ ফি বিলাদির রাফিদিন' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। জানুয়ারি ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আল কায়দা ও অন্য কয়েকটি জিহাদি সংগঠনের সমন্বয়ে 'মজলিসে শুরা আল-মুজাহিদিন' গঠন করেন। এটি ইরাকে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিশেবে বিবেচিত হয়। এই 'মজলিসে শুরা আল মুজাহিদিন' পরবর্তী সময়ে 'দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়া' হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে।

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন শায়খ আবু মুসআব জারকাবি মার্কিন বিমান হামলায় শাহাদাতবরণ করেন। ইরাকে তাঁর তিন বছরের ইতিহাস তুলে ধরতে বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন। তাঁর শাহাদাতের পর আল কায়দা ইরাক শাখার নেতৃত্ব আমির আবু হামজা আল মুহাজিরের ওপর অর্পিত হয়। তাঁর মূল নাম ছিল আবদুল মুমিন আল বাগদাদি। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তানজিম আল কায়িদার শীর্ষনেতা শায়খ আবু হামজা আল মুহাজির ইরাকের সুন্নি অঞ্চলে 'দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

আলজেরিয়া

পৃথিবীর যেখানেই জিহাদি কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়, সেখানেই মুসলমানদের সাহায্য করা শায়খ উসামা বিন লাদেন নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। তিনি যথাসাধ্য তাদের

সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। আলজেরিয়ার জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করা ইসলামি দলগুলোর বিরুদ্ধে যখন সেখানের সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন কাফিরদের ভাষ্য ছিল, 'আলজেরিয়ার গণতন্ত্র রক্ষাকারী চৌকস সেনাবাহিনীর সংঘাত মূলত উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে। তিনি আলজেরিয়ার সেনাবাহিনীকে নির্বাচনে অস্ত্রের মাধ্যমে জিততে দেননি।'

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় নির্বাচনে আলজেরিয়ায় 'ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট' বিজয়ী হলে পশ্চিমা মিডিয়া 'আলজেরিয়ার গণতন্ত্র পরাজিত হয়েছে' বলে মন্তব্য করে। আমেরিকা তার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম অঞ্চলের সেনাবাহিনীকে প্রথমে নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নেয়। কোনোভাবে সেখানে ইসলামি বিধিবিধানের প্রচলন বা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক তাদের আজ্ঞাবহ বাহিনীকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নির্দেশ দেয়। আলজেরিয়াতেও ঠিক এমনটি ঘটেছিল। সেখানের সেনাবাহিনী ইসলামপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। অসংখ্য ইসলামি নেতাকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বাধ্য হয়ে 'ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট' সেখানে সশস্ত্র জিহাদের সূচনা করে।

আলজেরিয়ার মুজাহিদরা বিন লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাঁদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা 'জামাআতুত তাওহিদ আল-কিতাল' নামে সংঘবদ্ধ হয় এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আক্রমণ করতে শুরু করে। এমনকি সেখানের মুজাহিদরা আলজেরিয়ার পার্লামেন্ট ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর সফল হামলা চালায়। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই 'জামাআতুত তাওহিদ আল-কিতাল' আল কায়দায় একীভূত হলে আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ তাঁদের নেতা মনোনীত হন।

চেচনিয়া

চেচনিয়ার মুসলমানরা ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে রুশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছিলেন। আফগানিস্তানের রুশদের পরাজয়ের পর এই ভূখণ্ডে ইসলামি জিহাদের জাগরণ ঘটে। বিন লাদেনের হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত মুজাহিদরা এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও পিছিয়ে থাকেননি। তাঁরা আফগানিস্তানে রুশসৈন্যদের পরাজিত করার পর চেচনিয়ায় নিজেদের ভাইদের সাহায্য করতে কোহেকাফ অঞ্চলে পা রাখেন। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ খাত্তাব শহিদ সহযোদ্ধাদের নিয়ে আফগানিস্তান থেকে চেচনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

চেচনিয়াকে পৃথিবীর ভয়াবহতম যুদ্ধক্ষেত্র হিশেবে বিবেচনা করা হয়। আরব মুজাহিদদের আগমনের আগে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রুশরা চেচেন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। পরিবর্তীকালে আরব মুজাহিদরা রুশবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত অব্যাহত এ যুদ্ধে সরকারি গণমাধ্যম অনুযায়ী সাড়ে ৫ হাজার রুশ সৈন্য নিহত হয়। যদিও নিরপেক্ষ সূত্রমতে এ সংখ্যা ১৪ হাজারের বেশি।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট রুশরা আবার চেচেনদের উপর আক্রমণ করে। তখন মুজাহিদরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত চলমান এ যুদ্ধে ১১ হাজারের অধিক রুশ সৈন্য প্রাণত্যাগ করে।

পৃথিবীর কঠিনতম এ যুদ্ধক্ষেত্রে আরব মুজাহিদরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সফল হামলা পরিচালনা করেন। দুঃসাহসী এসব হামলার মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের অপারেশন শাতুই। ওই হামলায় ৫০ জন মুজাহিদের একটি বাহিনী দাগিস্তান থেকে রাশিয়াগামী একটি সেনাদলের উপর আক্রমণ করে। ৫০টি গাড়ির এক কনভয় নিয়ে রুশ সেনা-কাফেলা রাশিয়া ফিরে যাচ্ছিল। ওত পেতে থাকা মুজাহিদদের নাগালে আসতেই তারা আক্রমণের শিকার হয়। হালকা অস্ত্র নিয়েই মুজাহিদরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আক্রমণ এতটাই ভয়াবহ ছিল, রুশবাহিনী নিজেদের সামলানোরও সুযোগ পায়নি। ৫০টি গাড়িসমেত পুরো বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। দূরদূরান্ত পর্যন্ত তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। রুশবাহিনীর মুখপাত্রের মতে, এই হামলায় ২৬ জন সিনিয়র অফিসারসহ ২২৩ জন রুশ সৈন্য মারা যায়।

২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মার্চ শায়খ খাত্তাবের শাহাদাতের পর শায়খ আবুল ওয়ালিদি চেচনিয়ায় আরব মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন। তিনি ইতিপূর্বে চেচনিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তিনি শাহাদাতবরণ করলে আবু হাফস জর্দানি চেচনিয়ার আরব মুজাহিদদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাহাদাতবরণ করার পর আবু আনাস মুহান্নাদ আরব মুজাহিদদের নেতা হিশেবে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে আরব মুজাহিদরা চেচেন মুজাহিদদের সঙ্গে মিলে রুশদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন, এর মধ্যে মস্কো বিমানবন্দর-হামলা, মস্কো থিয়েটার-হামলা ও মস্কো-মেট্রোরেল-হামলা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন।

বসনিয়া

মধ্য ইউরোপে মুসলমানদের ওপর সার্বিয়ার খ্রিষ্টানদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। এ অঞ্চল যেন আফগানিস্তানে অবস্থানরত আরব মুজাহিদদের অপেক্ষা করছিল। তাঁরা ছিলেন ইসলামের সিংহশার্দূল, ভৌগোলিক সীমারেখা তাঁদের সামনে কোনো বাধা ছিল না। যেখানেই মুসলমানরা নির্যাতিত হয়ে আর্তনাদ করবে, সেখানেই তাঁরা মুক্তির স্লোগান শোনাতে ছুটে যাবে। শায়খ উসামা বিন লাদেনের কাছ থেকে পাওয়া ধর্মীয় চেতনা তাঁদের আফগানিস্তানে অবসর বসে থাকতে দিচ্ছিল না। অসংখ্য আরব মুজাহিদ তুরস্ক হয়ে পূর্ব ইউরোপের রাস্তা ধরে বসনিয়া প্রবেশ করেন। শায়খ আবুল ওয়ালিদ রাহ.-ও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে চেচনিয়ায় আরব মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেন।

তৎকালে বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর সার্বদের গণহত্যা চলছিল। আরব মুজাহিদরা বলকান অঞ্চলে পৌঁছাতেই যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলমানদের পক্ষে পালটে যেতে শুরু করে। পরিস্থিতির গতিবিধি অস্বাভাবিক পরিবর্তনে আমেরিকা ইউরোপিয়ান মুসলমানদের ডেটন চুক্তিতে সম্মত হতে চাপ প্রয়োগ করে। শেষপর্যন্ত মার্কিন চাপের মুখে বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলি ইজজত বেগোভিচ ডেটন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বসনিয়াতেও বিন লাদেন মার্কিনদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ফলে আমেরিকা ও ইউরোপ বলকান অঞ্চলে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

জম্মু ও কাশমির

জম্মু ও কাশমির অঞ্চলের মুসলমানরা একদিকে যেমন হিন্দুত্ববাদীদের নিপীড়নের শিকার ছিলেন, অন্যদিকে পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী মহল তাদের আত্মত্যাগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছিল। কাশমির-জিহাদকে পাকিস্তানি গোয়েন্দাসংস্থার হস্তক্ষেপমুক্ত করে শরিয়তের সঠিক নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত করা ছিল মুজাহিদগণের স্বপ্ন। শায়খ উসামা বিন লাদেনের চিন্তা-দর্শনেও এর পরিপূর্ণ প্রতিফলন ছিল।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ছদ্মবেশে কাশমির সফর করেন। কাশমিরের সুপুর, অনন্তনাগ ও সুফিয়া শহরে সফর করে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের বলেন 'আমরা আফগান সমস্যার সমাধান করে কাশমিরের প্রতি মনোযোগী হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু পাকিস্তান সরকার মার্কিন চাপের মুখে আরব মুজাহিদদের পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।[১১]

---

১১ *বেদার ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।*

ফিলিপাইন

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফিলিপাইনের মুসলমানরা স্থানীয় খ্রিষ্টানদের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানের নাকানিচুবানি খাওয়ানোর পর বিন লাদেন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন দেশে সফর করেন। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিলিপাইনের ম্যানিলায় যাত্রা করেন। একজন সৌদি ব্যবসায়ী হিশেবে তিনি ফিলিপাইন সফর করলেও নিজের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে দীর্ঘ স্বাধীনতার লড়াইয়ে লড়তে থাকা মুসলমানদের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি।

সিআইএর ভাষ্যমতে, এ যাত্রায় ফিলিপাইনের মুজাহিদদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়। আল কায়দার কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। ফিলিপাইনের 'মরো' মুসলমানরা বর্তমান বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিলেন। যত দিন পর্যন্ত ফিলিপাইনে মার্কিন সেনাদের অবস্থান ছিল, তত দিন পর্যন্ত মার্কিনরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইন সেনাবাহিনীকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। মার্কিনবাহিনী ফিলিপাইন থেকে ফিরে যেতেই মুজাহিদদের হিম্মত বেড়ে যায়। তাঁরা প্রকাশ্যে ফিলিপাইনের খ্রিষ্টান সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হামলা শুরু করে দেন।

সিরিয়ান বংশোদ্ভূত মুজাহিদ শায়খ উমর বাকরি মুহাম্মাদ ছিলেন বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। তাঁর ভাষ্যমতে, বিন লাদেন আলবেনিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, নাইজেরিয়া ও আলজেরিয়ান মুজাহিদদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করেন। 'আমরা ব্রিটেন ও আমেরিকার মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য উসামা বিন লাদেনের ক্যাম্পে প্রেরণ করি। এরা একদিন বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত হবে। এই মুহাম্মাদি বাহিনী সকল ইসলামি ভূখণ্ডে জবরদখলকারী হানাদারদের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা সমুন্নত করবে।'—তাঁর এ বক্তব্য পশ্চিমা মিডিয়া ও মার্কিনদের আতঙ্কিত করে দিয়েছিল।

ইরাকি শিশুদের ওপর অবরোধ চাপিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে কাফিরশক্তির বিরুদ্ধে বিন লাদেনের চোখ রাঙানোয় ক্রুসেডারদের চোখে ইরাকের প্রতিটি শিশু যেন আজ অপরাধী। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কুর্দিদের ভূখণ্ডকে চারটি দেশে বিভক্ত করে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন শায়খ উসামা বিন লাদেন। সুদানের অর্থনীতি ধ্বংসে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর করতে তিনি সেখানে পৌঁছান। মার্কিন ষড়যন্ত্রে ইয়ামেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখানে যান।

শায়খ উমর বাকরি মুহাম্মাদ বিন লাদেনের এই বাহিনীকেই মুহাম্মাদি বাহিনী বলে

ব্যক্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে এই বাহিনী গঠনের কৃতিত্ব শায়খ উসামা বিন লাদেনের ললাটেই শোভা পায়। মুসলিম উম্মাহর ওপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার্থে এমন এক দুঃসাহসী বাহিনী রেখে গেছেন, যাঁরা পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে কাফিরদের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত, তাদের সকল ষড়যন্ত্র সমূলে নস্যাৎ করে দিতে তৎপর। আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের পরিকল্পনাগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথের এসব মুজাহিদের হাতেই থাকবে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব। আর এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অমর কীর্তিতে শোভা পাবে শায়খ উসামা বিন লাদেনের নাম।

তিনি এমন একটি চরিত্র, যা ইসলামপ্রিয় প্রতিটি মানুষের মনে সদা জীবিত থাকবে। যাঁর দর্শন ও কর্মপদ্ধতি প্রজন্মান্তরের মুসলমানদের পথপ্রদর্শন করবে। তাঁর ধর্মীয় একনিষ্ঠতা মুসলমান যুবকদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিজয়ের সুসংবাদগুলো যখন পূর্ণতা পাবে, তখন মুসলমানের আত্মা তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধাবনত হবে। সম্মান জানিয়ে অস্ফুটস্বরে তাদের কণ্ঠে বের হবে, ‘সালাম, হে ইসলামের মহান সিপাহসালার তোমায় সালাম। তুমি আমাদের ইহ ও পরকালের সম্মানের সন্ধান দিয়েছ।’ আল্লাহ তাঁর ওপর অশেষ রহমত্ত অবতীর্ণ করুন।

চীনের শিনজিয়াং প্রদেশ

চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর অঞ্চলের মুজাহিদরা বিভিন্ন সময় শায়খ উসামা বিন লাদেনের সংস্পর্শে থাকা কমান্ডারদের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চীনে জিহাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে আল কায়দার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে চীন সরকার তাঁদের ওপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে। তাঁদের ওপর চীনা ভূখণ্ডে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে তৎপরতার অভিযোগ তোলা হয়। চীনা বাহিনীর নির্যাতনে দুই শতাধিক উইঘুর মুসলমান শাহাদতবরণ করেন।

এসব অঞ্চল ব্যতীত আরও বিভিন্ন দেশে বিন লাদেনের জিহাদি আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিউনিসিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন, কেনিয়া, মরক্কো ও ইউরোপ-আমেরিকা এর মধ্যে অন্যতম, যেন বিশ্বের সব জায়গা থেকে ইমাম মাহদির বাহিনীর অগ্রগামী দল কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

মোল্লা উমরের হাতে বায়আতের আবশ্যকতা

ইসলামের সিংহ শায়খ উসামা ছিলেন ইসলামি খিলাফতব্যবস্থার পুনর্জন্মদানের

একজন নকিব। পৃথিবীপৃষ্ঠে ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হিশেবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও কুফরি শক্তি বিশেষত আমেরিকার ধ্বংসসাধন ছিল তাঁর জীবনের মৌলিক লক্ষ্যসমূহের অন্যতম। আফগানিস্তানের প্রথম জিহাদের পর সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সৌদিআরবে গমন করেন। ইতিমধ্যে সুদানে শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করতে হিজাজভূমি ছেড়ে সুদানে হিজরত করেন; কিন্তু সেখানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হলে পুনরায় আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। আফগানিস্তানে তখন সবেমাত্র তালেবানদের উত্থান হচ্ছিল। আল্লাহ অচিরেই তাঁদের আফগানিস্তানের একটি বৃহৎ অঞ্চল দখলে নেওয়ার সুযোগ দেন। কর্তৃত্ব বহাল হওয়ার পর তাঁরা নিজেদের অঞ্চলে ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করেন। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

তালেবান আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ উমরকে 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি দেওয়া হলে অসংখ্য আলিম ও মুজাহিদ ছাড়াও সাধারণ মানুষও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করে। বিন লাদেনের জন্য এটি ছিল তাঁর বহুদিনের আরাধ্য স্বপ্ন। তিনি নিজে মোল্লা উমরের হাতে বায়আত হয়েই ক্ষান্ত হননি; তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সার্বিক উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হন। বিন লাদেনের মতো মহান ব্যক্তির আমিরুল মুমিনিনের হাতে বায়আত হওয়া এবং তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করা একদিকে যেমন আমিরুল মুমিনিনের মর্যাদার পরিচায়ক ছিল, অন্যদিকে এটি ছিল বিন লাদেনের পক্ষ থেকে ইসলামের নীতিমালার সামনে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার প্রমাণ।

এখানে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের হাতে বায়আতের ফরজিয়াত-সংক্রান্ত তাঁর একটি বক্তব্য তুলে ধরছি, যা ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৯-১০-১১ এপ্রিল পেশোয়ারে আয়েজিত 'খিদমাতে দারুল উলুম দেওবন্দ' কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের নামে লিখিত পয়গাম আকারে পাঠানো হয়েছিল। এতে তিনি মূলত মুসলিম উম্মাহ, বিশেষত আলিমদের শরিয়তের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁদের আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে একাত্মতা পোষণ করার আহ্বান করেন। প্রায় ১১ বছর আগের তাঁর এই পয়গাম আজও তখনকার মতোই যথার্থতা বহন করে। বক্তব্যটি পড়ুন, শরিয়তের পক্ষ থেকে আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হোন। এ দায়িত্বের বাস্তবায়নে হকপন্থিদের সঙ্গ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করুন। আল্লাহ আমাদের সহযোগিতা করবেন।

প্রশংসা করছি আল্লাহর, যিনি বলেছেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো। ... আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২-১০৩]

পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক রাসুল সা.-এর ওপর, যিনি বলেন, 'আমি কি তোমাদের সালাত, সাওম ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজের ব্যাপারে অবহিত করব না? সাহাবিগণ বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। নিঃসন্দেহে মতবিরোধ দীনকে মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, তা মাথা মুড়িয়ে দেয়; বরং তা দীনকে মুণ্ডন করে দেয় তথা বিনাশ করে দেয়।'[১২]

আজ আপনারা এখানে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামের প্রতিনিধি হিশেবে একত্র হয়েছেন। জাতিসত্তা, বর্ণ, সীমান্ত বা ভাষার পার্থক্য আপনাদের সামনে বিশেষ মর্যাদা রাখে না। হকপন্থি হিশেবে হকের অনুসারীদের সাহায্য করে ইসলামের বিধান পালনার্থে আপনারা আজ একত্র হয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনাদের এই সম্মিলন কাফিরবিশ্বকে মর্মাহত করছে। তারা এ ধরনের সমাবেশ রুখে দিতে বহু ধরনের চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করে।

সম্মানিত সুধী, এই পয়গাম আমি এমন এক সময়ে লিখছি, যখন আমি এ কথা মনে করে গর্ববোধ করতে পারি, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আজ এমন ব্যক্তির অভাব নেই, যারা ভয়ানক নির্যাতন-নিপীড়নের যুগেও পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কাফিরবিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞ রুখে দিতে সদা তৎপর।

সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের কাঁধে উম্মাহর যে দায়িত্ব অর্পিত তা ভুলে যাবেন না। নিঃসন্দেহে আপনারা নবিদের উত্তরাধিকারী, উম্মাহর সিপাহসালার। আপনাদের ফাতওয়া মানুষের মধ্যে জিহাদের চেতনা জাগ্রত করে, বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। অন্যায়-অবিচারের এই যুগে যখন পবিত্র ভূমিতে কাফির হানাদারদের দখলদারত্ব চলছে, পাপাচারকে বৈধ মনে করা হচ্ছে, এমন এক সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের পাঠানো নিঃসন্দেহে এ এক বড় পরীক্ষা। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদের জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদের ইলম কতটুকু কাজে পরিণত করেছেন?

সম্মানিত সুধী, আমার এই লেখাটি এমন এক সময়ে লিখেছি, উম্মাহর প্রতিটি অঙ্গ যখন কাফিরদের আক্রমণের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। এমন এক সময়

---

[১২] সুনানু তিরমিজি : ২৫০৯।

আমি এই পয়গাম লিখেছি, যখন জাতিসংঘ ও তাদের বৈশ্বিক নীতি অনুযায়ী মুসলিম গণহত্যার বৈধতা দেওয়া হয়, দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও ছাড় দেওয়া হয় না। প্রকাশ্যে ইসলামি সংস্কৃতির অপমান করা হয়। যে নীতির মাধ্যমে হিংস্র কাফিররা কোটি কোটি মুসলমান হত্যা করছে, তাদের ওপর অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, আজকাল কাফিরবিশ্ব মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে নিজেদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আর জাতিসংঘ এসব হিংস্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমাবিশ্বের মানবতাবাদের স্লোগান দিতে লজ্জা করে না? রাসুল সা. বলেন, 'এক নারীকে এ জন্য জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হয় যে, সে একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল। সে যেমন বিড়ালটিকে খেতে দিত না, তেমনি তাকে কিছু খেয়ে বাঁচবে, সে সুযোগও দেয়নি। ফলে বিড়ালটি মরে যায়।[১৩] লক্ষ্য করুন, রাসুল সা.-এর পবিত্র বাণীতে একটি বিড়ালকে বেঁধে রাখার কঠিন শাস্তির কথা কেমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ, তাদের কীভাবে মানবতাবাদী ভাবছেন, যাদের অবরোধের কারণে আজ মুসলমানদের অসংখ্য নিষ্পাপ শিশু মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে।

হে মহান প্রভু, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ! আমি এমন ব্যক্তিদের এমন জঘন্য কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করছি। নিষ্পেষিত মাজলুম মুসলমানদের যথাযথ সহযোগিতা করতে না পারায় আপনার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সম্মানিত আলিম ও মুসলিমবিশ্বের জ্ঞানী সম্প্রদায়, ক্ষত যতই গভীর হোক, বিপদ যতই কঠিন হোক, আমরা সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করি; তিনি অসীম দয়ালু। ইনশাআল্লাহ কষ্ট দূরীভূত হবে। আল্লাহ তাঁর মনোনীত দীনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসুলের মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীনের ওপর অটল থাকবে। তাঁদের যারা অপমান করতে চাইবে অথবা বিরোধিতা করবে, তারা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থার ওপর থাকবে।[১৪]

আপনারা অবগত আছেন, আল্লাহ এই উম্মাহর ওপর অনুগ্রহ করে তাঁদেরকে

---

১৩ *সহিহ বুখারি* : ৩৪৮২।

১৪ *সহিহ বুখারি* : ৩৬৪১।

এমন একটি ইসলামি রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন, যা আল্লাহর শরিয়তের বাস্তবায়ন ও একত্ববাদের পতাকা উড্ডীন করতে সদা তৎপর। তাঁর পক্ষ থেকে এই অমূল্য উপহার হচ্ছে মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। অতএব, মানুষকে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতি আন্তরিক হতে উদ্‌বুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনাদের ওপরই বর্তায়। আন্তর্জাতিক কাফিরসংঘের পক্ষ থেকে আসা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের মুখে জানমাল দিয়ে তাঁদের সাহায্য করা আপনাদের দায়িত্ব। আশা করছি, আপনারা কুফরি শক্তির মোকাবিলায় আপনাদের কনফারেন্সের এজেন্ডায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবেন।

- সম্ভাব্য সকল পন্থায় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে সহযোগিতা করতে মানুষের মধ্যে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। জিহাদের জন্য ইসলামি নওজোয়ানদের উদ্‌বুদ্ধ করা। কেননা, বর্তমান যুগে জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজে পরিণত হয়েছে।
- ধনাঢ্য ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে আর্থিক সহযোগিতা করতে উৎসাহ দেওয়া। নিজের সম্পদের জাকাতে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে অংশীদার বানানোর তাগিদ দেওয়া। ইমারাতে ইসলামিয়ার জনসাধারণের উপকারে অর্থনৈতিক বিনিয়োগে এগিয়ে আসা।
- ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্যের ব্যাপারে ফাতওয়া প্রকাশ করা। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের মাধ্যমে পুরো বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই, আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের হাতে বায়আত হওয়া ফরজ। এ ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দলিলের আলোকে আমিও তাঁর হাতে বায়আত হয়েছি। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই হুজাইফা রা. হতে বর্ণিত হাদিসখানা। রাসুল বলেন, 'মুসলিমদের দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে।'[১৫] রাসুল সা. আরও বলেন 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এবং তার ঘাড়ে ইমামের আনুগত্যের বায়আত নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।[১৬]

আপনারা জানেন, মানুষ আজ আপনাদের দিকনির্দেশনা নিতে জমায়েত হয়েছে, তারা আপনাদের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষমাণ। তাই প্রকাশ্যে এ কথার ঘোষণা

---

১৫ *সহিহ বুখারি* : ৩৬০৬।

১৬ *সহিহ মুসলিম* : ৪৬৮৭।

দেওয়া আপনাদের দায়িত্ব, আমাদের ইজ্জত ও সম্মান অর্জনের একমাত্র উপায় জিহাদ। প্রথম যুগের মুসলমানরা এর মাধ্যমেই মর্যাদাবান হয়েছিলেন, এ যুগের মুসলমানরাও জিহাদের মাধ্যমে সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছাবেন। এর মাধ্যমেই তাদের কষ্ট-ক্লেশ ও দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। দেরি না করে সমাধান করা দরকার।

আপনারা মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি তৈরি করুন যে, আমিরের নেতৃত্ব গ্রহণ ছাড়া সংঘবদ্ধ দল চলতে পারে না। আমিরের আনুগত্য না মানলে এসব জিহাদের মাধ্যমে সত্যিকার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। এ ব্যাপারে রাসুল সা. বলেন, 'আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামাআতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিলো, যতক্ষণ-না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত।'[১৭]

হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করুন, যিনি আপনাদের মুসলমান হিশেবে সম্মানিত করেছেন।

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনটি বস্তু এমন, যার ব্যাপারে মুমিন-আত্মা খিয়ানত করে না—শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদাত করা, মুসলমান শাসকের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং মুসলমানদের দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

এ হাদিস থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, ইসলাম তত দিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিজয়ী হবে না, যত দিন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে একটি দল তৈরি না হবে এবং তাঁদের নেতা নির্বাচিত না হবে। আর তত দিন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে নেতা তৈরি হবে না, যত দিন পর্যন্ত আমিরের আনুগত্য করা না হবে এবং তাঁর সকল নির্দেশনা মান্য করা না হবে।

উপর্যুক্ত দলিল ও বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের পর বলতে পারি, আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর শরিয়তের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী আমিরের মর্যাদা লাভ করেছেন, যিনি বর্তমান যুগে পৃথিবীপৃষ্ঠে শরিয়তে মুহাম্মাদি বাস্তবায়ন করবেন। মূর্তি ভেঙে ফেলা, নেশাদ্রব্যের চাষাবাদ বন্ধ করা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান করাসহ সকল নির্দেশনা ইসলামের

---

১৭ *সুনানু তিরমিজি* : ২৮৬৩।

ইতিহাসের নিরিখে তাঁর আমিরুল মুমিনিন পদমর্যাদার যথার্থতা প্রমাণ করে।

প্রিয় ভাইয়েরা মুসলিম উম্মাহ আজ আপনাদের নির্দেশনার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। তাঁদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় হকের ঘোষণা দেওয়া আপনাদের দায়িত্ব। নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে সত্য ঘোষণা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'সেই নবিগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' [সুরা আহজাব : ৩৯]

অন্যত্র বলেন, 'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না। [সুরা আলে ইমরান : ১৮৭]

সকলের প্রতি আমার সালাম। আল্লাহ হকের পথে আমাদের অবিচল রাখুন।

'আর আপনি তাদের বলুন, তোমরা আমল করতে থাকো, আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনগণ তোমাদের আমলের ধরন দেখবেন।' [সুরা তাওবা : ১০৫]

বিন লাদেনের বক্তব্যের চুম্বকাংশ

- আল্লাহর শপথ,যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তাঁরা মুহাম্মাদে আরাবি সা.-এর পতাকা সমুন্নত করে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন। তাঁরা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের ইহুদি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে আসা উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত, ইসলামের শত্রুদের হত্যা করা ইমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান।[১৮]

- আপনি যদি এ মতবাদ লালন করেন যে, অত্যাচারী হানাদারদের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর পরিবর্তে তাদের সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা বহাল থাকবে; আর আপনি ব্যক্তিগতজীবনে ইবাদাতচর্চা করবেন, তাহলে তারা আপনার সঙ্গে সংঘাতে জড়াবে না। কিন্তু পুরো পৃথিবীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা যদি আপনার লক্ষ্য হয়, তাহলে এর একমাত্র পথ হিজরত ও জিহাদ। কাফিরদের ভয়াবহ অত্যাচার-নিপীড়নের মুখে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ এ পথেই চলেছিলেন।

---

১৮ জাদিদ সালিবি জঙ্গেঁ।

- হায়! যদি আপনারা হিজরত ও জিহাদের সাওয়াবের অনুমান করতে পারতেন। আমরা আল্লাহর কাছেই সব ধরনের প্রতিদানের প্রত্যাশী। তিনি আমাদের ভরসার কেন্দ্রস্থল। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্যনির্বাহী।
- আপনি যদি বাতিলের নিচে থেকেই বাতিলের মোকাবিলার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে এটি আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আল্লাহর সম্মানিত ঘরকে যেকোনো মূল্যে কাফিরদের দখলদারত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে—সব সময় অন্তরে এই অনুভূতি লালন করা একাকিত্বের আঁধারে ডোবা একজন মুহাজিরের পক্ষেই সম্ভব, যে মক্কা-মদিনা থেকে কাফিরদের দখলদারত্ব উঠিয়ে একত্ববাদের পতাকা সমুন্নত হওয়া পর্যন্ত হিজরতের নিয়তে বেরিয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তেই যেন তার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে, 'হে মুমিন বান্দাগণ, আল্লাহর ঘরকে ভুলে যেয়ো না।'
- আমরা আর কী চাই? আমরা এরচেয়ে বেশি আর কীসের প্রত্যাশী? আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত আমাদের আর কী-ই-বা চাওয়ার আছে? আমরা কি জান্নাতের প্রত্যাশী নই? আমরা কি শুধুই ইহকালীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর অর্থসম্পদের প্রত্যাশী? এমন হলে সম্পদ আমাদের সমস্যার কারণ হবে।
- আল্লাহ সাক্ষী, আমরা সমাধানের পক্ষপাতী। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছি। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়েছি। সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করেছি। এটি আমাদের যোগ্যতা নয়, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। মক্কা-মদিনা ছেড়ে আমার অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না; বরং এই পবিত্র ভূমির বিরহ চরম কষ্টদায়ক; কিন্তু আল্লাহর জন্যই আমরা এসব কষ্ট বরদাশত করছি।
- বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে পৃথিবীর চাকচিক্যে প্রতারিত হয় না। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহকে পেয়ে যাওয়ার পর তার আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহর আনুগত্যহীন জীবন অর্থহীন। তাই আমরা আল্লাহর কাছে দীনের ওপর অবিচল থাকা ও খাতিমা বিল খায়েরের প্রার্থনা করছি।
- আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের শাসকরা আজ শত্রুদের এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। এরচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, আমাদের সংগঠনগুলোও এখন তাগুতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। তাদের কেউ আবার নিজেদের নেতার ব্যাপারে ভাবে—তিনি আমিরুল মুমিনিন, তার সম্মান করা উচিত। আবার কেউ নিজেদের দলকে, নুহ আ.-এর নৌকা বলে দাবি করে; অথচ এই নৌকার আরোহীদের পানিতে ডোবা ছাড়া উপায় নেই। ধর্মের নামে এরচেয়ে বড় মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা কী হতে পারে?

সেসব দলের একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন নিজেদের সংগঠনকে এ ধরনের ব্যক্তি ও ধারণা থেকে দূরে রাখেন।[১৯]

- আমরা ফিলিস্তিনি ভাইদের জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের শিশুদের রক্ত আমাদেরই সন্তানের রক্ত, তোমাদের রক্ত আমাদেরই রক্ত। তোমাদের রক্তের বদলা আমরা তাদের রক্তের মাধ্যমে নেব। তোমাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়নের বদলা আমরা তাদের ধ্বংসের মাধ্যমে অর্জন করব। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা কখনো তোমাদের একা ছেড়ে যাব না। হয়তো এ পথে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে; অথবা আমরা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব রা.-এর পরিণতি বরণ করব। আমরা তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, ইসলামকে বিজয়ী করার যোদ্ধারা যাত্রা শুরু করেছে, ইয়ামেন থেকে আসা সাহায্য-সহযোগিতা ইনশাল্লাহ আর বন্ধ হবে না।[২০]

- কাফিররা জেনে রেখো! আমরা স্বাধীন জাতি। আমরা এক মুহূর্তের জন্য দাসত্ব বরদাশত করিনি। এ জন্যই আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছি। আমরা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকে সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের এক আল্লাহর দাসে পরিণত করতে চাই। তাই যেভাবে তোমরা আমাদের নিরাপত্তা ও শান্তি ধ্বংস করবে, আমরাও সেভাবে তোমাদের নিরাপত্তা ও শান্তি ছিনিয়ে নেব। সে ডাকাত চরম বোকা যে মনে করে, মানুষের সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নিয়ে সে সুখনিদ্রায় মজে থাকবে।

- মার্কিনদের বোকা বানানো আমাদের জন্য বেশ সহজ। যেকোনো দুর্গম অঞ্চলে দুজন মুজাহিদকে 'আল কায়দা' লেখা একটি পতাকা ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে। মার্কিন জেনারেলরা এ সংবাদ পেলেই আতঙ্কে কেঁপে উঠবে। মার্কিন সৈন্যরা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যয় বৃদ্ধি করে সেই নির্বাচিত জায়গায় এসে উপনীত হবে। অতঃপর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাবে।

- মার্কিনরা, মনে রেখো! তোমাদের নিরাপত্তা জর্জ বুশের হাতে নয়, জন কেরির হাতেও নয়, এমনকি আল কায়দার কাছেও নয়; তোমাদের নিরাপত্তা তোমাদের নিজেদেরই হাতে। তোমাদের সকলের নিরাপত্তা ও শান্তির একমাত্র নিশ্চয়তা মুসলমানদের জীবন নিয়ে খেলাধুলা বন্ধ করা।

- আপনারা জানেন, মার্কিনরা আল্লাহর রাহের মুজাহিদদের গ্রেপ্তার বা শহিদ

---

১৯ *আয় আল্লাহ সিরিফ তেরে লিয়ে।*

২০ *জাদিদ সালিবি জঙ্গেঁ।*

করতে বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এর বিপরীতে আল কায়দাও ঘোষণা করেছে, যে ব্যক্তি ইরাকে মার্কিন হানাদারদের শাসক ব্রেমার বা তার সহকারী, ইরাকে অবস্থানরত মার্কিনদের সেনাপতি বা তার সহকারীকে হত্যা করতে পারবে তাকে ১০ হাজার গ্রাম স্বর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে। আমরা এর দায়িত্ব নিচ্ছি।

- হে ইসলামের বীরসেনানীরা, গেরিলাযুদ্ধ ও আত্মঘাতী হামলা অব্যাহত রাখুন। এসব হামলা সর্বোত্তম ইবাদত, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উত্তম মাধ্যম। এটি এমন এক অস্ত্র, যার মোকাবিলার সাধ্য আমাদের শত্রুদের নেই। আল্লাহর রহমতে এই অস্ত্র তাদের ব্যর্থ করে দিয়েছে, অপমানিত ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে, তারা সাহস হারিয়ে ফেলছে। তাই এই ধরনের হামলা অব্যাহত রাখুন, যেন তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

- ইউরোপ-আমেরিকাকে রুশ আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে ন্যাটো গঠন করা হয়েছে। যার অস্ত্র উন্নয়নখাতে ৪৫৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়; অথচ রাশিয়া একটি গুলিও চালায়নি। আমরা রুশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তত দিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব, যত দিন তাদের ধ্বংসসাধন না করব। আমরা তাদের পরাজিত করিনি; আল্লাহ তাদের পরাজিত করেছেন। এতে উপদেশ রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

- রিয়াদের রাজপরিবার, যারা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে আঁতাত করে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, অচিরেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করছি, এই রাজপরিবার শীঘ্রই তছনছ হয়ে যাবে ও ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে পতিত হবে।

- হকের বাণী নিয়ে যিনিই দাঁড়াবেন নিঃসন্দেহে তাঁর শত্রু তৈরি হবে। যে ব্যক্তি কাফির ও ধর্মদ্রোহীদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করবে না, সে রাসুল সা.-এর পথের অনুসারী হতে পারে না। এমনটি হতে পারে না, আপনি রাসুলের পথে চলবেন; অথচ আপনার সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা হবে না এমনটি হতেই পারে না। আল্লাহর শত্রুরা হকপন্থিদের ব্যাপারে তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন আপনি তাদের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেন ও তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেন।[২১]

- ক্রুসেডাররা আমাদের মা-বোন ও শিশুদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। আমেরিকা সর্বদা ক্রুসেডারদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। একদিকে মুসলমানদের ওপর অবরোধ

---

২১ *আয় আল্লাহ সিরিফ তেরে লিয়ে।*

আরোপ করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে রেখেছে, অন্যদিকে মুসলমানদের ওপর সার্বিয়ান কসাইদের গণহত্যাকে সমর্থন দিচ্ছে। যদি আপনার ধর্ম এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে আপনাকে বাধা না দেয়, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকারও আপনার নেই।[২২]

- সবর উত্তম হাতিয়ার; আর তাকওয়া উত্তম বাহন। শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমি পুরো বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে আশ্বাস দিতে চাই, আল্লাহ আমাদের যে নিয়ামাত দান করেছেন, ধৈর্য নিয়ে অবিচল থাকলে এর মাধ্যমে আমরা আগামী সাত বছর পর্যন্ত জিহাদি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারব। ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তী সাত বছর এবং এর পরবর্তী সাত বছর আল্লাহর সাহায্যের ভরসায় আমরা জিহাদ চালিয়ে যেতে পারব।[২৩]

- আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে আমরা অস্ত্র নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ এই সময়ে আমাদের একজনও আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি। এটি আমাদের মতবাদের সত্যতা, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতার প্রমাণ। ইনশাআল্লাহ আমরা পবিত্র-ভূমির স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল থাকব। ধৈর্য আমাদের হাতিয়ার, আমরা আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী। আমরা মসজিদে আকসার দাবি ছেড়ে দেবো না। ফিলিস্তিন আমাদের কাছে জীবনের চেয়েও প্রিয়। তোমরা যত দিন চাও এ যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে পারো। ইনশাআল্লাহ আমরা সমঝোতার পথে হাঁটবে না।

- আমি আবারও বলছি, তোমরা মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন বন্ধ করে সেনাদের ফিরিয়ে নাও। অর্থনৈতিক দুর্দশার এ যুগসন্ধিক্ষণে ইউরোপ-আমেরিকা অর্থনীতিতে পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা দীর্ঘদিন এ আঘাত সহ্য করতে পারবে না। অর্থনৈতিক দীনতায় মার্কিনদের জীবন আজ বিপদগ্রস্ত। কখনো কল্পনা করেছ, যেদিন তোমরা আফগানিস্তান ছেড়ে যাবে, তত দিনে তোমাদের এর জন্য কত মূল্য পরিশোধ করতে হবে? সৌভাগ্যবান তো তারা, যারা অন্যের পতন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই মুসলিম ভূখণ্ড থেকে নিজেদের সেনা ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ভুলের ওপর অবিচল না থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসাই উত্তম।

- পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওপর হামলার কথা এলেই স্মরণ করতে হবে ওই যুবকদের, যারা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্ববাসী তাঁদের নাম

---

২২ জন মিলারকে দেওয়া সাক্ষাৎকার : ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২৩ *গাজাহ মেঁ জারি মাজালিম কে খাতমে কি খাতির জিহাদ কি ফুকার।*

জানুক বা না জানুক, ইতিহাস একদিন প্রমাণ করবে, এই শহিদরা নিজেদের তাজা রক্তে জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করা দালালদের লাগানো কালো দাগ মুছে দিয়েছে। ব্যাপার শুধু এই নয় যে, তারা পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গুড়িয়ে দিয়েছে এবং এটি খুবই সাধারণ ঘটনা। বড় কথা হচ্ছে, এই নওজোয়ানরা বর্তমান যুগের মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদারদের অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, তাগুতের বাস্তব চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। মিসরের প্রাচীন ফিরআউনের হাতও শিশুদের রক্তে রঞ্জিত ছিল; কিন্তু আজকের ফিরআউনের অবাধ্যতা এরচেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে। এরা খুনি। এরা ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, লেবানন, ইরাক কাশমিরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের শিশুদের হত্যাকারী। আমাদের যুবকেরা ঘুমন্ত স্বজাতির রক্তে নতুন করে আগুন জ্বালিয়েছে। আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকিদার সঙ্গে নতুনভাবে পরিচয় করিয়েছে। ক্রুসেডারদের স্থানীয় চরদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা ও কাফিরদের সঙ্গে বিদ্বেষের আকিদা মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ধ্বংস করছে।[২৪]

- তোমরা আমাদের জায়গা-জমি দখল, আমাদের শিশুসন্তানদের হত্যা করতে মার্কিনদের সাহায্য করবে; আর নিজেরা নিরাপদে জীবনযাপন করবে? একবার ভেবে দেখো, এটা কীভাবে সম্ভব? যদি তোমরা মুসলমান নারীদের হিজাব খুলে নেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে পারো, তাহলে তোমাদের পুরুষদের গলা কেটে আমাদের অঞ্চল থেকে বের করে দেওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? তোমরা আমাদের হত্যা করবে, এর বদলে তোমরাও নিহত হবে। তোমরা অপহরণ করবে, প্রতিশোধ পেয়ে যাবে। তোমরা আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাবে, আমরা তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেব। এটাই ইনসাফের দাবি। যে প্রথম আক্রমণ করবে, সে-ই অপরাধী।
- বস্তুত ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ছিল আমাদের আত্মরক্ষামূলক হামলা। এই হামলা ছিল আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের নির্যাতন থেকে মুক্তি ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এই হামলা ছিল আমাদের পবিত্র ভূমিকে হানাদারমুক্ত করার লক্ষ্যে। আমাদের শিশু হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া যদি সন্ত্রাসবাদ হয়, তাহলে ইতিহাস সাক্ষী থাকুক আমরা সন্ত্রাসীই হব।
- আমরা বিশ্বাস করি, মার্কিনদের পরাজিত করা আল্লাহর জন্য অসম্ভব নয়।

---

২৪ *শুহাদায়ে গেয়ারাহ সেতেম্বর কা তাআরুফ।*

ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য এটি হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার চেয়েও সহজ।

- ইনশাআল্লাহ স্বাধীনতা, সচ্ছলতা ও শান্তি শীঘ্রই ধরা দেবে। যে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিকটবর্তী।
- আমরা বর্তমানে ইহুদিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। ইহুদি ও ক্রুসেডারদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে পরিচালিত হওয়া সরকারগুলোও এতে জড়িয়ে পড়ছে। এসবের নাটের গুরু ইসরাইল। এ জন্য আমরা ইহুদিদের হত্যা করতে দ্বিধা করি না, যারা আমাদের নবির পবিত্র ভূমিতে হানা দিয়েছে, আমাদের নারী-শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। এ যুদ্ধে যে-ই ইহুদিদের সঙ্গ দেবে, সে যেন নিজেকে হামলার মুখোমুখি দাঁড় করাবে।
- জাজিরাতুল আরব ও ফিলিস্তিনের দখলদারত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া এবং বিশ্বমুসলিমের ওপর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা এমন হামলা থেকে মুক্তি পাবে না। এটা খুবই সরল কথা। আমেরিকান একটি শিশুও এ বাস্তবতা বুঝবে; কিন্তু জর্জ বুশের কর্মকাণ্ডে মনে হয়, অস্ত্রের ভাষা ছাড়া সমাধান হবে না।
- যারা মার্কিনদের নিষ্পাপ ভাবছেন, আপনারা আসলে নিজেদের সন্তানদের নিহত হতে দেখেননি। ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের শিশুদের উপর আগ্রাসনের চিত্র দেখেননি। কোন যুক্তিতে ফিলিস্তিনে আমাদের সন্তান, মা ও বোনদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা হচ্ছে? তারা নিজেদের ঘরে অবস্থান করলেও কী কারণে তাদের উপর বিমান হামলা করা হচ্ছে? প্রতিদিন তাদের সন্তানদের জানাজা পড়তে হয়, অসংখ্য আহতদের আর্তচিৎকার চোখে অশ্রু এনে দেয়। তবু কিছু হতভাগা মার্কিনদের নিহত হওয়ায় শোক প্রকাশ করে; অথচ তারা আমাদের শিশুদের কথা স্মরণও করে না। আল্লাহ তো তাদেরও এমন পরিস্থিতির শিকার করতে পারেন, তারা কি ভয় পায় না?[২৫]
- ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই আমেরিকার পতন হবে। এর জন্য আমার প্রয়োজন নেই। উসামা বিন লাদেন জীবিত থাকুক বা মৃত্যুবরণ করুক, এতে কিছু আসে যায় না। উম্মাহর জাগরণ শুরু হয়েছে। আর এই জাগরণ নাইন ইলেভেনের হামলার প্রতিক্রিয়াসমূহের একটিমাত্র।

---

২৫ জাদিদ সালিবি জঙ্গে।

- নিঃসন্দেহে মার্কিনদের অধঃপতনের কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের অর্থব্যবস্থা তলিয়ে যাচ্ছে। এখনো নাইন ইলেভেনের চেয়ে ভয়াবহ হামলার প্রয়োজন। যুবকদের উচিত, মার্কিনদের অর্থনীতি দুর্বল করতে তাদের দেশেই লক্ষ্যবস্তু খুঁজে বের করা।

আমাল আল সাদাহ

নাইন ইলেভেনের প্রলয়ংকরী ঘটনার পর শায়খ উসামা বিন লাদেন তাঁর স্ত্রীদের তাদের পরিজনদের সঙ্গে বসবাস করতে দেশে ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, অনাগত দিনগুলো অত্যন্ত বিপদাপদ ও শঙ্কার মধ্যে কাটাতে হবে; কিন্তু তাঁর সকল স্ত্রী তাঁর সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ স্ত্রী আমাল আহমাদ আবদুল ফাত্তাহ আল সাদাহ বলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে থেকেই শাহাদাতের সুধা পান করতে চাই।'

আমাল আহমাদ আল সাদাহ ছিলেন ইয়ামেনি বংশোদ্ভূত। নাইন ইলেভেনের ঘটনার প্রায় এক বছর পূর্বে তাঁর সঙ্গে বিন লাদেনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। তাঁর পরিজনদের ভাষ্যমতে, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সঙ্গে বিন লাদেনের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে আফগানিস্তান গমন করেন এবং শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর পরিবার ইয়ামেনের রাজধানী সানআ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরের সুফিয়ানি বসতির 'আব'-এর অধিবাসী ছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের এ মেয়েটি অল্প বয়স থেকে তাঁর বান্ধবীদের বলতেন, 'আমি আমার নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রেখে যেতে চাই।'

তাঁর ভগ্নিপতি ড. মুহাম্মাদ গালিব আলবানি বিন লাদেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতায়ই এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। আরবের রীতিনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া এই বিয়ের যাবতীয় খরচ বিন লাদেন নিজে বহন করেছিলেন। আমাল আল সাদাহকে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। নাইন ইলেভেনের পর তাঁর গর্ভে এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ তাঁর এই নবজাতক শিশুকন্যার নাম রাসুল সা.-এর ফুফু সাফিয়ার নামে রাখেন। তিনি আশা করতেন, সাফিয়া যেমন আহজাবের যুদ্ধে একজন ইহুদিকে হত্যা করেছিল, এমনিভাবে তাঁর এই শিশুকন্যাও ভবিষ্যতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হত্যা করবে।

আমাল আল সাদাহ শায়খকে আবু হামজা নামে সম্বোধন করতেন। তিনি অ্যাবোটাবাদে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। গোলাগুলিতে আহত হলে তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায়

ইসলামাবাদের সিএমএইচে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসার পর ডাক্তারের প্রশ্নের মুখে তিনি বিন লাদেনের শাহাদাতের ঘটনা জানালে ডাক্তার এই ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক ইস্তফা দেন।

শায়খ উসামা বিন লাদেনের স্ত্রীর সাক্ষাৎকার

সৌদিআরবের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক *আল-মাজাল্লায়* ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে লাদেনের এক স্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল। পাঠকদের সামনে এর অনুবাদ তুলে ধরা হলো।

মাজাল্লাহ : বিন লাদেনের সঙ্গে আপনার জীবন কেমন ছিল?

স্ত্রী : আমাদের জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। কখনো কখনো তিনি গভীর রাতে ঘরে ফিরতেন এবং দীর্ঘক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময় চিন্তামগ্ন বিনিদ্র রাত কাটাতেন। তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করতেন। তিনি সারা দিনে দুই তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাতেন না। নিদ্রাস্বল্পতায় তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট বোঝা যেত।

মাজাল্লাহ : তাঁর অন্যান্য স্ত্রীও কি আপনার সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করতেন?

স্ত্রী : না, সবার জন্য আলাদা ঘর ছিল। তাঁর চারজন স্ত্রীর মধ্যে আমরা দুজন কান্দাহারে আলাদা আলাদা বাসায় বসবাস করতাম। একজন কাবুল ও চতুর্থজন তোরাবোরায় অবস্থান করতেন। আমার বাসায় তিনি শনিবারে আসতেন। আমরা চারজন প্রতি এক-দুই মাস পর পর একত্র হতাম। আমাদের এই পারিবারিক অনুষ্ঠান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উম্মে আওয়াদের ঘরে হতো। ঘর থেকে একাকী বের হতে নিষেধ করতেন। কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে কোনো বাচ্চাকে পাঠিয়ে দিতে বলতাম। আমি অধিকাংশ সময় ঘরেই কাটাতাম। শেষদিকে তিনি দুই-তিন সপ্তাহ পর পর আসতেন। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, তালেবান নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বৈঠকে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তিনি তাঁর কোনো যাত্রা সম্পর্কে কাউকে জানাতেন না; অত্যন্ত গোপনে সফর করতেন। অবশ্য তিনি তাঁর প্রতিটি সফরে আমাদের কোনো একজনকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

মাজাল্লাহ : আফগানিস্তানের আপনাদের বাসা কেমন ছিল আর তিনি কী খেতে পছন্দ করতেন?

স্ত্রী : আমাদের ঘরগুলো আফগানিস্তানের অন্যান্য সাধারণ ঘরের মতোই সাদাসিধে ছিল। খাওয়া-দাওয়াও ছিল বেশ সাধারণ। তিনি অধিকাংশ সময় রুটির সঙ্গে মধু ও

খেজুর খেতেন। খুব কম সময় মাংস রান্না করা হতো।

মাজাল্লাহ : আপনাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি কোনো নিরাপত্তারক্ষীর ব্যব
করেছিলেন কি না?

স্ত্রী : হ্যাঁ, মুজাহিদরা আমাদের দেহরক্ষী হিশেবে থাকতেন।

মাজাল্লাহ : তাঁর একান্ত আস্থাভাজন কারা ছিলেন?

স্ত্রী : তিনি অধিকাংশ সময় সুলায়মান আবু গায়েস, মোল্লা উমর ও আবু হাফস
কথা বলতেন। তিনি বলতেন, 'এঁরা অত্যন্ত সাহসী ও ধৈর্যশীল।' তিনি তাঁর যেকো
সফরে এঁদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাত

অপারেশন জিরোনিমো

ক্রুসেডযুদ্ধের অনেক আগ থেকেই ক্রুসেডার ও দাজ্জালের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শত্রুতা চলে আসছে। হকপন্থিরা সর্বদাই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাজ্জালি চক্রান্তের মোকাবিলা করে আসছেন। বিন লাদেনের ওপর হামলার এক বছর আগে থেকেই আমেরিকা অ্যাবোটাবাদে ডেরা তৈরি করেছিল। রেমন্ড ডেভিসের নেতৃত্বে সিআইএ এজেন্টরা সেখানে অবস্থান নিতে শুরু করে।

মার্কিনরা কীভাবে বিন লাদেন পর্যন্ত পৌঁছায়, তালেবানদের পক্ষ থেকে এর কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এই অপারেশনে আল কায়দার বেশ বড় মাপের কয়েকজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন। বহু ঘটনার সাক্ষী এসব যোদ্ধার শাহাদাতের সঙ্গে অনেক রহস্যই জনসম্মুখ থেকে হারিয়ে যায়। অবশ্য পশ্চিমা মিডিয়া থেকে এসব অপারেশন সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, এর আলোচনার মাধ্যমে পাঠককে তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রভাবিত করা নয়; ভবিষ্যতের জন্য সবক নিতে এসব অপারেশনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ মুজাহিদদের সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে হিফাজত করুন।

সেদিন শনিবার সন্ধ্যা থেকেই অ্যাবোটাবাদের আকাশে মেঘের ঘনঘটা ছিল। পাকিস্তানের বিনোদনকেন্দ্র অ্যাবোটাবাদের জন্য এমন আবহাওয়া নতুন ছিল না; কিন্তু মার্কিনরা এ আবহাওয়ার জন্য চরম অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। আগের রাত আকাশ পরিষ্কার থাকায় তাদের অপারেশন মুলতবি করতে হয়; কিন্তু ১০ বছর ধরে তারা যে সময়টির অপেক্ষা করছিল, এর জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে তাদের অনীহা ছিল না। তাদের টার্গেট ছিল বিন লাদেন—একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সাহসী লড়াকু মুজাহিদ।

মার্কিনদের ভাষ্যমতে, বিন লাদেনকে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে শেষবারের মতো তোরাবোরা পাহাড়ে দেখা যায়। এরপর থেকে তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মতো আবারও তাঁর সংবাদ পাওয়া যায়, যখন গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দি আল কায়দার কর্মকর্তা হাসান গুল মার্কিনদের জানায়, বিন লাদেন তাঁর বার্তাবাহক আবু আহমাদকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন। এই বার্তাবাহকই বিন লাদেন ও আল কায়দার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু ফারাজ আল লিবির মধ্যে সেতুবন্ধন হিশেবে কাজ করেন। তার মাধ্যমে মার্কিনরা কুয়েতি নাগরিক শায়খ আহমাদের আকৃতি সম্পর্কেও ধারণা পায়। তিনি কিছুটা মোটা ও ঘন দাড়িবিশিষ্ট কুয়েতি বংশোদ্ভূত ছিলেন।

বিন লাদেন টেলিফোন, ইন্টারনেট বা এ জাতীয় কোনো ইলেকট্রিক মাধ্যম ব্যবহার করেন না। সিআইএ এটা ভালো করেই জানত, নাহয় এত দিনে আমেরিকা তাঁর সন্ধান পেয়ে যেত। এ জন্য তাঁর বার্তাবাহকের তথ্য তাদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মনে রাখতে হবে, বিন লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর আস্থাভাজন সহযোদ্ধারা সিআইএকে কোনো তথ্য দেয়নি। অস্বাভাবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে কোনো একজনের থেকে তাঁর বার্তাবাহকের নাম সামনে চলে আসে। অতঃপর তারা এ ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর নিতে শুরু করে। বিভিন্নজনের ফোনকলে আঁড়িপাতা শুরু করে।

যেহেতু তিনি ইলেকট্রিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতেন না, তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমেই বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সিআইএ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল, বিন লাদেনের ব্যক্তিগত বার্তাবাহকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে; কিন্তু মার্কিনরা শায়খ আহমাদ সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না, তাই তাঁর ব্যাপারে অধিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা খালিদ শায়খ ও আবু ফারাজ আল লিবিকে টার্গেট করে। শেষপর্যন্ত আবু ফারাজ আল লিবি অমানবিক নির্যাতনের মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হন, শায়খ আহমাদের মাধ্যমেই তিনি বিন লাদেনের বার্তা পেয়েছিলেন। তাঁকে তত দিনে গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দি খালিদ শায়খের স্থলাভিষিক্ত করে অপারেশনাল কমান্ডার হিশেবে নিযুক্ত করা হয়েছে—এ তথ্য পেয়েই আমেরিকা আবিষ্কার করে, শায়খ আহমাদ বিন লাদেনের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ঘনিষ্ঠ সহচর।

সিআইএর কর্মকর্তা, তথ্য সরবরাহকারী ও স্থানীয় গোয়েন্দা এজেন্টরা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে হন্যে হয়ে শায়খ আহমাদের খোঁজ নিতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা জানতে পারে, তাদের কাঙ্ক্ষিত এই লোকটিই মূলত আবু আহমাদ আল কুয়েতি। পাশাপাশি তারা আরও জানতে পারে, তাঁর আরেক ভাইও বিন লাদেনের বার্তাবাহক ও একান্ত আস্থাভাজন। এবার তারা জোরেশোরে দুজনের খোঁজ করতে থাকে।

সিআইএ দেদারসে অর্থ ব্যয় করতে থাকে। স্থানীয় এজেন্টদের পেছনে বিপুল অর্থ খরচ করতে শুরু করে। টানা ছয় বছর অনুসন্ধানের পর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে শেষপর্যন্ত মার্কিনরা সফলতার মুখ দেখে। সিআইএর এজেন্টরা পেশোয়ারে সাদা সুজুকিতে সফররত শেখ আহমাদকে খুঁজে বের করে।

এবার মার্কিন এজেন্টরা শায়খ আহমাদের পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। কিছুদিন পর তিনি অ্যাবোটাবাদে আসেন। সেখানে তিনি একটি ভিলায় প্রবেশ করেন। ভিলার আকার ও পরিবেশ মার্কিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা বুঝতে পেরেছিল এখানে আল কায়দার কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতা অবস্থান করে। এই ঘরের কাছাকাছিই একসময় আবু ফারাজ আল লিবি অবস্থান করতেন।

তিন তলাবিশিষ্ট অ্যাবোটাবাদের সেই ভবনটি ১৮ ফুট উঁচু প্রাচীরঘেরা ছিল, যার ওপর কাঁটাতার দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। বাহির থেকে কোনো ধরনের তারের সংযোগ না থাকায় সহজেই অনুমান করা যায়, এখানে কোনো ধরনের টেলিফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য ডিস অ্যান্টিনা লাগানো ছিল। উঁচু দরজা ও স্বল্পসংখ্যক জানালাবিশিষ্ট ভবনটি স্থানীয় অন্যান্য বাসার তুলনায় অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। তৃতীয় তলার বারান্দায় সাত ফুট উঁচু দেয়াল তোলা ছিল। এই দেয়ালটিই বিশেষভাবে মার্কিনদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাদের জন্য অনুমান করা সহজ ছিল, মানুষের নজর এড়িয়ে দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট কারও চলাফেরার সুবিধার জন্যই এ দেয়ালটি নির্মাণ করা হয়েছে। তারা জানত বিন লাদেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির দীর্ঘদেহী ছিলেন। ওয়াজিরিস্তানের দুই ভাই এ ভবনের মালিক হওয়ায় এলাকায় ওয়াজিরিস্তান ভিলা নামে এর পরিচিতি ছিল।

সিআইএ এবার ড্রোনের সাহায্যে এই ভিলার ওপর নজরদারি করতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে হাজার হাজার ছবি সংগ্রহ করতে শুরু করে। ভবনে আসা-যাওয়া করা ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। তারা এ-ও জানতে পারে, ভবনের বাসিন্দারা নিজেদের পরিত্যক্ত ময়লা-আবর্জনা ভিলার ভেতরেই খালি জায়গায় পুড়িয়ে ফেলে, ময়লা ফেলার জন্য তারা বাসার বাইরে যায় না। এই তথ্যটি মার্কিনদের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিআইএর বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দেয়, এ ভবনের ভেতরেই অবস্থান করছেন তাদের একান্ত কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি—উসামা বিন লাদেন। ড্রোন ক্যামেরার তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, দুজন বার্তাবাহকের পরিবার ব্যতীত সে ভিলায় আরও একটি পরিবার বসবাস করে। ভবনটিতে কয়েকজন নারী ও শিশুর উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

মার্কিন নীতিনির্ধারকরা আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য সেই ভিলার আশপাশে গোয়েন্দা

তৎপরতা জোরদার করে। এটি ছিল ডিসেম্বর মাসের কথা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশাল অর্থের প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য খাতের বাজেট কমিয়ে সিআইএকে এই অপারেশন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। পাকিস্তানি এক এজেন্টকে অফিসার ইনচার্জ নিযুক্ত করে ওয়াজিরিস্তান ভিলা সংলগ্ন সিআইএর অস্থায়ী অফিস তৈরি করা হয়। লাহোর ও ইসলামাবাদ থেকে তাকে নিয়মিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো।

এবার তারা অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় সোর্সের মাধ্যমে ভবনের ভেতরের শব্দ সংগ্রহের সরঞ্জাম যুক্ত করতে সক্ষম হয়। এদিকে টেলি-ফটোলেন্সের মাধ্যমে ঘরের বাসিন্দাদের ওপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করা শুরু করে। চালকবিহীন বিমান ও ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়। মোটকথা, ছোট একটি বিল্ডিংটিকে ঘিরে সিআইএ তার সর্বস্ব উজাড় করে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

মার্কিন মুখপাত্রের ভাষ্যমতে, শেষপর্যন্ত ওয়াজিরিস্তান ভিলায় বিন লাদেনের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপন মাইক্রোফোনে বিন লাদেনের আওয়াজ ধরা পড়ে। সিআইএ তাৎক্ষণিক বিন লাদেনের পুরাতন বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর শনাক্ত করে। তাদের এজেন্টরা আশপাশের ভবন থেকে ভিলার ভেতরে তাঁর স্পষ্ট ছবি তুলতে সক্ষম হয়। তাৎক্ষণিক এসব তথ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এতক্ষণে মার্কিনদের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়—ওয়াজিরিস্তান ভিলাতেই বিন লাদেন অবস্থান করছেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর অ্যাবোটাবাদে সিআইএর অস্থায়ী কার্যালয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে এলে ফেব্রুয়ারি মাসেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অ্যাবোটাবাদে সিআইয়ের অস্থায়ী অফিসে কতজন কাজ করত, বরাবরই মার্কিন সরকার এ ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়। তারা জানায়, এ ব্যাপারগুলো অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কেননা, বিন লাদেন এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেই নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারতেন।

পরবর্তী সময়ে জানা যায়, বিন লাদেন বিগত পাঁচ বছর ধরে এই ভিলার তৃতীয় তলার একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। তিনি খুব কমই ঘরের বাইরে যেতেন। তাঁর ২৯ বছর বয়সি ইয়ামেনি স্ত্রী আমাল পাকিস্তানের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে এমনটিই জানান। পাকিস্তানে তাঁকে করা জিজ্ঞাসাবাদের বিস্তারিত বিবরণ পাকিস্তান সরকার মার্কিনদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মূলত পাকিস্তান সরকারকে না জানিয়ে মার্কিনদের স্পর্শকাতর এই অভিযান পরিচালনা করা পাকিস্তানকে চরমভাবে আহত করেছিল।

বিন লাদেন এখানেই অবস্থান করছেন, মার্কিনরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বে হোয়াইট হাউসে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ১৪ মার্চ আয়োজিত প্রথম বৈঠকে মার্কিন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। দুটি মার্কিন বোমাবাহী বিমানের মাধ্যমে ২ হাজার পাউন্ড ওজনের ডজনখানেক বোমা নিক্ষেপ করে পুরো ভবনটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়; কিন্তু এভাবে অভিযান চালানো হলে ভবনটিতে অবস্থানরত শিশু ও নারীরাও নিহত হবে, এ অজুহাতে বারাক ওবামা এতে সম্মতি দেননি। মূলত মার্কিন সরকার বিন লাদেনের মৃত্যুর পর তাঁর ডিএনএ পরীক্ষা করে মৃত্যু নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। অ্যাবোটাবাদের সেই ভবন পর্যন্ত গোপন সুড়ঙ্গ খননের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনার পরিকল্পনাও উপস্থাপন করা হয়; কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যমতে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উঁচু হওয়ায় এই পরিকল্পনাও বাদ দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত কমান্ডো হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল পুরো বিশ্ব যখন ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়ামের (বইতে এন্ড্রু দেওয়া আছে, কিন্তু তার বিয়ে হয়েছে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। নাম ও ঘটনার মিল নেই।) বিয়ে উদযাপনে ব্যস্ত, তখনই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মঞ্জুরি দেওয়া হয়।

এর আগেই পরিকল্পনা করা হয়, নির্দিষ্ট তারিখে আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটি থেকে দুটি ব্ল্যাক হক ও দুটি চিনুক হেলিকপ্টার প্রায় শতাধিক মার্কিন সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানের দিকে উড়ে যাবে। মার্কিন সরকারের দাবি অনুযায়ী এসব হেলিকপ্টার পাকিস্তানের তারবিলা গাজি বিমানঘাঁটিতেও অবস্থান করানো হয়, যা ব্যবহারের অনুমতি আমেরিকাকে দেওয়া হয়েছিল। শতাধিক মার্কিন সৈন্যের মধ্যে দুডজনের মতো কমান্ডো ছিল, যারা মূলত অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিল।

সিআইএর বাগরাম ঘাঁটিতে কার্ডবোর্ড ও অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে ওয়াজিরিস্তান ভিলার রেপ্লিকা তৈরি করে অভিযানে অংশগ্রহণ করা কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসব কমান্ডো মূলত আমেরিকান নৌবাহিনীর অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট নেভি সিলের সদস্য ছিল।

নেভি সিল মার্কিন নৌবাহিনীর অত্যন্ত গোপন একটি ইউনিট, যার সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু এটা জানা যায়, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের পর বিশেষ এই ইউনিট গঠন করা হয়। তেহরানের ইরানি বিপ্লবীদের হাতে বন্দি ৫২ জন মার্কিনীকে যখন কোনোভাবে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না, তখনই এই ইউনিটের গোড়াপত্তন করা

হয়। যারা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, প্রকাশ্যে যার দায় সাধারণত মার্কিন সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেদের কাঁধে নেয় না। এ জন্য এই ইউনিটের কমান্ডোদের 'কৃষ্ণযোদ্ধা' নামেও অভিহিত করা হয়। এ কমান্ডো ইউনিট মার্কিন নৌবাহিনীর অংশ হলেও জল-স্থল ও আকাশ—সব পথেই অভিযান পরিচালনায় সক্ষম। অত্যাধুনিক সব ধরনের অস্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি গেরিলাযুদ্ধের জন্য তাদের অত্যন্ত কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় তারা স্বাচ্ছন্দ্যে কথাবার্তা বলতে পারে। বিন লাদেন-হত্যার অভিযানের সঙ্গে জড়িত কমান্ডোরা সাবলীলভাবে পশতু ভাষায় কথা বলতে পারত। এ বাহিনীতে সাধারণত এমন যুবকদের ভর্তি করানো হতো, যারা প্রচণ্ড মনোবল ও শারীরিক শক্তির অধিকারী, যারা সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল শনিবার মার্কিনরা ওয়াজিরিস্তান ভিলার উপর হামলা করার কথা ছিল; কিন্তু সে রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকায় মার্কিনদের হেলিকপ্টার সহজেই পাকিস্তানিদের নজরে পড়ার আশঙ্কায় তা মুলতবি করা হয়; কিন্তু রবিবার রাতে আকাশে মেঘের ঘনঘটা থাকায় কালো হেলিকপ্টারগুলো খুব একটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। হেলিকপ্টারের আওয়াজ অত্যন্ত নিচু রাখতে অত্যাধুনিক স্টিলথ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল। পাশাপাশি পাকিস্তানি রাডারের আওতা থেকে বাঁচতে খুব নিচু হয়ে হেলিকপ্টারগুলো ওড়ানো হয়েছিল। আবার এসব হেলিকপ্টারে রাডার জ্যাম করে দেওয়ার প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়। মোদ্দাকথা, মার্কিনরা তাদের যাবতীয় উন্নত প্রযুক্তি ও টেকনিক ব্যবহার করে নিজেদের প্রধান শত্রুকে ধ্বংস করতে মাঠে নেমেছিল।

যে মোবাইল কল অ্যাবোটাবাদ পৌঁছায়

: আমি ভালো আছি, তোমরা কেমন আছ?

: গত কয়েকদিন যাবৎ আমার শরীর ভালো ছিল না, এখন মোটামুটি সুস্থ আছি। আমি আবারও পুরানো সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

: আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেশুনে চলবে।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝিতে কোনো এক বিকেলে মোবাইলের এই কথাবার্তা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ মনে হতে পারে। এ কথোপকথনটি ছিল বিন লাদেনের নির্ভরযোগ্য সহযোদ্ধা আরশাদ খানের সঙ্গে কুয়েতে অবস্থানরত তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের। সিআইএর এক এজেন্ট এসব কথাবার্তা রেকর্ড করেছিল। অত্যাধুনিক

প্রযুক্তি ও মোবাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে তারা জানতে পারে, আরশাদ খান তখন পেশোয়ারে একটি সাদা সুজুকিতে সফররত। এভাবেই দীর্ঘ আট বছরের অধীর অপেক্ষার পর মার্কিনরা বিন লাদেন পর্যন্ত পৌঁছার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়ে যায়। তারা বেশ কিছুদিন থেকেই কুয়েতে অবস্থানরত আরশাদ খানের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মোবাইলে নিয়মিত আঁড়ি পেতে চলছিল।

৪০ বছর বয়সি আরশাদ খান কুয়েতে পশতু পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি কুয়েতেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আরবি ও পশতু ভাষায় সাবলীলভাবে কথাবার্তা বলতে পারতেন। তাঁর পিতা রুশদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করা আরব ও আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করতেন, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। আর এভাবেই তাঁর সঙ্গে বিন লাদেনের সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সম্পর্ক থেকেই তাঁর ছেলে আরশাদ খান ধীরে ধীরে আল কায়দার নেতৃবৃন্দের আস্থাভাজনে পরিণত হন। আরবি ও পশতু জানা আরশাদ খান আল কায়দার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আরব ও আফগান মুজাহিদদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারায় ধীরে ধীরে তিনি বিন লাদেনের একান্ত আস্থাভাজনেও পরিণত হন।

নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর গুয়ানতানামো বে কারাগারে বন্দি আল কায়দার কোনো এক সদস্যের কাছ থেকে মার্কিনরা আরশাদ খানের ব্যাপারে জানতে পারে। আল কায়দা-সংশ্লিষ্টদের কাছে তিনি আবু আহমাদ আল কুয়েতি নামে পরিচিত ছিলেন। মার্কিনরা জানতে পেরেছিল, তিনি আল কায়দার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, এমনকি বিন লাদেনেরও বার্তাবাহক হিশেবে কাজ করেন। বিন লাদেন গোপন জায়গা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বার্তা পাঠাতে বাহকেদের সাহায্য নিয়ে থাকেন, এ কারণেই মার্কিনরা তাঁকে বেশ গুরুত্ব দিতে থাকে।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সিআইএর এজেন্ট যখন আরশাদ খানকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়, তখন থেকে তারা গোপনভাবে তাঁর ওপর নজরদারি করতে থাকে। এভাবেই মার্কিনরা অ্যাবোটাবাদের বিলাল টাউনে এসে পৌঁছায়। ভবনের অবস্থা যাচাই করে মার্কিন সৈন্যরা সচকিত হয়ে ওঠে। ভবনের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করতে সিআইএ সেখানে নিজেদের অস্থায়ী অফিস স্থাপন করে। ওয়াজিরিস্তান ভিলায় কথাবার্তা রেকর্ড করতে কোনোভাবে তারা গোপন ডিভাইস পাঠাতে সক্ষম হয়।

সিআইএ নির্বিঘ্নে নিজেদের গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বিন লাদেনের ডিএনএর

নমুনা সংগ্রহের জন্য পাকিস্তান স্বাস্থ্যবিভাগের কয়েকজন ডাক্তারকে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের এজেন্ট বানিয়ে নিয়েছিল। তারা একটা ভুয়া হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন কার্যক্রম হাতে নেয়, যার আওতায় সে এলাকার ঘরে ঘরে গিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুদের টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করে। যখন কোনো ব্যক্তির শরীরে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ প্রবেশ করানো হয়, তার মাথায় লেগে থাকা রক্তকণিকার মাধ্যমে সহজেই ডিএনএর নমুনা সংগ্রহ করা যায়। ডাক্তার শাকিল আফরিদি এ কার্যক্রমে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সে একজন নারীসদস্যকে সে ঘরে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়, যেখানে বিন লাদেন তাঁর শিশুসন্তানদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। ডাক্তার শাকিল আফরিদির কথামতে সে ওয়াজিরিস্তান ভিলার ভেতরে আঁড়িপাতার সরঞ্জাম লগিয়ে দেয়।

বিন লাদেনের সন্ধানে মার্কিনরা বিশেষ স্যাটেলাইটেরও ব্যবহার করেছিল। যে স্যাটেলাইটে তাঁর চেহারা শনাক্তকারী সফটওয়ার যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যা ভবনের আঙিনায় চলাফেরা করা বিন লাদেনের ছবি তুলতে সক্ষম হয়।

তবে আরশাদ খান যদি তাঁর পরিজনদের সঙ্গে কথাবার্তায় আরেকটু সর্তকতা অবলম্বন করতেন, তাহলে মার্কিনরা কোনোভাবেই বিন লাদেনের সন্ধান পেত না। আরশাদ খান ও তাঁর ভাই তারিকের পূর্বপুরুষ ওয়াজিরিস্তানের অধিবাসী ছিলেন, তাই এলাকায় এ ভবনটি ওয়াজিরিস্তান ভিলা নামে পরিচিত হয়। তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত সদালাপি মানুষ ছিলেন। নিয়মিত সালাত আদায় করতেন। এলাকার মানুষের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। তাঁদের বাচ্চারাও তেমন একটা বের হতো না। এ ভবনেই বিন লাদেন বসবাস করছিলেন। চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে বাঁচার অজুহাতে ভবনের পাচিল ১৮ ফুট উঁচু করে দেওয়া হয়েছিল।

সিআইএ যখন নিশ্চিত হয় বিন লাদেন এ ভবনেই বসবাস করছেন, তখন বোমা হামলা করে পুরো ভবন ধসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে; কিন্তু সেখানে শিশু ও নারীদের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে এ পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয় এবং শেষপর্যন্ত এ ভবনে কমান্ডো হামলা করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সূত্রমতে, অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। আমেরিকা তার সহযোদ্ধা পাকিস্তানকেও এ হামলা সম্পর্কে অবগত করেনি। এ অভিযান পরিচালনায় তিনটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরি—কার্ল ভিনসন, ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ও ইউএসএস রোনাল্ড রিগ্যান অংশগ্রহণ করে। এ থেকেই এ হামলার বিশাল ব্যয় ও গুরুত্বের ধারণা পাওয়া যায়। এ হামলায় কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতে মার্কিনরা কোনো কার্পণ্য করেনি।

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে সর্বপ্রথম RQ-170 ড্রোন ওয়াজিরিস্তান ভিলা পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য পাঠায়। অতঃপর আরবসাগরে অবস্থানরত দুটি বিমানবাহী জাহাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের বিমান ও যুদ্ধবিমান আকাশে পাখা মেলে।

RQ-170 ড্রোন আমেরিকার অত্যাধুনিক ড্রোন টেকনোলজি, যা শুধু গোয়েন্দাবৃত্তির কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি নিঃশব্দে রাডারকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি থেকে অত্যন্ত নিখুঁত ছবি তুলতে সক্ষম।

মার্কিনদের বিমানবহরে EA-63 ও EA-18g বিমানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দুটি বিমানই আধুনিক যুদ্ধে মার্কিনদের সফল হাতিয়ার হিশেবে বিবেচিত। EA-63 বিমানে Anti-radiation missile (অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইল), Harm missile (হার্ম মিসাইল) ও shrike missile যুক্ত করা হয়েছিল, ফলে একে সহজেই যুদ্ধবিমানে পরিণত করা যায়। আর EA-18g বিমানে communications receiver and jamming system কমিউনিকেশনস রিসিভার অ্যান্ড জ্যামিং সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে শত্রু-বিমানের পাইলটের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ছিল অত্যন্ত সহজ।

মার্কিনরা E-2 হক আইও উড়িয়েছিল। এটি ছিল কয়েকশ মাইল দূর থেকে শত্রুবিমান শনাক্তে সক্ষম। এর পাশাপাশি পাকিস্তানের তরফ থেকে বা সম্ভাব্য যেকোনো হামলা থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মার্কিনরা অত্যাধুনিক F/A-18E/F যুদ্ধবিমানও ব্যবহার করে, যা মূলত অন্যান্য বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া শত্রুবিমানের সিগন্যাল পর্যালোচনা ও তার ওপর নজরদারি করার প্রযুক্তি সংবলিত বিশেষ ধরনের বিমানও ব্যবহার করে। অভিযানে অংশগ্রহণ করা হেলিকপ্টারে তাৎক্ষণিক জ্বালানির প্রয়োজন মেটাতে KC-130 ট্যাংকার প্রস্তুত রাখা হয়। জালালাবাদে MV-22 বিমান বিন লাদেনের মরদেহ রণতরি কার্ল ভিনসনে পৌঁছানোর জন্য সব প্রস্তুতি সেরে রাখা হয়। ব্যাকআপ হিশেবে প্রস্তুত রাখা হয় চিনুক হেলিকপ্টার।

E-8 জয়েন্ট স্টারস বিমান থেকে তাদের কর্তাব্যক্তিরা পুরো হামলার দেখাশোনা ও পরিচালনা করছিলেন। মার্কিন এই বিমান ছিল আকাশে তাদের সামরিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যালয়। এই বিমানের মাধ্যমের শত্রুদের যেকোনো গতিবিধি স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

এ বিশাল ব্যবস্থাপনার পর তিনটি স্টিলথ ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সাহায্যে ২৪-২৫ জন নেভি সিল কমান্ডো ওয়াজিরিস্তান ভিলার বাসিন্দাদের উপর হামলা চালায়। হামলা চলাকালে ভেতর থেকে প্রতিরোধমূলক এক ফায়ারে একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়।

তখন আরশাদ খান সস্ত্রীক, তারিক খান এবং খালিদ বিন লাদেন শাহাদাতবরণ করেন।

সূত্রমতে, মার্কিনরা ব্যাকআপ হিশেবে আরও তিন-চারটি হেলিকপ্টার প্রস্তুত রেখেছিল। একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ধ্বংস হলে তৃতীয় আরেকটি, অন্য সূত্রমতে একটি চিনুক হেলিকপ্টার কমান্ডোদের ফিরতি যাত্রার জন্য পাঠানো হয়। যদি সেটি চিনুক হেলিকপ্টার হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার গতিবিধি নিঃশব্দ করতে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল।

ওয়াজিরিস্তান ভিলায় হামলা করা মার্কিন কমান্ডোরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধসরঞ্জামে সজ্জিত ছিল। সর্বাগ্রে অবস্থান করা কমান্ডোদের কাছে ইনফ্রারেড রশ্মি ব্যবহার করে অন্ধকারের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা এবং ধারণের ভিডিয়ো ক্যামেরা ছিল। বোমা-অভেদ্য বিশেষ পোশাক পরিহিত কমান্ডোরা সকলেই ছিল অত্যাধুনিক HK-416 রাইফেলধারী। এসব রাইফেল নির্ভুল লক্ষ্যভেদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। তাদের চোখে ছিল রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এমন বিশেষ চশমা।

মিডিয়ার ভাষ্যমতে, মার্কিন কমান্ডোদের সঙ্গে ভবনে লুকিয়ে থাকা লোকজন ও অস্ত্রের সন্ধানের জন্য একটি সামরিক কুকুরও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে প্রায় ১ হাজার গুন বেশি হয়ে থাকে। সেই কুকুরের মুখে লাখ টাকা ব্যয়ের টাইটানিয়ামের কৃত্রিম চোয়াল লাগানো ছিল। ফলে এটি যদি বুলেটপ্রুফ পোশাক পরিহিত কোনো ব্যক্তিকেও কামড় দেয় তাহলে তার গোশত আলাদা করে ফেলতে পারত। বিন লাদেন কোনো গুহায় আশ্রয় নিলেও যেন তাকে খুঁজে নিতে পারে, সে জন্য কুকুরটির গায়ে ইনফ্রারেড ক্যামেরা লাগানো ছিল।

রাডারের চোখ এড়িয়ে চলতে সক্ষম মার্কিন হেলিকপ্টারগুলো খুব নিচু দিয়ে উড়ছিল। পাশাপাশি পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় মার্কিন বিমানগুলো রাডারের চোখ এড়াতে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিল।

পশ্চিমা মিডিয়ার ভাষ্যমতে, বারাক ওবামা অভিযান পরিচালনাকারীদের যেকোনো মূল্যে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে হেলিকপ্টারগুলোর উপর আক্রমণ করা হলে যেন যেকোনো মূল্যে মার্কিন সৈন্যদের নিরাপদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। বস্তুত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে হামলার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবে যদি এমনটি হতো, তাহলে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠত।

৩৮ থেকে ৪০ মিনিটের এই কমান্ডো-অভিযানে পাঁচজনের শাহাদাত ব্যতীত বিন লাদেনের কনিষ্ঠা স্ত্রী আমাল ও তাঁর ১২ বছর বয়সি কন্যা সাফিয়া আহত হন। ঘরে

বেশ কয়েকজন শিশু অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে আরশাদ খানের দুই বা তিনজনসহ তারিক খানের চারজন সন্তান ছিল। বিন লাদেনের সঙ্গে তাঁর আটজন সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি বসবাস করছিল। তাঁর ২২ বছর বয়সি পুত্র খালিদ তারিক খানের বোনকে বিয়ে করেছিলেন। অন্যদিকে বিন লাদেনের তৃতীয় স্ত্রী খাইরিয়া সাবেরা ও চতুর্থ স্ত্রী সিহাম সাবেরও তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তন্মধ্যে হামজা বিন লাদেন ছিলেন প্রথমজনের পুত্র, অন্যদিকে খালিদ বিন লাদেন ছিলেন সিহাম সাবেরের পুত্র।

মিডিয়াসূত্রে জানা যায়, মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যাকআপ হিশেবে যে দুটি ব্ল্যাক হক ও দুটি চিনুক হেলিকপ্টার প্রস্তুত রেখেছিল, এর দুটি অ্যাবোটাবাদের নিকটবর্তী জেলা কালাঢাকার একটি ময়দানে অবস্থান করছিল। ওয়াজিরিস্তান ভিলা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরের এই মাঠে হেলিকপ্টারগুলো প্রায় ৫০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

বেগম খাইরিয়া সাবের পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে জানান, তাঁর ২০ বছর বয়সি পুত্র হামজা সেখানে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছিল; কিন্তু তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁর ভাষ্যমতে হয়তো মার্কিনরা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে; অথবা তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিবার রাত প্রায় ১টা। মার্কিন হেলিকপ্টারগুলো ওয়াজিরিস্তান ভিলায় পৌঁছায়। শুরুর দিকে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—তখন ভবনের ছাদে বিন লাদেনের দেহরক্ষী অবস্থান করছিলেন। হেলিকপ্টারের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা রকেট লঞ্চার দিয়ে হামলা করেন। এতে একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়, যদিও এর আরোহী মার্কিন সৈন্যরা সবাই অক্ষত থাকে। মার্কিন সরকারের মুখপাত্র বলেন, 'প্রথম হেলিকপ্টার ভূপাতিত হতে দেখে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চরম হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি তখন পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ল্যাংলি ভার্জিনিয়ায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পুরো অভিযান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সোমালিয়ায় এমন একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়ে ১৮ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছিল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির শঙ্কায় বারাক ওবামা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।'

এই অপারেশনে প্রথম সারিতে অংশগ্রহণকারী একজন কমান্ডোর ক্যাপে অত্যাধুনিক কর্ডলেস ক্যামেরা সংযুক্ত ছিল, যার মাধ্যমে ওয়াজিরিস্তান থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ভার্জিনিয়া থেকে তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছিল। এই ক্যামেরাটি ট্রান্সমিটামের মাধ্যমে প্রথমে RQ170 গোয়েন্দা ড্রোনে (যা আফগানিস্তানে 'কান্দাহারের পশু' নামে খ্যাত ছিল) পাঠানো হতো, সেখান থেকে ভার্জিনিয়ার সিআইএর সদর দপ্তর ল্যাংলিতে সম্প্রচারিত হতো।

সূত্রমতে জানা যায়, রকেট লঞ্চার ও হেলিকপ্টার ধ্বংসের শব্দ শুনে অ্যাবোটাবাদের বিলাল টাউনের লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়। ঘটনা দেখতে তারা বাসার বাইরে বের হলে পশতু ভাষাভাষী সিআইএর স্থানীয় এজেন্টরা তাদের নিজেদের ঘরে চলে যেতে বলে।

এরপর হেলিকপ্টার থেকে প্রায় দুই ডজন কমান্ডো সিঁড়ি বেয়ে ওয়াজিরিস্তান ভিলার আঙিনায় অবতরণ করে। তারা অন্ধকারে দেখার জন্য নাইট ভিশন চশমা পরিহিত ছিল। প্রথমেই শায়খ আহমাদ আল কুয়েতি ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। তাঁরা দুজনই শাহাদাতবরণ করেন। শায়খ আহমাদের স্ত্রীও গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। ইতিমধ্যে কমান্ডোরা তৃতীয় তলায় বিন লাদেনের কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

প্রথমদিকে হোয়াইট হাউসের প্রবক্তারা এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছিল যে, মার্কিনদের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি নিজের স্ত্রীকে ঢাল বানিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। এর মাধ্যমে মূলত মার্কিন-মিডিয়া বিন লাদেনকে কাপুরুষ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা এ বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। তারা জানায় বিন লাদেন একে-৪৭ রাইফেল হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন; আর তাৎক্ষণিক ক্যামেরাধারী কমান্ডো তাঁকে এক বা দুটি গুলি মেরে হত্যা করে। মার্কিনদের ভাষ্যমতে, তারা তাঁকে জীবিত গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল; কিন্তু লড়াইয়ের তীব্রতায় তাঁকে হত্যা করতে হয়।

এ ব্যাপারে মার্কিন মিডিয়ার মিথ্যাচার সহজেই ধরা পড়ে। এত বড় অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে, হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়েছে; তবু বিন লাদেন নিজের কক্ষে কোনো ধরনের প্রস্তুতি না নিয়ে বসে ছিলেন? তাদের ভাষ্যমতে, তিনি তাঁর একে-৪৭ রাইফেল যখনই হাতে নিতে চেয়েছিলেন, তখনই মার্কিন সেনারা গুলি করে তাঁকে হত্যা করে; অথচ বাস্তবে তাঁর আক্রমণে কয়েকজন মার্কিন কমান্ডোও নিহত হয়েছিল। একটু চিন্তা করুন, বহু বছর ধরে যিনি ভয়াবহ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, সব ধরনের অস্ত্র চালনায় যিনি অভ্যস্ত, খুব কাছেই মার্কিন কমান্ডোদের উপস্থিতি টের পেয়েও কি তিনি তাদের নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে দেবেন? মার্কিনরা যখন তাঁর উপর আক্রমণ চালায়, তিনি তখন নিরস্ত্র ছিলেন—এটা মার্কিন মিডিয়ার স্পষ্ট মিথ্যাচার।

মিডিয়ায় প্রচার করা হয়, কমান্ডোরা বিন লাদেনের কক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে তাঁর স্ত্রী আমাল সামনে আসেন। তিনি ভেতরে তাদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে আহত করা হয়। অতঃপর তারা ভেতরে প্রবেশ করে বিন লাদেনের লাশ নিয়ে বাগরামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। এই অপারেশনের নাম ছিল 'অপারেশন জেরোনিমো।' কোডওয়ার্ড ছিল, এ.কি.য়া (এনেমি কিল্ড ইন

অ্যাকশন) অর্থাৎ, উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা হয়েছে।

মার্কিনরা বিন লাদেনের কক্ষে প্রবেশ করে। কেউ লুকিয়ে আছে কি না, তা জানতে সবকিছু তল্লাশি করে। সেখান থেকে তারা পাঁচটি কমপিউটার, ১০টি হার্ড ড্রাইভ, শতাধিক সিডি-ডিভিডিসহ বিভিন্ন দস্তাবেজ নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিআইএ প্রধানের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়। মার্কিন সরকারের দাবিমতে, প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তারা জানতে পারে, নাইন ইলেভেনের বর্ষপূর্তিতে বিন লাদেন মার্কিন বিমান ও মেট্রোরেলে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন।

ওয়াজিরিস্তান ভিলায় চারটি মৃতদেহ ও একজন আহত নারীকে রেখেই মার্কিনরা সেখান থেকে চলে যায়। পরে জানা যায়, সে ভবনে বিন লাদেন তিন স্ত্রী ১৩ জন সন্তান-সন্ততি ও নাতি নিয়ে বসবাস করছিলেন। যাঁদের বয়স দুই থেকে ১২ বছরের মধ্যে। বিন লাদেনের ১২ বছর বয়সি কন্যাও সেখানে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁদের পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্সের হিফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী আমালকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন সৌদি ও অন্যজন ইয়ামেনি বংশোদ্ভূত।

৪০ মিনিটের অভিযান চলাকালে মার্কিন হেলিকপ্টার ভবনের উপরই ওড়াওড়ি করছিল। মার্কিনরা চলে যাওয়ার সময় ভূপাতিত হেলিকপ্টারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে যায়, যেন পাকিস্তানিরা এর কোনো প্রযুক্তি কাজে লাগাতে না পারে। সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, ভবনে প্রবেশের সময় মার্কিনরা এমন কিছু স্টেনগ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল, যা মানুষের শরীর অবশ করে দেয়। ফলে ভবনের ভেতর তাদের তেমন বড় ধরনের আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়নি।

বাগরাম সেনাঘাঁটিতে পৌঁছে সর্বপ্রথম বিন লাদেনের শরীরের মৃতদেহের পরিমাপ নেওয়া হয়। তাঁর শরীরের মাপ যথাযথ মিলে গেলে এবার তাঁর ডিএনএ টেস্ট করা হয়, যা তাঁর বোনসহ অন্য আত্মীয়স্বজনদের ডিএনএর সঙ্গে মিলে যায়। নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর মার্কিন সরকার বিন লাদেন-পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ডিএনএ নিজেদের সংরক্ষণে রেখেছিল। এভাবেই মার্কিনরা বিন লাদেনকে হত্যার সত্যায়ন পেয়ে যায়।

মার্কিন সরকারের ভাষ্যমতে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সৌদিআরবের সরকার বিন লাদেনের মৃতদেহ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে আরবসাগরে অবস্থানরত রণতরি কার্ল ভিনসনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইসলামি রীতিনীতি মেনে তাঁর শেষকৃত্য সমাপ্ত করে একটি ভারী ব্যাগে করে মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করা হয়।

সমুদ্রে সমাহিত করার সময় জাহাজে অবস্থানরত একজন মুসলমান সৈন্য ইসলামি রীতির আলোকে কুরআন তিলাওয়াত করছিল।

এই ছিল ইসলামের ইতিহাসের বীর সিপাহসালারের জীবনের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান, যিনি জাজিরাতুল আরবের মরুভূমি থেকে আত্মপ্রকাশ করে সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে তাঁর জীবনসফরের সমাপ্তি টানেন। হয়তো সবাই ভাবছে, এত বড় পৃথিবীতে তাঁকে সমাহিত করতে তিন গজ জায়গা পাওয়া গেল না! কিন্তু সমুদ্র হয়তো আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলছিল, হে আল্লাহ, পৃথিবীপৃষ্ঠে তোমার প্রিয় অসংখ্য শহিদের কবর রয়েছে; কিন্তু আমার উত্তাল তরঙ্গমালা ও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে কোনো শহিদের সমাধি হয়নি। আল্লাহ হয়তো সমুদ্রের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, তাই তাঁকে সমুদ্রে সমাহিত করা হয়েছিল।

বিন লাদেনের শাহাদাতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতিক্রিয়া

শায়খ উসামা বিন লাদেন কাফিরবিশ্বের কাছে কতটা আতঙ্কের কারণ ছিলেন, তাঁর শাহাদাতে ইহুদি-খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর শাহাদাতের খবর প্রচার হতেই ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, ওহাইওসহ আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে খ্রিষ্টান কাপুরুষেরা নিজেদের গুহা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আনন্দমিছিল শুরু করে। অন্যদিকে কাফিরবিশ্বের নেতৃবৃন্দ তাঁর শাহাদাতের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে এটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার বিজয় বলে অভিহিত করে। কাফির নেতৃবৃন্দের জন্য তিনি কতটা গলার কাঁটা হয়ে ছিলেন, তার সহজ ধারণা দিতে তাঁর শাহাদাতের পর তথাকথিত বিশ্ব মোড়লদের কিছু বিবৃতি তুলে ধরছি।

- মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা বিন লাদেনের শাহাদাতের ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন, আজ আমি মার্কিন জনসাধারণ ও বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে চাই, আমেরিকা এক অভিযানে আল কায়দা নেতা উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করেছে। সে বিগত ২০ বছর ধরে আল কায়দার প্রধান অ্যাম্বাসেডরের ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে সে আমাদের ও আমাদের জোটভুক্ত বিভিন্ন দেশে হামলার পরিকল্পনা করে। তাকে হত্যা করতে পারা আল কায়দার বিরুদ্ধে আমাদের পরিচালিত যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সফলতা। তবে তার মৃত্যুতে আমাদের যুদ্ধ থেমে যাবে না। তারা এখন আমাদের উপর আরও হামলা চালাতে পারে। তাই দেশের ভেতরে-বাইরে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেন, এটি আমেরিকার জন্য এক

ঐতিহাসিক বিজয়। শান্তিকামীদের বিজয়। যারা নাইন ইলেভেনে নিজেদের স্বজন হারিয়েছেন তাদের জন্য বিজয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলমান থাকবে। আমেরিকা আজ প্রমাণ করেছে, দেরিতে হলেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবেই।

- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেন, এ মুহূর্তটি শুধু নাইন ইলেভেনের হামলায় যাদের আত্মীয়স্বজন নিহত হয়েছে তাদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; বিশ্বের প্রতিটি এমন মানুষের জন্য এটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত, যারা তাদের প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রেখে যাওয়ার প্রত্যাশী। এই সফলতা অর্জনে আমি রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
- ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন, বিন লাদেনের মৃত্যুসংবাদ পুরো বিশ্ববাসীর জন্য আনন্দের। নাইন ইলেভেনসহ আরও বহু হামলায় পেছনে তার হাত ছিল, যেসব হামলায় ব্রিটেনের নাগরিকসহ অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে হত্যা করতে পারা আমাদের জন্য বিশাল সফলতা। নিউইয়র্কের মানুষ ১০ বছর যাবৎ এ সংবাদের অপেক্ষা করছিলেন। আমি আশা করছি, যারা নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের হারিয়েছেন, তাদের জন্য এটি অনেক বড় প্রশান্তির খবর।
- ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সারকোজি বলেন, এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শান্তিপ্রচেষ্টার জন্য বিশাল সফলতা, তবে আল কায়দা এখনো খতম হয়নি।
- রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ বলেন, বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডে রাশিয়ানরা উপকৃত হয়েছে। আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। বিন লাদেনের এই হত্যা-অভিযানসহ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের অপারেশনের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল কায়দা আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকে, তারা এখনো এটা করছে।
- জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বলেন, শান্তিকামীরা বিজয়ী হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের পরাজয় হয়েছে। আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
- চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, বিন লাদেনের মৃত্যু সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে সফলতার মাইলফলক ও ইতিবাচক অগ্রগতির প্রতীক।
- ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেন, এটি স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিজয়। সকল গণতান্ত্রিক দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত।

- ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, আমি এ ঘটনাকে অগ্রগতির মাইলফলক হিশেবে আনন্দ প্রকাশ করছি। আশা করছি, এর ফলে আল কায়দাসহ অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠন চরম ধাক্কা খাবে।
- কাদিয়ানি মুখপাত্র হারেস জাফর বলেন, বিন লাদেনের মতো নামকরা সন্ত্রাসীর মৃত্যুতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি, তার সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে।
- ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, বিন লাদেনের মৃত্যুতে এ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল হবে। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সেনাদের এখন আর মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ইরান সর্বদা সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে।
- পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জারদারি বলেন, বিন লাদেনের হত্যার মাধ্যমে নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে সন্ত্রাসবাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার মৃত্যুতে পাকিস্তানিদের আনন্দিত হওয়া উচিত। অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে পাকিস্তানের জন্য আল কায়দার থাবা থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। যদিও রবিবারের অপারেশনে পাকিস্তান অংশগ্রহণ করেনি; কিন্তু পাকিস্তানের এক দশকের সহযোগিতার ফলেই মার্কিনরা বিন লাদেন পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।
- ইউসুফ গিলানি বলেন, বিন লাদেনের হত্যা আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় সফলতা। তার হত্যা-অভিযান পাকিস্তান ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ বহন করে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে আরও আগে গ্রেপ্তার করতে না পারাটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। ইউসুফ গিলানি আরও বলেন, বিন লাদেনের হত্যা এক ঐতিহাসিক সফলতা। এ অভিযান পরিচালনায় পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছিল।
- পারভেজ মোশাররফ বলেন, এটি অত্যন্ত ইতিবাচক মাইলফলক। এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। আজ আমরা এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছি; কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলমান থাকবে। বিন লাদেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বহু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আল কায়দা সম্পৃক্ত ছিল। তাই এটি পাকিস্তানের বিজয়।
- সৌদিআরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমাদ বিন আবদুল আজিজ বলেন, আল কায়দার সর্বোচ্চ নেতার হত্যা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে বিশ্বনেতৃবৃন্দের অগ্রযাত্রা অব্যাহত করবে।

- সৌদি যুবরাজ ওয়ালিদ বিন তালাল বলেন, বিন লাদেনের হত্যা শুধু মার্কিনদের জন্য নয়; পুরো বিশ্বের জন্য ইতিবাচক ঘটনা।
- হামিদ কারজাই বলেন, চমৎকার! এটি চরম আনন্দের সংবাদ। বিন লাদেন সত্যিকারার্থে মানবতা ও সভ্যতার শত্রু ছিল। তার হত্যা আফগানিস্তানের তালেবানদের দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ শুধু আফগান-গ্রামাঞ্চলে নয়; শত্রুর নিরাপদ অঞ্চলেও তা চলমান থাকবে।
- তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল বলেন, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সন্ত্রাসবাদী নেতারা শেষপর্যন্ত জীবিত বা মৃত ধরা পড়েন। বিশ্বের প্রধান সন্ত্রাসীর নিহত হওয়া এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

বিন লাদেনের শাহাদাতে আরব গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া

শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের পর আল কায়দার ভবিষ্যৎসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। আমরা এখানে এসব প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব। বিশেষ করে আরব গণমাধ্যমে এ ব্যাপারে প্রচারিত কিছু সংবাদ আমরা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করব।

প্রসিদ্ধ আরবি টিভি-চ্যানেল *আল-জাজিরা* আল কায়দার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশিষ্টজনদের মতামত জানতে চায়। বিন লাদেনের শাহাদাতের পর আল কায়দার নেতৃত্ব নিয়েও বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। অধিকাংশের ভাষ্যমতে, ডাক্তার আইমান আল জাওয়াহিরির হাতেই আল কায়দার নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হবে। আবার কারও কারও অভিমত ছিল, বিন লাদেনের সন্তানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ দেওয়া হবে।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, বিন লাদেনের শাহাদাতের পর আল কায়দার কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক গতিতে থাকবে, নাকি এর কর্মধারায় পরিবর্তন আসবে?

বহুদিন ধরে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনসমূহ নিয়ে গবেষণাকারী ফিলিস্তিনের বেরজিত ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ইয়াদ আল বারগুতির মতে, 'আল কায়দার চিন্তাধারায় কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না। তাঁরা বিন লাদেনের নির্ধারিত নীতিমালার ওপরই অবিচল থাকবে।' তাঁর ভাষ্যমতে, 'আয়মান আল-জাওয়াহিরি বিন লাদেনের স্থলাভিষিক্ত হবেন।'

তিনি বলেন, 'আল কায়দা কোনো একক রাষ্ট্রীয় সংগঠন নয়; বরং বিভিন্ন দেশেই এর কর্মকাণ্ড চলমান। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। পুরো

বিশ্বের আল কায়দার সদস্যরা যেভাবে বিন লাদেনের নেতৃত্ব মেনে চলতেন, সেভাবে এখনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মেনে চলবেন।'

ইসলামি সংগঠন নিয়ে গবেষণা করা ড. ওয়ালিদ আল মুদাল্লালের মতে, 'পশ্চিমাদের ব্যাপারে বিন লাদেন যে দর্শন লালন করতেন, আল কায়দা তার ওপর অটল থাকবে।' তাঁর ভাষ্যমতে, 'আল কায়দার সঙ্গে বহু অভিজ্ঞ নামকরা ব্যক্তি জড়িত আছেন, তবে তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আইমান আল জাওয়াহিরি। আবার তাঁরা নিজেদের নতুন নেতৃত্ব গোপনও রাখতে পারেন।'

তিনি বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সমস্যার সঠিক সমাধান না হবে, ততদিন পর্যন্ত আল কায়দা নিজের দর্শনে অবিচল থাকবে। যতদিন পর্যন্ত জাজিরাতুল আরবসহ ইসলামি ভূখণ্ডে মার্কিনদের দখলদারত্ব বাকি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আল কায়দাও বাকি থাকবে।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমাদের ইসলামবিদ্বেষ সবার সামনে এখন আরও স্পষ্ট। এতে আল কায়দার দর্শন আরও শক্তিশালী হবে, যার মোকাবিলা আরব শাসকরা করতে পারবে না।'

বিশিষ্ট রাজনীতি-গবেষক খালেদ আল আম্মারের মতে, আল কায়দার মতো সংগঠন কোনো এক ব্যক্তির মৃত্যুতে দুর্বল হয়ে যাবে না; বরং আল কায়দা এখন একটি দর্শনে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে বিন লাদেন শুধু প্রতীকী নেতৃত্ব পালন করেছেন। আল কায়দার যাবতীয় কর্মকাণ্ড অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পরিচালনা করতেন।

প্রসিদ্ধ আরব সাংবাদিক ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত আরবি পত্রিকা *আল-কুদস আল-আরাবির* সম্পাদক আবদুল বারি আতওয়ান সম্প্রতি তাঁর এক নিবন্ধে বিন লাদেনের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। বিন লাদেনের পর এই সংগঠন কীভাবে চলবে, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ ও আরব রাজনীতিবিদদের মতে, 'বিন লাদেনের শাহাদাতের পর আল কায়দা দুর্বল হয়ে যাবে; কিন্তু তিনি তাদের এ মতের সঙ্গে একমত নন।' তাঁর ভাষ্যমতে, 'বিন লাদেন কাফিরদের হাতে বন্দি না হয়ে সম্মানের মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আল কায়দা আরও শক্তিশালী হবে। নিজেদের নেতার শাহাদাতের ঘটনায় আল কায়দার পক্ষ থেকে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আরও কঠিন প্রতিশোধের সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'নাইন ইলেভেনের ঘটনার পর থেকেই বিন লাদেন ময়দানে অবস্থান করা নেতৃবৃন্দের হাতে সকল ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন।'[২৬]

---

২৬ *আল-কুদস আল-আরাবি* : মে ২০১১।

আবদুল বারি আতওয়ান তাঁর প্রবন্ধে আরও লেখেন, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন আমি প্রথম বার আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য নাঙ্গারহারের তোরাবোরা এলাকায় বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁকে আমি অন্যান্য সাধারণ আরবের চেয়ে ব্যতিক্রম দেখতে পাই। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। খুব ধীরে ধীরে কথা বলতেন। তাঁর সামনে কথা বলা ব্যক্তির কথার মধ্যখানে কথা বলতেন না। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ব্যক্তিদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। কেউ তাঁকে কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে চমৎকার উত্তর দিতেন।

আবদুল বারি আতওয়ান বলেন, আজও আমার মনে আছে, আমি তাঁকে তাঁর শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এরপর অশ্রুসিক্ত নয়নে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'আমার শেষ ইচ্ছা, শাহাদাতের মৃত্যু যেন নসিব হয়।'

বিন লাদেনের পরিজনদের মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব

বুরায়দা রা. হতে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেন,

> মুজাহিদদের ঘরে থাকা স্ত্রীগণের সম্মান করা স্থানীয় লোকদের জন্য নিজের মা-বোনের মতো সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে গমন না করবে, সে জিহাদে গমন করা মুজাহিদের পরিবার-পরিজনদের খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্বশীল হবে। যদি সে এতে কোনো ধরনের খিয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই মুজাহিদের সামনে দাঁড় করানো হবে, মুজাহিদ তার আমল থেকে যত পরিমাণ ইচ্ছে সাওয়াব নিয়ে যাবে।

পাকিস্তানের মুসলমান ভাইয়েরা একটু চিন্তা করুন, আমরা কি আল্লাহর কাছে এ কথা বলে পার পেয়ে যাব যে, বিন লাদেনের স্ত্রী-পরিজন পাকিস্তানের নাগরিক নন; তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া বা পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব নয়।

আসুন, অসহায় মুসলমান নারী ও শিশুদের পক্ষে আওয়াজ তুলুন। এরা মুসলমানদের সন্তান। মুসলমানদের ইজ্জত ও সম্মানের প্রতীক। এরা মুজাহিদদের সম্মান ও উম্মাহর আমানত। ১৮ কোটি মুসলমানের এ দেশ থেকে মুসলিম নারী ও শিশুদের কি কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? ইসলামবিদ্বেষী নরপশুদের হাতে সোপর্দ করা হবে? এসব হিংস্র পশুরা বাগরাম ও আবু গারিব কারাগারে কী-না করেছে? আফিয়া সিদ্দিকির কাহিনি কি আপনাদের মনে নেই? মনে রাখবেন, ইসলামের বন্ধনকে সব ধরনের আত্মীয়তার চেয়ে ঊর্ধ্বে মনে না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি পূর্ণ মুসলমান হতে

পারে না। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র কী করে ইসলামের বন্ধন ভুলে যেতে পারে? এ জন্যই কি পশ্চিমারা আমাদের জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের সবক পড়িয়েছে? ইমানি আত্মমর্যাদাবোধের প্রদর্শনী করে মুসলমান নারী-শিশুদের প্রত্যার্পণ বন্ধে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের জন্য আবশ্যক।

ইরানে কারাবন্দি হওয়া বিন লাদেনের পরিবার

নাইন ইলেভেনের হামলার পর শায়খ উসামা বিন লাদেনের পরিজনদের প্রায় ২০ জন ইরানে চলে যান। ইরান সরকার সেখানে তাঁদের আট বছর কারারুদ্ধ করে রাখে। সদ্য তাঁরা জামিনে মুক্ত হয়েছেন। ইরানে তাঁর পরিবারের যাঁরা কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর ২৭ বছর বয়সি উসমান বিন লাদেন, তাঁর দুই স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে ও ৩০ বছর বয়সি সাদ বিন লাদেন, তাঁর দুই কন্যা, এক ছেলে, ২৫ বছর বয়সি মুহাম্মাদ বিন লাদেনের (আবু হাফসের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল) দুই কন্যা, এক ছেলে, ১৯ বছর বয়সি হামজা বিন লাদেন, তাঁর মা খায়রিয়া সাবেরিয়া, বিন লাদেনের মেয়ে ফাতিমা বিনতু লাদেন, তাঁর স্বামী ও কন্যা নাজওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

- পাকিস্তানের পেশোয়ার, করাচি, লাহোর, কোয়েটা, মুলতানসহ বিভিন্ন শহরে বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়। শুক্রবার দেশব্যাপী বিভিন্ন মসজিদে তাঁর জন্য বিশেষ দুআ করা হয়। বেলুচিস্তানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম তাঁর পক্ষে প্রতিবাদমিছিল বের করে। পার্লামেন্ট বৈঠক চলাকালে মুফতি কিফায়াতুল্লাহ তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করেন।
- অধিকৃত কাশমিরের অধিকাংশ মসজিদে বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়। সাইয়িদ আলি গিলানি শ্রীনগরে জুমুআর সালাতের পর তাঁর গায়েবানা জানাজার ইমামতি করেন।
- ৬ মে শুক্রবার মিসরে বিন লাদেন-দিবস পালন করা হয়। কায়রোর হাজারো মুসলমান তাঁর গায়েবানা জানাজা আদায় করেন।
- ইন্দোনেশিয়ার তানজিম আল কায়দা সোলোর আহ্বানে বহুসংখ্যক মুসলমান প্রতিবাদমিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলে মুখ ঢাকা যোদ্ধারা বিন লাদেনের শাহাদাতের বদলা নেওয়ার ঘোষণা দেন।

- মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে মুসলমানরা বিন লাদেনের পক্ষে মিছিল বের করেন।
- তুরস্কের ইস্তাম্বুলের প্রসিদ্ধ ফাতিহ মসজিদে বহুসংখ্যক মুসলমান বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁরা মসজিদের বাইরে মার্কিনদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।
- লেবাননের বিভিন্ন শহর ও রাজধানী বৈরুতের বিভিন্ন জায়গায় বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়। সেখানে অবস্থানরত ফিলিস্তিনিরা দলে দলে এসব জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

  শায়খ উমর বাকরি মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা ও প্রতিবাদসভাগুলো যেন মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটের সামনে আদায় করা হয়, যাতে মার্কিনরা এতে প্রভাবিত হয়।
- মধ্য-লন্ডনে হাজারো মুসলমানের উপস্থিতিতে বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা আদায়ের পর মার্কিন দূতাবাস-অভিমুখে প্রতিবাদমিছিলের আয়োজন করা হয়।
- রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে মুসলমানরা বিন লাদেনের পক্ষে প্রতিবাদমিছিল করেন।
- ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় জুমুআর সালাতের পর লাদেনের গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়। অতঃপর শায়খ জামিল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে তাঁরা মার্কিন দূতাবাসের বাইরে মার্কিনবিরোধী স্লোগান দেন।
- ইউক্রেনের রাজধানীতে মুসলমানরা বিন লাদেনের স্মরণসভার আয়োজন করেন।

বিশ্বব্যাপী আয়োজিত এসব গায়েবানা জানাজা ও প্রতিবাদসভাগুলো বিভিন্ন দেশের মিডিয়ায় ব্যাপক কভারেজ পায়।

- তাহরিকে সদর ও অল পাকিস্তান ব্যবসায়ী পরিষদের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান তারিক মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক সুলতাম মাহমুদ মালিক, সহসভাপতি চৌধুরী মাহবুব সুবহানি, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান রাও ইফতিখার আহমাদ প্রমুখ মার্কিন খুনিদের হাতে বিন লাদেনের শাহাদাতের তীব্র নিন্দা জানান। মুলতান এমসিসি গ্রাউন্ডে তাঁর গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়।[২৭]

---

২৭ *রোজনামা ইসলাম ৪ মে ২০১১।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিন লাদেনের ব্যাপারে
পাকিস্তানি আলিমদের অভিমত

মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ির ঐতিহাসিক ফাতওয়া

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের সিংহ শায়খ উসামা বিন লাদেনকে মার্কিন কমান্ডোদের মাধ্যমে গ্রেপ্তারের জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাঁর অবস্থান লক্ষ্য করে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালানো হয়। পাকিস্তান এ ক্ষেত্রে মার্কিনদের সহযোগিতা করতে পারে, এমন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় মাওলানা নিজামুদ্দিন শামজায়ি বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার বা শহিদ করা হলে পাকিস্তানে জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে এক দুঃসাহসিক ফাতওয়া প্রদান করেন।

শামজায়ি রাহ. তাঁর সেই ঐতিহাসিক ফাতওয়ায় বলেন,

> বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার বা হত্যা করা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এর সঙ্গে জড়িত দেশিবিদেশি সকল শক্তি ও সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে পরিণত হবে। কেননা, তিনি বর্তমান বিশ্বে জিহাদ ও ইসলামের বিজয়পতাকার ধারণকারী। তিনি নিজের জানমাল দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ জন্য জীবনের সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার ও তার গোয়েন্দাসংস্থার মদদ ব্যতীত তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে শুধু পাকিস্তানের সাহায্যেই এটি সম্ভব। তাই আমি ফাতওয়া দিচ্ছি, যদি এমনটি হয় তাহলে মুসলমানদের জন্য, বিশেষত পাকিস্তানি মুসলমানদের জন্য বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ বলে গণ্য হবে।
>
> পাকিস্তান ও সৌদি সরকার বিন লাদেনের গ্রেপ্তারে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের মার্কিন দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। বর্তমানে লাখ লাখ মার্কিন ইহুদি-খ্রিষ্টান সেনা সৌদিআরব ও মধ্যপ্রাচ্যের

তেল উৎপাদনকারী অন্য দেশগুলোতে অবস্থান করছে। এসব দেশের সরকার তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছে। তাদের জন্য শুকর ও মদ পরিবেশন করছে। তাদের জৈবিক চাহিদা মেটাতে মুসলমান নারীদের ব্যবহার করছে। তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে এসব দেশের নাগরিকদের জন্য তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতাচ্যুত করা আবশ্যক।

বর্তমানে আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো আরবদের তেলসম্পদ নামমাত্র মূল্যে ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান কাপুরুষ শাসকদের অবহেলায় তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের লোকসান সহ্য করতে হচ্ছে। তাই শরিয়তের বিধানমতে তাদের পদচ্যুত করা আবশ্যক।

আল্লাহর কৃপায় বর্তমানে মুসলিম যুবাদের মধ্যে জিহাদি চেতনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে আফগানিস্তানের পাশাপাশি বিন লাদেনের ব্যক্তিত্বও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। তাঁকে গ্রেপ্তার বা হত্যা করা পাকিস্তান সরকারের মদদ ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি এমনটি হয়, তাহলে এ পরিকল্পনা রুখে দিতে পাকিস্তানি মুসলমানদের জিহাদে নেমে পড়া আবশ্যক হবে। আমি আফগানিস্তানের ইসলামি সরকার ও তালেবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যদি আফগানিস্তানে বিন লাদেনের গায়ে কোনো আঁচড় লাগে, তাহলে তালেবানরা বিশ্বমুসলমানদের সহমর্মিতা হারাবে। আমি দেশব্যাপী আলিমগণের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে জনসাধারণকে এসব চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন।[২৮]

জামিয়াতুর রশিদের প্রতিষ্ঠাতা মুফতি রশিদ আহমাদ

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বিন লাদেন মুফতি রশিদ আহমাদ বরাবর এক পত্র লিখে তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। প্রত্যুত্তরে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের রমজানে মুফতি রশিদ আহমাদ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আলিমদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠান।

প্রতিনিধিদলের একজন প্রখ্যাত আলিম শায়খ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাতের বৃত্তান্ত তুলে ধরে বলেন, আমরা যখন বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পৌঁছাই, তাঁর দেহরক্ষীদের আমরা পরিচয় দিয়ে বলি, 'আমরা জামিয়াতুর রশিদের দারুল ইফতা থেকে এসেছি।' দেহরক্ষীরা আমাদের জানান, 'শায়খ গত রাতে আপনাকে এবং মাওলানা ফজল মুহাম্মাদকে স্বপ্নে দেখেছেন।'

---

২৮ ড. মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি

ইতিমধ্যে ইফতারের সময় হলে বিন লাদেনসহ আরব মুজাহিদগণ রাফয়ে ইয়াদাইন না করে হানাফি মাজহাবমতো সালাত আদায় করেন। অতঃপর আরব রীতিনীতিতে আমাদের আপ্যায়ন করানো হয়। আমরা সকলেই খাওয়া-দাওয়া করি। এরপর বিন লাদেনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়। তিনি আমাদের প্রশ্ন করেন, 'পাকিস্তানবাসী আমার ব্যাপারে কেমন মনোভাব পোষণ করে?' আমি উত্তরে বলি, 'পাকিস্তানবাসী আপনার জন্য উৎসর্গপ্রাণ। তারা আপনার নামে নিজেদের সন্তানদের নাম রাখে।'

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের আলিমরা মিডিয়া কেমন ব্যবহার করেন? সৌদিআরবের আলিমরা তো ব্যাপকভাবে মিডিয়া ব্যবহার করেন এবং এর মাধ্যমে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।' আমি বলি, 'আমাদের আলিমগণ মিডিয়ার ব্যবহার তেমন পছন্দ করেন না।' উত্তরে তিনি বলেন, 'মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দীনের প্রচার-প্রসার করা যায় এবং জিহাদের দাওয়াত দেওয়া যায়।' আমি বলি, 'ইসলামের দাওয়াত স্বাভাবিক পন্থায় হওয়া উচিত।' তিনি চুপ হয়ে যান।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে মুফতি রশিদ আহমাদ মিডিয়ার মাধ্যমে জিহাদের দাওয়াতের বৈধতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যখন আমরা তাঁর থেকে বিদায় নিই, তখন তিনি নিজেই গাড়ি পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দেন এবং আমাকে একটি ছড়ি হাদিয়া দেন। এরপর কান্দাহারের গভর্নর মুহাম্মাদ হাসান পুরো শহর আমাদের ঘুরিয়ে দেখান এবং শহিদানের কবর জিয়ারত করান। রাস্তায় আমরা আরও কিছু কবর দেখতে পাই। আমাদের জানানো হয়, রুশবাহিনী এখানে বিভিন্ন আলিমদের শহিদ করে। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন মুজাহিদের মাধ্যমে আমার কাছে কুরআনের একটি নুসখা ও এক সেট পোশাক পাঠান এবং আমার কাছে কম্পাস চেয়ে পাঠান, যা আমি তাঁর বরাবর পাঠিয়ে দিই।

মুফতি মাওলানা আতিকুর রহমান

উসামা শব্দের অর্থ বনের রাজা, যার হুংকারে বনের সকল পশু তার সামনে নতি স্বীকার করে। উসামা বিন লাদেন তাঁর নামের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন, তিনি সত্যিকারার্থেই ছিলেন ইসলামের সিংহ, যাঁর হুংকারে কাফিরদের সভাসদরা কেঁপে ওঠে। কাফিরবিশ্বের জন্য তিনি এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে উঠেছিল। যাঁর ভয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টান ও তাদের অনুসারীরা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, তাদের নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। যাঁর আতঙ্কে মার্কিনদের জন্য পৃথিবী আজ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। মার্কিনরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করে পালিয়ে যাচ্ছে। সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন আমেরিকার ঘরবাড়িগুলোও ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আশ্রয় দেওয়ার উপযুক্ত

থাকবে না। বিন লাদেন ও তাঁর পরিবার বহুদিন ধরে বিন লাদেন কোম্পানির মাধ্যমে হারামাইন শরিফাইনের নির্মাণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় ২০ বছর যাবৎ আল্লাহর ঘরের খিদমাত আনজাম দিচ্ছেন। হয়তো এর বদৌলতেই মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জিহাদ ও খিলাফতের পুনর্জাগরণ তৈরি করেছেন।

তিনি জিহাদি কর্মকাণ্ড শুরু করলে আমেরিকার সুদৃষ্টি পেতে সৌদির রাজপরিবার তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়। ফলে তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন শুরু করেন। তিনি বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন; কিন্তু ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হতে রাজি ছিলেন না। এসব ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আজ তিনি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের স্পন্দন হিশেবে পরিণত হয়েছেন। মুজাহিদদের সবচেয়ে প্রিয়তম নেতায় পরিণত হয়েছেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের অনুধাবন করা যাবে পরকালে; কিন্তু ইহকালেই তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

রাসুল সা. যেমন উসামা বিন জায়েদ রা.-কে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সেনাপতি নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন, তেমনিভাবে আল্লাহ আজ উসামা বিন লাদেনকে আরবের বিলিয়নিয়ার পরিবারের বিলাসী জীবনের পরিবর্তে আফগানিস্তানে পাহাড়ি ভূমিতে কাফিরদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হিশেবে পাঠিয়েছেন। ইসলামের শত্রুদের জন্য মৃত্যুপয়গামে পরিণত করেছেন।

লাল মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল্লাহ শহিদের কবিতা

ইসলামাবাদের লাল মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল্লাহকে 'তাহফফুজে হারামাইন'-এর ব্যাপারে দুঃসাহসিক আলোচনার অপরাধে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। মূলত শায়খ উসামা বিন লাদেনের কাছ থেকেই তিনি হারামাইনের হিফাজতের প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি শাহাদাতের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বিন লাদেনের ব্যাপারে আরবিতে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। এই কবিতা থেকে বিন লাদেনের সঙ্গে আলিমদের সখ্যের অনুমান করা যায়। বিন লাদেন শুধু সাধারণ মানুষেরই নয়; আলিমগণের ভালোবাসায়ও সিক্ত ছিলেন।

উসামা উত্তম অশ্বারোহী
রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম।
তিনি সৌদিআরবের একজন মর্দে মুজাহিদ
যিনি মার্কিনদের তোপের শিকার।

কিন্তু তিনি কোনো পরোয়া করেন না
কোনো ধরনের ভীতি বা শঙ্কাও অনুভব করেন না।
আমেরিকা তাঁকে ধ্বংস করতে প্রত্যয়ী
কিন্তু তিনি নিজ লক্ষ্য থেকে ফিরে যেতে রাজি নন।
বস্তুত উসামা একজন সাহসী নেতা
ও কিছু করে দেখাতে প্রত্যয়ী।
অনেক আগে তিনি সৌদি থেকে হিজরত করে এসেছেন
তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও দানশীল ব্যক্তি।
আমরা তাঁকে দেখেছি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও স্বাধীনচেতা হিশেবে
তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও শিষ্টাচারী।
তিনি এখন আফগান জাতির মেহমান
আর আফগানিরা জাতিগতই সদাচারী।
তারা প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, যখন তারা সিংহে পরিণত হয়
তখন তারা শত্রুকে ধ্বংস করে অথবা নিজে মৃত্যুবরণ করে।
আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই দুঃসাহসী ওই জাতিকে
যারা বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশে সাহায্য করে অবিচল থাকে।
আশা করি আল্লাহ তাদের মুক্তি দেবেন এমন বিপদ থেকে,
যা তাদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে।
আমি সাক্ষাতে তাঁকে পেয়েছি একজন অসমসাহসী বীর হিশেবে
তিনি একজন সম্মানিত মেহমান, আল্লাহ তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করুন।
তাঁকে আল্লাহ কল্যাণ ও ভালো জিনিসের বড় অংশ দিয়েছেন,
তিনি অত্যন্ত সাহসী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি।
হে মানুষের প্রভু, তাঁর ওপর দয়া করুন।
তাঁকে কঠিন বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি দিন।
আমি আবদুল্লাহ তাঁর উঁচু হিম্মত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রশংসাকারী
আমি তাঁর একান্তভাজন একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

মাওলানা আজম তারিকের বক্তব্য

২০০১ খ্রিষ্টাব্দে খানপুরে জামিয়া আবদুল্লাহ বিন মাসউদের সম্মেলনে মাওলানা আজম তারিক এক ঐতিহাসিক বক্তব্য দিয়েছিলেন। সম্মেলনে মাওলানা সামিউল হক, আল্লামা আলি শের হায়দারিসহ বরেণ্য আলিমগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুহতারাম মাওলানা শফিকুর রহমান দরখাস্তি ও উপস্থিত আলিমগণ, নওজোয়ান সাথি ও দূর থেকে আগত ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান ভাইয়েরা, জামিয়া আবদুল্লাহ বিন মাসউদের তিন দিনব্যাপী ইসলামি জলসার আজ সমাপনী বৈঠক চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সিপাহে সাহাবার প্রধান আল্লামা আলি শের হায়দারি সমাপনী বক্তব্য পেশ করবেন। ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে জিহাদি সংগীত ও জমিয়তনেতা মাওলানা সামিউল হক তাঁর যুগোপযোগী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, বর্তমান বিশ্বের বড় সন্ত্রাসী শয়তানের এজেন্ট আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তি তালেবানদের উপর হামলা করেছে। আমি মনে করি না, এ ঘটনার পর বিশেষ কোনো বক্তব্যের প্রয়োজন আছে।

সারা জীবন আমরা বহু বক্তব্য শুনেছি। জীবনের বাকি দিনগুলো আর ঘরে বসে কাটানো উচিত নয়। যদি আমাদের অন্তরে সত্যিকারার্থে ইসলামের ভালোবাসা থাকে, যদি আমরা ইসলামের কালিমার অনুসারী হয়ে থাকি, তাহলে আজ জিহাদের পতাকা উঠিয়ে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের স্লোগান দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ুন। প্রয়োজন হলে আমরা আফগানিস্তানে যাব ইনশাআল্লাহ। যদি এর প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে পাকিস্তান থেকেই জিহাদের সূচনা করব। আমি কয়েকদিন থেকে আমার বন্ধুদের বলছিলাম—দুআ করো, যেন আমাদের শত্রুরা হামলা করে দেয়, আর কিছু একটা শুরু হয়ে যায়। এটা তো তাদেরও সৌভাগ্য, পাকিস্তান সরকারেরও সৌভাগ্য যে, তারা পাকিস্তানের মাধ্যমে হামলার সূচনা করেনি। তারা অন্য কোনো দেশে হামলা চালিয়েছে। আল্লাহর শপথ, যদি তারা পাকিস্তানের ভূমিতে এই হামলা চালাত, যদি পাকিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনী অবতরণ করত, তাহলে আর আমার বক্তব্যের প্রয়োজন হতো না। আমি শুধু এটাই বলতাম, পাকিস্তানিরা, এয়ারপোর্ট ও সেনা-ক্যাম্পগুলো দখলে নাও। রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নাও। আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের জীবন সংকীর্ণ করে দাও।

আমি কিছুক্ষণ আগে জমিয়তপ্রধানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন পরিকল্পনা কী? তিনি বললেন, সকালে পরামর্শ হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। সকালে হোক অথবা আগামীকাল বা পরশুদিন, আপনাদের কাছে সংবাদ আসবেই। আমাদের সব সময় নেতাদের আহ্বানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রস্তুতি অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, গোলাবারুদ আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ, কাফিররা

ভরসা করে তরবারির ওপর আর মুমিনরা তরবারিবিহীন আল্লাহর ওপর ভরসা করেই লড়ে যায়।

অনেকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা মার্কিনদের বিরুদ্ধে কী নিয়ে লড়াই করবে, তাদের সামনে তোমাদের অবস্থানই-বা কী? আপনারা বলুন, যারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, তাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল? আপনারা বলছেন, আপনাদের চারটি জাহাজ তারা ছোট ছোট ছুরির ভয় দেখিয়ে অপহরণ করেছিল। যার সোজা অর্থ, আপনাদের সকল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তাদের ছোট ছোট ছুরির সামনে অকার্যকর হয়ে পড়ছিল। বলুন, 'তারা ছোট ছোট ছুরি নিয়ে আপনাদের উপর আক্রমণ করেছে।'

কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনারা কী করতে পারবেন? আমি বলি, এখনো বুঝতে পারছেন না? ধরুন, পিআইএ পাঁচটি বিমানই যথেষ্ট। এয়ারপোর্ট আমাদের, রাষ্ট্রও আমাদের। পাঁচটি বিমানই যথেষ্ট। একটি বিমান একটি ঘাঁটির জন্য, আরেকটি আরেক ছাউনির জন্য। আরও দু-তিনটি ভিন্ন টার্গেটের জন্য, ব্যস—ঝামেলা শেষ। অ্যাটম বোম যা করতে পারেনি, বিমান তা করে দেখিয়েছে। তাই বন্ধুরা, জিহাদের সময় এসেছে, এখন কিছু করে দেখানোর সময়। প্রতিজ্ঞা করুন, এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাসায় ফিরবেন। যুদ্ধের কথা বলুন, শত্রুদের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানোর হিম্মত করুন, তাদের পরাজিত করার কথা বলুন।

তারা বলে, জনাব, জিহাদের কথা বলবেন না—এটি সন্ত্রাস। আমি বলব, যদি জিহাদই সন্ত্রাসবাদ হয় তাহলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর স্লোগান দেওয়া সেনাবাহিনী গড়ে তোলা কি পাকিস্তানের জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ নয়? আপনারা যে অ্যাটম বোমা বানাচ্ছেন, তা শোপিস হিশেবে রেখে দেওয়ার জন্য? যুদ্ধের জন্য ৫ লাখ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনী কেন গড়ে তুলেছেন? যুদ্ধ করার জন্যই তো বানিয়েছেন। আল খালিদ ট্যাংক কেন বানিয়েছেন? সবকিছুই তো যুদ্ধের জন্য। গানশিপ হেলিকপ্টার কেন? যুদ্ধের জন্যই তো। যদি যুদ্ধই সন্ত্রাসবাদ হয় তাহলে সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে দিন। বাসের জায়গায় ট্যাংক গণপরিবহণে পরিণত করুন। এফ-১৬ বিমানে মুলতান এয়ারপোর্ট থেকে খানপুর পর্যন্ত সার্ভিস দিন। যুদ্ধই যদি সন্ত্রাসবাদ হয়, তাহলে অ্যাটম বোমা কেন? কেন যুদ্ধবিমান? এসব আয়োজন কী জন্য? শুধু তো যুদ্ধের জন্যই।

আমাদের দেশের শাসকই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যে বাহিনীর স্লোগানে

ইমান, তাকওয়া এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কথা আছে। তাদের কাছে এখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হয়ে গেছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড? তোমাদের সৈন্য মারা গেলে সেটা হয় সন্ত্রাসবাদ, আর আমাদের সৈনিক মারা গেলে হয় নিরাপত্তা-ইস্যু? ইরাকে আমাদের ভাই মারা যাচ্ছে, তো নিরাপত্তার দোহাই। কসোভো, চেচনিয়া ও কাশমিরে আমাদের ভাই মারা যাচ্ছে, তা-ও নিরাপত্তার দোহাই। আমাদের ভাইয়েরা আক্রান্ত হচ্ছে, সেটা সেরা নিরাপত্তা। আর তোমাদের উপর বোমা হামলা হলেই সন্ত্রাসবাদ—এটাই জাতিসংঘ ও শান্তিপরিষদের নীতি। এটা কেমন সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা? সন্ত্রাসবাদের অর্থ কী? আমরা তোমাদের থেকে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা শিখতে চাই না। আমাদের কাছে সন্ত্রাসবাদের অর্থ সেটাই, যা আমারা কুরআন ও হাদিস থেকে পেয়েছি।

তোমরা বিশ্বব্যাপী অত্যাচার-অবিচার করছ। সবখানেই চলছে তোমাদের বর্বরতা। তোমরা মুসলমানদের গণহত্যা করছ, তোমরা পুরো পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ উসকে দিচ্ছ, তবু এসব সন্ত্রাসবাদ নয়। তোমাদের চারটি ভবন ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে—এটাই সন্ত্রাসবাদ? আমরা একে সন্ত্রাসবাদ মনে করি না, আমরা একে মনে করি সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়া—যেমন কর্ম তেমন ফল। এটা তোমাদেরই কাজের প্রতিফল।

আমি তোমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, হে মার্কিন শাসক ও জনগণ, তোমরা সদাচরণ করো, পরিবর্তে সদাচরণ পাবে। অন্যায় করবে তো প্রতিশোধ নেওয়া হবে। বিনাশ করবে, শাস্তি পাবে। আমরা তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা যেমন করবে, আমরাও তেমন করব। তোমরা আমাদের উপর বোমা হামলা করবে; আর আমরা তোমাদের ফুলের শুভেচ্ছা জানাব; তা হতে পারে না। তোমরা আমাদের শিশুদের হত্যা করবে, আমরা তোমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকব—এটা কীভাবে সম্ভব? তোমরা মুসলিম উম্মাহকে রক্তাক্ত করবে, আমরা চুপ করে থাকব—এটি কখনোই চলতে পারে না। তোমরা আমাদের একজন শিশুর গলায় ছুরি চালাবে, আমরা তোমাদের হাজার শিশুর গলায় ছুরি চালাব। তোমাদের লজ্জা হয় না?

এরপর তিনি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী হলে কি এখানে টনি ব্লেয়ার আসতে পারত? আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম মোল্লা উমর ও বিন লাদেনকে স্বাগত জানাতাম। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতাম, আমরা অ্যাটম বোমা বানিয়েছি, শোপিস হিশেবে সাজিয়ে রাখার জন্য

নয়। আমাদের নিশানা বানাতে চাইলে উড়িয়ে দেবো। সমস্যা নেই, হয়তো আমি প্রধানমন্ত্রী নই; কিন্তু আমি জানি পুরো জাতি আমার সঙ্গে আছে। আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে আছে।

হে মার্কিনদের দোসররা, এ জাতি বিশ্বাসঘাতক নয়। তোমরা বলছ আমরা খাদ্য পাচ্ছি, ডলার পাচ্ছি। তোমাদের এমন ডলারের ওপর আল্লাহর লানত। অপমানজনক খাবারের ওপর অভিশাপ। এক হাতে ডলার কামিয়ে নিচ্ছ, আরেক হাতে নিজেদের কাঁধে মার্কিন বন্দুক রেখে নিজেদের ভাইয়ের বুকে গুলি চালাচ্ছ—ধিক্কার তোমাদের এমন জীবনের ওপর।

আমাদের বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের কথা বলুন। আমিও বলছি, আসুন পাকিস্তানের কথা বলি। আপনারাও পাকিস্তানের কথা বলুন, আমরাও পাকিস্তানের কথা বলব। পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার কথা বলুন, নিরাপত্তার কথা বলুন। পাকিস্তানের উন্নতির কথা বলুন, সুখ-শান্তির কথা বলুন। আসুন মিলেমিশে কাজ করি; কিন্তু যখন আপনারা পাকিস্তানের কথা বাদ দিয়ে মার্কিনদের কথা বলবেন, তখন আমরাও তালেবানদের কথা বলব।

আপনারা পাকিস্তানের কথা বাদ দিয়ে জর্জ বুশের কথা বলবেন? তাহলে আমরাও বিন লাদেনের কথা বলব। আপনারা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আমি জানতে চাই তাঁর দোষ কী? তিনি জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন! তিনি পুঁজিবাদী মার্কিনদের তথাকথিত বিশ্ব-পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন! তিনি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জাজিরাতুল আরব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন! যদি এসব বলা তাঁর অপরাধ হয়, তাহলে আমিও বলছি তারা যেন জাজিরাতুল আরব থেকে বেরিয়ে যায়। আমি বলতে চাই, তারা যেন মুসলমানের ইসলাম ও সহায়-সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়। আমি আবারও বলছি, ইহুদি-খ্রিষ্টান সেনারা যেন জাজিরাতুল আরব থেকে বেরিয়ে যায়। জিহাদ আমাদের ওপর ফরজ। উসামাকে পান বা না পান, আমিই উসামা। আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করছি, বিদ্রোহের ঘোষণা করছি। পৃথিবীজুড়ে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাও, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমাদের হত্যা করতে চাও, আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। ভুলে যেয়ো না, আমাদের আত্মমর্যাদাহীনতার সবক শেখাবে না! আমাদের সামনে গাদ্দারদের উপাখ্যান উপস্থাপন করো না। সরকারি মৌলভীরা টিভিতে আসছে, টিভি থেকে একটু

বেরিয়ে দেখো বিশ্ববাসী তোমাদের কী বলছে। টিভিতে এসে দার্শনিক বুলি কপচায়। বলে, আমি ইসলামের এমন ব্যাখ্যা দেবো, অন্য কেউ যা পারে না। অবশ্য কথা সত্য—যে দর্শন চৌদ্দশ বছর ধরে কোনো মুহাদ্দিস, ফকিহ বা ইসলামি চিন্তাবিদ লালন করেননি, রাসুলের হাদিসে নেই, কোনো তাফসিরে নেই—সে ব্যাখ্যা অবশ্যই ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা।

আমি বার বার বলছি, আবারও বলছি, নীতি পরিবর্তন করুন। আপনাদের ভুল নীতির কারণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মানহানি হচ্ছে। আপনাদের কারণে আমাদের সেনাবাহিনীর মর্যাদা কমছে। নীতি পরিবর্তন করুন, অন্যথায় দেশ গৃহযুদ্ধের শিকার হবে। আল্লাহর কসম, তালেবানদের উপর বোমা বর্ষণ করা হবে, তারা গুলিতে নিহত হবে, সেখানে মিসাইল হামলা হবে, বিবিসি সিএনএনসহ বিশ্বমিডিয়া মুসলমানদের আর্তনাদ সম্প্রচার করে দেখাবে; আর আমরা চুপ থাকব? আল্লাহর শপথ, এটা হতে পারে না। তাঁদের ব্যথায় আমি ব্যথিত হব। তাঁদের জীবন আমার জীবন, তাঁদের মৃত্যু আমার মৃত্যু। আমরা এক জাতি, আমাদের জীবনমৃত্যুও একসঙ্গে। তাঁরা আমাদের থেকে ভিন্ন নয়।

আমিরুল মুমিনিন আপনার জন্য আমাদের অসংখ্য জীবন উৎসর্গ, আল্লাহ আপনাকে অসীম সাহসিকতা দান করেছেন।

গত রবিবার আমি কবিরওয়ালায় *খতমে বুখারিতে* মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তো গতকালই মাত্র আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন। আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে কী কথা হলো, তিনি কী বলেছেন?'

তিনি বললেন, 'আমরা তাঁকে বলি, আমিরুল মুমিনিন, পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। কাফির নেতৃবৃন্দ জোট বেঁধেছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিত হয়েছে; বাঁচার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। তারা যেকোনো মুহূর্তে হামলা করতে পারে। কিছুটা নমনীয় হোন।' সবকিছু শুনে সে মহান সাধক উত্তরে বলেন, 'আপনাদের দৃষ্টি আসবাবের ওপর; আর আমার দৃষ্টি আসবাবের স্রষ্টার ওপর।'

হে মুসলমানগণ, তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়া করেছেন, তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তোমাদের তৃতীয় উমর দিয়েছেন, তোমাদের উসামা দিয়েছেন, যার নামে পুরো বিশ্ব আজ থরথর করে কাঁপে। তোমাদের সত্যিকারের নেতৃত্ব মিলেছে, এখন জীবন উৎসর্গকারীদের প্রয়োজন। তোমরা উত্তম সেনাপতি পেয়েছ, এখন প্রয়োজন সিংহের মতো

ঝাঁপিয়ে পড়া। আল্লাহর দীনপ্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের ময়দানে এসে আবারও বদর-উহুদের দৃশ্যের অবতারণা করা।

একবার খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বলেছিলেন, '৬০ হাজারের জন্য তিনজনই যথেষ্ট; বরং একজনই।' এখন কমপিউটারের যুগ। আমরা দুর্বল; কিন্তু আমার রবের নির্দেশ—আঙুল হেলানো তোমার দায়িত্ব; অতঃপর দেখো আমার রহমতের নিদর্শন। তারা বলছে, এটা করব, সেটা করব। আমি বলছি, তোমরা কিছুই করতে পারবে না। হয়তো তোমাদের কাছে পারমাণবিক বোমা আছে, ক্রুজ মিসাইল আছে। তোমাদের কাছে সবকিছুই আছে; কিন্তু একটি জিনিস নেই। তোমাদের কাছে সেই চেতনা নেই, যা হৃদয় নাড়িয়ে দেয়। আমাদের ইমানি চেতনা আছে, আমরা কাউকে ভয় পাই না।

প্রিয় বন্ধুগণ, মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের কাজ বেরিয়ে পড়া, বিজয় দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব। সরকার বা মার্কিনরা কিছুই করতে পারবে না।

হে শাসকশ্রেণি, পুরো জাতির কণ্ঠ শুনুন। আপনারা ভাবছেন কীভাবে মার্কিনদের বিরোধিতা করব? হায়! আপনারা তাদের বিরোধিতার মুখে পড়তে রাজি নন; অথচ স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারি করতে প্রস্তুত। যদি কেউ বলে সবাইকে গৃহবন্দি করে দেবো, জেলখানায় বন্দি করে পুরো জাতিকে চুপ করিয়ে দেবো, তাহলে নিঃসন্দেহে সে ভুল বলেছে। আল্লাহর শপথ, যে এই কাজ ছেড়ে দেবে, পুরো জাতি তাকে ছেড়ে দেবে। পুরো জাতি আজ চুপ করে বসে থাকতে নারাজ। যে নেতা কথা বলতে পারে না, সে নেতৃত্বের অনুপযুক্ত। এমন নেতৃত্ব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন, আল্লাহ নতুন নেতৃত্ব তৈরি করে দেবেন।

নিজের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রেখে ময়দানে আসুন, আল্লাহ আপনাদের বিজয়ী করবেন। রাসুলের সাহাবিদের মতো, যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের কাছে না-ছিল ঢাল, না-ছিল তলোয়ার। মুখোমুখি হয়েছিলেন সশস্ত্র শত্রুবাহিনীর; কিন্তু তাঁদের ছিল ইমানি দৌলত, জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের তামান্না—এই ছিল তাঁদের পুঁজি। অতঃপর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে, কীভাবে ছোট ছোট বাহিনী বড় বড় দলকে আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরাজিত করে দিয়েছে। আজ ইতিহাস তৈরি করার সময়। আল্লাহর শপথ, যখন থেকে শুনছি কান্দাহার, কাবুল ও জালালাবাদে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কী অপরাধ তাঁদের? কেন তাঁদের হত্যা করা হচ্ছে? কেন তাঁদের কষ্ট

দেওয়া হচ্ছে? কেন তাঁদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে?

তাঁদের অপরাধ শুধু একটাই—তাঁরা বলেছে, আমরা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করি। তাঁরা আল্লাহকে একমাত্র পরাশক্তি মনে করে। ইসলামি আইনের বাস্তবায়নই তালেবানদের অপরাধ। আজকের বিশ্ব তাঁদের এই অপরাধের শাস্তি দিচ্ছে। কাফিরজোট তো এই অপরাধে তাঁদের শাস্তি দিচ্ছে; কিন্তু হে পাকিস্তানি শাসকরা, তোমরা তাঁদের কোন অপরাধের সাজা দিচ্ছ? আমেরিকা-ইসরাইল ও ভারতের দৃষ্টিতে বুঝলাম ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন করা অপরাধ। তারা ইসলামের বাতি নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু তোমরা কেন তাঁদের সাহায্য করছ? তোমরা তাঁদের কোন অপরাধের শাস্তি দিচ্ছ? তোমরা কি তাঁদের এই অপরাধের শাস্তি দিচ্ছ যে, তোমাদের সঙ্গে তাঁদের ২২০০ মাইলের দীর্ঘ সীমান্ত, তাঁরা সব সুখে-দুখে তোমাদের অংশীদার, বিপদে তাঁরাই তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল? যাঁরা তোমাদের আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়েছিল, যাঁরা বিশ্ব-পরাশক্তির পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল, আজ তোমরা তাঁদেরই হত্যাকারীদের সাহায্য করছ?

তোমাদের চিন্তা ভুল। হানাদাররা একদিন হামলা করে চলে যাবে; কিন্তু তারা আমাদের মাঝে শত্রুতার বীজ বপন করে দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতার বীজ বপনে তোমরা তাঁদের অংশীদার হয়ো না। নিজেদের রক্তের নজরানায় যাঁরা খিলাফত গড়েছে, সেই তালেবানদের রক্ত আজ কি এতই সস্তা হয়ে গেল?

এই ইসলামি সাম্রাজ্য, যা আল্লাহ বর্তমান যুগে পুরো বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি নিদর্শন হিশেবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। পুরো বিশ্ব বহুদিন পর একটি ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্থান দেখেছে, কাফিররা নিজেদের মুখের ফুৎকারে তা নিভিয়ে দিতে চাইবে। তাদের ফুৎকারে আমাদের অভিযোগ নেই; কিন্তু তোমরা কেন তা নিভিয়ে দিতে চাচ্ছ? তোমরা কেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছ? তোমরা কি ফিরে আসবে না? তাহলে শোনো, যদি তোমরা ফিরে না এসো, কোথায় তোমাদের সংবিধান, সেখানে কোথায় লেখা আছে বিদ্রোহের শাস্তি? আমি বিদ্রোহী। আমি বিদ্রোহের ঘোষণা দিলাম। যদি মার্কিনদের সঙ্গ দাও, তাহলে আমরাও তালেবানদের সঙ্গ দেবো। তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, পুরো জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবে। তোমরা ফিরে এসো, নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করো না। আমি মার্কিনদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলে তোমাদের কষ্ট হয়; অথচ তারা আমাদের

রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এতে তোমাদের বেদনা নেই। এত আত্মমর্যাদাহীন হয়ে বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন? পাকিস্তানের ভূমি কোনো আত্মমর্যাদাহীনকে আশ্রয় দিতে চায় না। আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা ব্যক্তিদের নেতৃত্ব। মার্কিন ডলারের প্রয়োজন নেই আমাদের। তোমরা ডলার খাও, আমরা তোমাদের জুতা খাওয়াব।

তোমরা নিজেদের ইতিহাস জানো? আলহামদুলিল্লাহ, পাকিস্তানি জাতি উলামায়ে দেওবন্দের নেতৃত্ব পেয়েছে। তোমরা আমাদের ইতিহাস জানো না, তোমাদের বাপ-দাদারা আমাদের ইতিহাস জানে। আমি আজ মার্কিন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় জানাব। এই মার্কিনদের ইতিহাস আপনারা জানেন না। যখন কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল, সে ইউরোপে এসে বলেছিল, 'এই ভূমি অত্যন্ত উন্নত, আবহাওয়া ভালো। চলো সেখানে যাই।' কেউ যেতে রাজি হয়নি। সবাই চিন্তা করার পর বলে, 'আমাদের জেলখানায় যে-সকল ছিনতাইকারী, খুনি, চোর-ডাকাত বন্দি আছে, তাদের নিয়ে আমেরিকা আবাদ করো।' আজকের মার্কিনরা সেই চোর-ডাকাতদের বংশধর, বেঈমান আত্মমর্যাদাহীনদের বংশধর।

হে চোরদের বীর্যের উত্তরাধিকাররা, তোমরা কী করে জানবে মুসলমানদের পরিচয়? কীভাবে জানবে মুসলমানদের শক্তি ও দুঃসাহসের পরিচয়? হে চোর-ডাকাত আত্মমর্যাদাহীন আসামিদের বংশধর, তোমরা ভালোভাবেই জানো, মার্কিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণের জন্য পাঠায় না, মার্কিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের মাংস ও মদের লোভে ময়দানে পাঠায়। আর মুসলমান মায়েরা তাঁদের সন্তানদের আত্মমর্যাদাবোধের সবক শেখায়। মুসলমান মায়েরা তাঁদের সন্তানদের শাহাদাতের তামান্নায় দুধ পান করায়। মুসলমান মায়েরা তাঁদের সন্তানদের যুদ্ধের কবিতা শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়।

শুনুন, হয়তো আজকের পরে এভাবে আমাদের সম্মেলন না-ও হতে পারে। রাতের শেষাংশে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে প্রতিজ্ঞা করে যাই। পৃথিবীর বুকে যদি পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকতে হয়, তাহলে তালেবানদের সহযোগী হয়ে থাকতে হবে। যদি আমাদের জীবিত থাকতে হয়, তাহলে থাকতে হবে বীরপুরুষের মতো। পাকিস্তানে মার্কিনদের আসার অনুমতি নাই, মার্কিনদের দোসরদেরও ক্ষমতায় থাকার অনুমতি নাই। সবাই প্রস্তুত থাকুন, যেকোনো সময় আহ্বানে সাড়া দিতে নিজেদের প্রস্তুত রাখুন।

শায়খুল হাদিস মাওলানা সলিমুল্লাহ খান

শায়খ উসামা বিন লাদেন কুফরি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য ঢালস্বরূপ ছিলেন। প্রতিটি ইমানদার ব্যক্তির মনেই তাঁর জন্য রয়েছে অবিরাম ভালোবাসা। তাঁর মৃত্যুতে প্রতিটি মুমিনের অন্তর আহত হয়েছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তাঁর জিহাদি কর্মকাণ্ড কবুল করুন। তাঁকে নিজের প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাঁর অবর্তমানে উম্মাহকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন।

মাওলানা ড. শের আলি শাহ আল মাদানি

শায়খ উসামা বিন লাদেন ইসলামি ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নাম। মদিনাতুর রাসুলের নুরানি পরিবেশে, রাসুলের শহর, ওহি অবতরণের জায়গা মদিনা মুনাওয়ারা বিশেষত মসজিদে নববিতেই হয়েছিল তাঁর ইলম অর্জন। তিনি ছিলেন ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। বিন লাদেন কোম্পানি সৌদিআরবের বিলিয়নিয়ার কোম্পানিগুলোর অন্যতম। যৌবনকাল তিনি কাটিয়েছেন আফগান জিহাদে। আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। জালালাবাদ, তোরাবোরাসহ বিভিন্ন পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করেছেন মুজাহিদদের জন্য। আরব যুবকদের মধ্যে তৈরি করেছেন জিহাদের অনুভূতি ও উদ্দীপনা।

তিনি যখন রুশদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, তখন পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে ছিলেন একজন বীর। যখন মদিনায় গিয়ে সেখানকার যুবকদের জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং তাঁর জিহাদি বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারো আরব যুবক আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তখনো তিনি বীরই ছিলেন। কিন্তু মার্কিনরা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে, তখন হঠাৎ করেই তিনি হয়ে যান সন্ত্রাসী। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতা ও কুরআন-হাদিসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

তিনি বর্তমান যুগের বড় একজন মুজাহিদ। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ করে তাঁর মিশন সম্পূর্ণ করেছেন। আফগানিস্তানে মার্কিনরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। তাঁর মৃত্যু কোনোভাবেই তাদের বিজয় নয়। আমরাও তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত নই; বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, তিনি মার্কিনদের হাতে গ্রেপ্তার হননি; তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন।

মুফতি দাউদ
জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর

শায়খ উসামা বিন লাদেন ছিলেন একজন সত্যিকার মুজাহিদ। তিনি মুজাহিদের জীবন কাটিয়েছেন এবং একজন মুজাহিদের একান্ত কাম্য শাহাদাতের মর্যাদাও তিনি অর্জন করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁকে কবুল করেছেন। বাকি কাফিরদের কথা—তারা কীভাবে বুঝবে সফলতা কী? মুসলমান কোনো কষ্টে শোকাহত হয় না; তাঁরা প্রতিশোধ নেয়। কাফিররা আমাদের এই সাহসী মুজাহিদকে শহিদ করেছে, আমরা এর প্রতিশোধ নেব। আমরা শিয়াদের মতো শোক পালন করব না।

নিজেদের পরিবর্তন করুন, যেভাবে সম্ভব জিহাদে অংশগ্রহণ করুন। ইমাম আনওয়ার আল আওলাকির গ্রন্থে জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি পন্থা বর্ণনা রয়েছে—তা পড়ুন। সে অনুযায়ী জিহাদে অংশগ্রহণ করুন। নিজেকে সেই কাফেলার সঙ্গী বানান, যে কাফেলা বিন লাদেনের দর্শন লালন করে। ইসলামের বিজয়ী কাফেলা সঙ্গী হোন।

মাওলানা আবদুল মালিক
মারকাজে উলুমে ইসলামিয়া লাহোর

তিনি ছিলেন ইসলামের একজন বীর সিপাহসালার। বর্তমান যুগের এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিয়েছেন; এমনকি জীবন পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন। বর্তমানে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া বিরল। যদি সত্যিকারার্থে দেখা হয়, তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর অনুসরণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমান যুগে তিনি এমন এক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার মাধ্যমে শুধু জিহাদের সুন্নাত পুনর্জন্ম দেননি; বরং সারা বিশ্বের সামনে মুসলমানদের মর্যাদা ও কাফিরদের কাপুরুষতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। কাফিররা মুসলমানদের ওপর নিজেদের দখলদারত্ব শক্তিশালী করতে চায়। তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে তারা নিজেদের লক্ষ্যে সফল বলে দোতে চায়। তাদের পথে বাধা দেওয়ার কেউ নেই, তারা যা চাইবে তা করতে পারবে; কিন্তু তাদের দুর্বলতা তো এভাবেই প্রমাণিত হয়, তারা একজন মানুষকে কী পরিমাণ ভয় করত!

তাদের আনন্দ আজ তাদের অসহায়ত্ব প্রমাণ করছে। বিন লাদেনের ব্যক্তিত্ব আমাদের নিজেদের জীবনের সবকিছুই দীনের জন্য খরচ করার শিক্ষা দেয়। মুসলমানদের শত্রুদের মুসলমানদের ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন। আল্লাহর ও আল্লাহ রাসুলের জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

মুফতি আবু মুহাম্মাদ আমিনুল্লাহ পেশোয়ারি

শায়খ উসামা বিন লাদেন মুসলমানদের হৃদয়ের স্পন্দন। তিনি বিশ্বের সকল শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। খালিস তাওহিদের ওপর আমল করে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতিকে জিহাদের মাধ্যমে উন্নতির সোপান ডিঙাবার পন্থা শিখিয়েছেন। তিনি মার্কিনদের বিরুদ্ধে এমন এক সময়ে জিহাদের ঘোষণা করেছিলেন, যখন পুরো দুনিয়া ছিল তাদের ভয়ে প্রকম্পিত। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে যুগের সামনে মুসা আ.-এর ভূমিকা পালনের তাওফিক দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করুন।

মাওলানা মুফতি ইসমাইল
জামিয়া ইসলামিয়া রাওয়ালপিন্ডি

আজ কাফিরবিশ্ব তথা ইউরোপ-আমেরিকা বিন লাদেনের শাহাদাতে আনন্দ উদযাপন করছে। ইসরাইলে মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। তাঁর শাহাদাতে পুরো কাফিরবিশ্বের আনন্দ প্রকাশ করা সত্যের পথে তাঁর আত্মত্যাগের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমাদের শাসকরা যদি কাফিরদের আনন্দে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তারাও কাফিরদের সঙ্গী। মুসলমান কখনো কাফিরের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

মাওলানা সাইয়িদ জিয়াউদ্দিন

বিভিন্ন গণমাধ্যম শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতকে 'ধ্বংস হওয়া' বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আজ্ঞাবহ সাংবাদিকরা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ করা মর্দে মুজাহিদের শাহাদাতে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করছে। অথচ কুরআনে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য এ ধরনের শব্দের ব্যবহার হয়েছে। নিহত ব্যক্তি কাফির হলে তার ব্যাপারে 'ধ্বংস হয়েছে' বলে শিরোনাম করা যায়। অন্যদিকে মৃতের অবস্থা সন্দিগ্ধ হলে তার ব্যাপারে 'নিহত হয়েছে' বলে সংবাদ প্রকাশ করা যায়। আর মুমিন ব্যক্তি কাফিরদের হামলায় হত্যার শিকার হলে তাঁর ব্যাপারে 'শাহাদতবরণ করেছেন' বলে শিরোনাম করতে হবে। শায়খ উসামা বিন লাদেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কাফিরশক্তির অভিযানে হত্যার শিকার হয়েছেন, তাই নিঃসন্দেহে তাঁকে শহিদে আজম বলা যায়।

বিন লাদেনকে মুসলিমবিশ্বের হিরো বলে অভিহিত করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মজলিশে আহরারের নেতা সৈয়দ আতাউল মুমিন বুখারি

মজলিশে আহরারের নেতা মাওলানা সৈয়দ আতাউল মুমিন বুখারি বিন লাদেনের শাহাদাতের ব্যাপারে বলেন, 'শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতে পাকিস্তানি ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য মার্কিনদের দাসত্বের প্রমাণ বহন করে।'[৩১]

সিনেটর ড. খালিদ সমরু

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সিন্ধের জেনারেল সেক্রেটারি আল্লামা ড. খালিদ সমরু অ্যাবোটাবাদে বিন লাদেনের হত্যা অভিযানকে মার্কিন বাহিনীর সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করে এর তীব্র সমালোচনা করেন।

মাওলানা কাজি মুশতাক

জামিয়া ফারুকিয়া রাওয়ালপিন্ডি

সকল নবির ইমাম ও আমার নবির জন্মভূমি আরব। আরব বংশোদ্ভূত উসামা বিন লাদেন ... আহ! আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে ... আজ তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন। আমি আগেও বলেছি, আমাদের এই দীনের অস্তিত্ব তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। জিহাদের ধারাবাহিকতার জন্যও তাঁর উপস্থিতি আবশ্যক নয়। সকল নবির সরদার মুহাম্মাদ সা. এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন,

> কিয়ামতদিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে জিহাদ চলমান থাকবে। কোনো ন্যায়পরায়ণ বা অত্যাচারী শাসক জিহাদের পথ রুদ্ধ করতে পারবে না।

এটিই আমার নবির কথা। আমি কসম করে বলছি, পুরো পৃথিবী যদি মার্কিনদের শক্তিতে পরিণত হয়, যদি তারা পুরো পৃথিবী উলটপালট করে দিতে সক্ষম হয়, তবু আমার প্রভুর কসম, মুহাম্মাদের বাণী—কেউ তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারবে না। রাসুল সা. বলেন,

> আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এ ধর্মের হিফাজত করবে, ধর্মের জন্য জিহাদে লিপ্ত থাকবে। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার তাদের বাধাগ্রস্ত করবে না বা কোনো অন্যায় বিচার তাদের থামিয়ে দেবে না।

---

৩১ *রোজনামা ইসলাম* : ৪ মে ২০১১।

কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে, যারা জিহাদ অব্যাহত রাখবে। আমার নবি বলেন,

> ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত।[৩২]

আলিমগণ বলেন, হাদিসে বর্ণিত ঘোড়া বলতে জিহাদের কাজে ব্যবহৃত ঘোড়া বোঝানো হয়েছে। এখান থেকে এ-ও বোঝা যায়, জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়াও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, জিহাদও তত দিন অব্যাহত থাকবে।

বিন লাদেনের শাহাদাতে জিহাদ থেমে যাবে না, মসজিদ-মাদরাসাও বন্ধ হবে না। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে না। দীনের অস্তিত্ব কোনো আলিম, হাফিজ বা মুজাহিদের সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর হিফাজত করব। [সুরা হিজর : ০৯]

কুরআনই আমাদের ধর্ম, কুরআনই আমাদের শরিয়ত। মহান প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই এর হিফাজত করবেন। তবে দীনের হিফাজতের জন্য নিজেদের নিবেদিত করতে পারা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের।

বিন লাদেন দীনের হিফাজতে নিজেকে নিয়োজিত করে শাহাদাতধন্য হয়েছেন। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। তিনি ছিলেন সৌদিআরবের বিলিয়নিয়ার পরিবারের যুবরাজ। বিলিয়ন ডলারের বিলাসী জীবন ছেড়ে পাহাড়ি গুহার সাদাসিধে জীবন বেছে নিয়েছিলেন। সত্যিকারের মুজাহিদ তিনি, যিনি সবকিছু আল্লাহর দরবারেই সমর্পিত করেন। কাফিরশক্তির সামনে তিনি মাথা নত করতে শিখেননি। তিনি মার্কিনদের জুলুম-নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে, আমরা কখনো কাফিরবিশ্বের চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে পারি না। কুরআন-সুন্নাহ বা জিহাদ ছেড়ে দিতে পারি না। কোনোভাবেই মুহাম্মাদ সা.-এর নির্দেশনা ছেড়ে দিতে পারি না। পৃথিবীর কারও দাসত্ব স্বীকার করি না। আর এতেই আমেরিকা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের সন্ত্রাসবাদীসহ আরও বিভিন্ন তকমা দিচ্ছে। আমাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উগ্রপন্থি ও সন্ত্রাসবাদী শব্দ ব্যবহার করছে। এ সকল শাসকরাই মুসলিমবিশ্বের লড়াকু সৈনিকদের শাহাদাতকে তাদের ধ্বংস মনে করে। বিন লাদেন ধ্বংস হয়েছে! কাবার রবের কসম, একজন শহিদকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করে তোমরা বরং ধ্বংস হয়েছ। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধারণা করে, বস্তুত তারাই ধ্বংস হয়েছে। তারাই ধ্বংস হয়েছে, যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে বেআদবিমূলক শব্দ ব্যবহার করে।

---

৩২ *সহিহ বুখারি* : ২৮৪৯।

বিন লাদেন ধ্বংস হয়েছেন? তাহলে কি উহুদের ময়দানে নাক-কান কেটে নেওয়ায় এবং কলিজা বের করে চিবানোয় আল্লাহর রাসুলের প্রিয়তম চাচা শহিদ হামজা রা. ধ্বংস হয়েছিলেন? রাসুলের প্রিয়তম সাহাবি মুসআব বিন উমায়ের রা.; উহুদের ময়দানে ধ্বংস হয়েছিলেন? আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রা. ধ্বংস হয়েছিলেন? যে-সকল নবি কাফিরদের করাতে দিখণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরাও কি ধ্বংস হয়েছিলেন? ব্যর্থ হয়েছিলেন? রাসুলের কলিজার টুকরো হুসাইন রা.-ও কি কারবালার প্রান্তরে সহযোদ্ধাদের নিয়ে ধ্বংস হয়েছিলেন? কুরআন তো বলে, ওবামারা নিহত হলে ধ্বংস হবে। বুশ মৃত্যুবরণ করলে সে ধ্বংস হবে। জারদারি-গিলানি মৃত্যুবরণ করলে তারা ধ্বংস হবে। কাবার রবের শপথ, ইসলামের পথে যাঁরা যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছে, কুরআন বলে, তাঁরা ধ্বংস হয়নি। আমাদের শাসকরা বলে, আমরা বিজয়লাভ করেছি, বস্তুত তারা লাঞ্ছনাকেই বিজয় ধরে নিয়েছে।

বিন লাদেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি পালিয়ে যাননি, মাথানত করেননি। তিনি ধূমকেতুর মতো জিহাদের ময়দানে এসেছিলেন আর শাহাদাতের মুকুট ধারণ করে রবের সান্নিধ্যে গিয়েছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। তাঁর মতো লোকদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, 'খবরদার! যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা বুঝো না।' আমার রবের কসম, বিন লাদেন শাহাদতবরণ করেছেন; কিন্তু তিনি জীবিত।

যারা বলছে, বিন লাদেন ধ্বংস হয়েছেন, তারা একটু ভাবুন। কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যমতে, আমার রব দু-ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে যদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, মানুষ বহু অপরাধ করে। তবে দু-ধরনের অপরাধকারীর বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা করছি।

১. সুদের কারবারে জড়িয়ে পড়া। সুদখোর যদি সুদের লেনদেন থেকে নিবৃত্ত না হয়, আল্লাহ বলেন, 'আমার ও রাসুলের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রইল।' [সুরা বাকারা :২৭৯]
২. আল্লাহর প্রিয়জনের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা। *বুখারি শরিফে* এসেছে, 'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো অলির সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব।[৩৩]

নিঃসন্দেহে উসামা বিন লাদেন আল্লাহর অলি। তিনি এ যুগের সেরা মুজাহিদ। তিনি

---

৩৩. *সহিহ বুখারি* : ৬৫০২।

শাহাদাতবরণ করেছেন। ইহকাল ত্যাগ করেছেন। সম্মানের মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহর বন্ধুত্বের মর্যাদা অর্জন করেছেন। আমার নবির পয়গাম, আল্লাহ্ বলেন, ' ব্যক্তি আমার কোনো অলির সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব

পাকিস্তানের অধিবাসী ও শাসকরা, তোমরা মার্কিনদের কথার বিরোধিতা পারো ন আমার রবের কসম, আমেরিকার শক্তি কোনো শক্তি নয়। আমার রব বলেছেন 'তোমরা আমার বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, তোমাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব।' পাকিস্তানের কোনো বাহিনী বা পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি কী রাব্বে জুলজালালের দেওয়া যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে? মোকাবিলা করবে? আর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই-বা কী হবে? পরিণতি তো হবে ফিরআউনের মতো!

একটু চিন্তা করো, কী হবে পরিণতি। তোমরা গাদ্দারি করেছ। তোমরা শত্রুদের বিন লাদেনের তথ্য দিয়েছ। তোমাদের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। একবার বলছ, আমাদের গোয়েন্দাদের তথ্যমতেই আমেরিকা এই অভিযান চালিয়েছে। আবার বলছ, আমাদের অবগত না করেই মার্কিনরা অভিযান পরিচালনা করেছে। বাস্তবতা যা-ই হোক, উভয়টিই তোমাদের জন্য মানহানিকর। আমরা আল্লাহর বান্দা, আমরা মার্কিনদের দাস নই। আমরা পৃথিবীর কারও দাসত্ব স্বীকার করি না। এটি আমাদের গর্ব। বিন লাদেনের সাহসিকতায় আমরা গর্ববোধ করি। আমরা তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে গর্বিত।

কোন পথে হেঁটেছেন বিন লাদেন? এটি কোনো সাধারণ পথ নয়। ইমামুল আম্বিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ নবি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, আমার নবি মুহাম্মাদ সা. শপথ করে বলেন,

> যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ; আমি কামনা করি, যেন আমি অবশ্যই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহিদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়, আবার শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহিদ করা হয়।[৩৪]

এটি আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা। উসামা বিন লাদেনও এই আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন। আমরা তাঁকে তাঁর শাহাদাতে অভিনন্দন জানাই।

উসামা ইসলামের, ইসলাম উসামার নয়

হাকিম মুহাম্মাদ আখতার সাহেবের নাতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহিম

আল্লাহ কোনো মানুষের সঙ্গে ইসলামের অস্তিত্ব শর্তযুক্ত করেননি। যতদিন উসামা

---

৩৪ *সহিহ বুখারি* : ৭২২৭।

বিন লাদেন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইসলাম থাকবে; আজ তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন, ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এটা কাফিরদের ভ্রান্তবিশ্বাস। বিন লাদেন ইসলামের একজন; ইসলাম তাঁর নয়। আজ পুরো বিশ্ব তাঁকে জেনেছে, তা-ও ইসলামের কারণেই। বিশ্বের মুসলমানরা তাঁকে ভালোবাসে, তা-ও ইসলামের কারণেই। আজ কাফিররা অন্তর্জ্বালায় ভুগছে, মুসলমানরা কেন তাদের ভালোবাসে না? মুসলিমবিশ্বের শাসকরা ভাবছে, কেন মুসলমানরা তাদের ভালোবাসে না। তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামের ওপর চলে এসো, আজও পাকিস্তানের ১৮ কোটি জনগণ তোমাদের ভালোবাসতে প্রস্তুত। আজ মানুষ তোমাদের কেন গালি দেয়? তোমাদের তো লজ্জা নেই। রাসুল সা. বলেন,

যখন তোমার লজ্জা চলে যায়, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো।

আজ তারা পাকিস্তানের ভেতরে একজন মুসলমান হত্যা করতে অভিযান চালিয়েছে; প্রশ্ন তোলারও কেউ নেই। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, 'রাসুলের একজন সাহাবি মক্কার এক সরদারের মেহমান হয়ে মক্কায় অবস্থান করেন। একদা তিনি দেখলেন তাঁর মেজবান ভরদুপুরে তাওয়াফ করে ফিরছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন,

—কোথা থেকে ফিরছ?

—আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে ফিরছি। তুমি কি তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছ?

—হ্যাঁ, আমি ধর্ম ত্যাগ করেছি।

—তার মানে আমরা মক্কাবাসী যদি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, তাহলে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?

—অবশ্যই।

—আমি কখনোই এমনটি হতে দেবো না।

—কেন?

—এসো আমরা পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হই। কোনো কাফির তোমাকে হত্যা করতে এলে আমি তোমার পক্ষে দাঁড়াব; আর কোনো মুসলমান আমাকে আক্রমণ করলে তুমি আমার তরফ থেকে প্রতিরক্ষা করবে।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

উহুদযুদ্ধের ময়দান। কাফির ও মুসলিমবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি। এই কাফিরকে নাগালে পেয়ে মুসলমানরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সাহাবি

এসে তার ওপর শুয়ে পড়েন। সবাই বললেন, 'সে তো কাফির।' তিনি জানালেন, 'তার সঙ্গে আমার চুক্তি আছে।' সাহাবিগণ তাঁকে জোর করে সরিয়ে দিলেন এবং কাফির ব্যক্তিকে হত্যা করলেন। রাসুল সা. পরে বুঝিয়ে দিলেন, 'কাউকে এমন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া অনুচিত।'

এই ছিল তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধ। একবার কাউকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে জীবন দিয়ে হলেও তা রক্ষা করতেন। আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের নিরাপত্তার নামে প্রতারিত করা হচ্ছে; অথচ ইসলামি জীবনব্যবস্থায় পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে। আজ মুসলমানদের জীবনের নিরাপত্তা নেই, সম্পদের নিরাপত্তা নাই। বস্তুত ওই জীবনব্যবস্থা ছেড়ে দিয়েছি, যা আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

কোন জীবনব্যবস্থা নিরাপদ? ইসলামি জীবনব্যবস্থায় আল্লাহ যে নিরাপত্তা রেখেছেন, পৃথিবীর কোন ধর্মে তা আছে? আজ মুসলমানরা ইসলামের সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। প্রশ্ন তোলে—মাওলানা কোন ইসলাম? তালেবানি ইসলাম? নাউজুবিল্লাহ, তালেবানের অস্তিত্ব আগে নাকি ইসলামের অস্তিত্ব? তালেবানের মাধ্যমে ইসলাম পরিচিত হয়নি; বরং ইসলামের মাধ্যমেই তালেবান পরিচিত হয়েছে।

আজকের মানুষ বলে মুসলমানরা সন্ত্রাসী; অথচ ইসলাম যে নিরাপত্তার বার্তা দিয়েছে, অন্য কোনো মতবাদ তা দিতে পারেনি। আফগানিস্তান এর স্পষ্ট উদাহরণ। রুশবাহিনী সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরও সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হয়নি; ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হয়েছে, গৃহযুদ্ধ হয়েছে, মুসলমানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। শুধু ক্ষমতার কারণেই সামান্য সম্পদের জন্য একে অন্যকে হত্যা করত।

আফগানসীমান্তে প্রবেশের আগে মানুষ নিজের হাতের ঘড়িও লুকিয়ে ফেলত, যেন এই ঘড়ির জন্য তাকে হত্যা করা না হয়; কিন্তু আল্লাহ যখন তালেবানদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে তখন নিরাপত্তা ফিরে আসে। প্রকৃত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন নিরাপত্তা, যার ফলে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গাত্রজ্বালা শুরু হয়। বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের নিরাপত্তা ও শান্তির দিকগুলো ফুটে উঠলে তারা দলে দলে ইসলামগ্রহণ করতে পারে—এই শঙ্কায় তাদের অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ জন্য তারা ইসলামি হুকুমত ধ্বংস করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

গাজি আবদুর রশিদ—শরিয়ত নয়তো শাহাদাত—স্লোগান নিয়ে শাহাদাতবরণ করেন; কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তা আমাদের জন্য বসবাসের অযোগ্য দেশে পরিণত হবে। আমাদের অন্যায় ভোগবিলাস ও বিনোদন বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সামনে-পেছনে বিশাল

সিকিউরিটি ফোর্সের গাড়ি দৌড়াবে না। তাই তারা ইসলামি শাসনব্যবস্থার ওপরই প্রশ্ন তুলে বলে, এটি হতে দেওয়া যাবে না। এমন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, যাতে শিরশ্ছেদের বিধান থাকে, যে জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আইন থাকে। আমাদের এমন জীবনব্যবস্থা প্রয়োজন, যেখানে স্বাধীনভাবে অন্যায় ভোগবিলাস করা যাবে।

আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা কেন পরাজিত? আজকের এই পরিস্থিতির বিবরণ রাসুল সা. চৌদ্দশ বছর আগেই দিয়েছিলেন। রাসুল সা. বলেন,

> অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতিসমূহ তোমাদের উপর আক্রমণের জন্য একে অপরকে এভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে মেহমানদের দস্তরখানে আসতে আহ্বান করা হয়।' তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে?' তিনি বলেন, 'না, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অধিকই হবে; কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মতো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে অলসতার সৃষ্টি করে দেবেন।' তখন জনৈক সাহাবি বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, অলসতার সৃষ্টি কেন হবে?' তিনি বলেন, 'দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়ের জন্য।'[৩৫]

অথচ মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহারস্বরূপ, যার মাধ্যমে সে তার রবের সঙ্গে মিলিত হয়। কোনো মুমিনের জন্য এরচেয়ে বড় মর্যাদার আর কী আছে? নিজের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে বড় পাওনা আর কী আছে? আজ আমরা আল্লাহকে ভুলে গেছি আর আল্লাহও দুনিয়ার হাতে আমাদের তুলে দিয়েছেন। তাই আমাদের যখন পৃথিবীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঠোকর খেয়ে আবার ফিরে আসছি। যেখানে যাই সেখান থেকেই ধিকৃত হই। কারণ, পৃথিবীর ভালোবাসা ও মৃত্যুর ভয়। আল্লাহর নবি বলেন,

> তোমরা পৃথিবীকে ভালোবাসো! আর আল্লাহ বলেন, জীবন তোমার নয়; আমার। আমি যাকে ইচ্ছে তাকে দান করি।

জীবনের মালিক কে? আমাদের ধনসম্পদের মালিক কে? আমাদের সুস্থতা কার হাতে? সবকিছুরই মালিক আল্লাহ। যাকে চান তাকে দান করেন; আর যার থেকে চান তার থেকে ছিনিয়ে নেন। এ জীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। সৌভাগ্য তাদের, যারা আল্লাহর রাস্তায় ইমান নিয়ে চলে যায়; আর হতভাগা সে-সকল লোক, যারা

---

৩৫ *সুনানু আবি দাউদ*: ৪২৪৭।

ইমান নিয়ে যেতে পারে না। আফসোস তাদের জন্য, যারা আল্লাহর দরবারে ইমান নিয়ে যেতে পারেনি। কবরে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে না—তুমি পৃথিবীতে কয়টি কলকারখানা বানিয়েছ বা কোন পদে ছিলে?

আজ মুসলমানরা কুরআন রেখে দিয়েছে মসজিদের ভেতর। গিলাফবন্দি করে রেখেছে আলমারিতে। ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রায় তারা প্রভাবিত। ইউরোপ যা শেখাচ্ছে, তা-ই বলছে। বস্তুত মানুষ প্রতিদিন যা দেখবে, তা-ই তার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করবে। আর যখন মুসলমানরা কাফিরদের চাকচিক্য দেখে, তাদের দিকেই আকৃষ্ট হয়। অথচ আল্লাহ বলেন,

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদী হয়ে থাকো। [সুরা তাওবা : ১১৯]

তোমরা যখন সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকবে, সত্যান্বেষীদের সঙ্গী হবে, তোমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে; আর যখন তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে অবস্থান করবে, একসময় তাদের অভ্যাস, তাদের আচরণ তোমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে। আজ মুসলমানরা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আগ্রহী; কিন্তু কুরআনের বাণী জানতে নারাজ। কুরআন বলছে,

> হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নিজেদের বন্ধু বানিয়ো না। [সুরা আলে ইমরান : ২৮]

আজ আমাদের ইমান এতই দুর্বল যে, কোনো বিপদাপদেই আমরা আল্লাহমুখি না হয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের শরণাপন্ন হই, তাদের সাহায্য কামনা করি।

একটু চিন্তা করুন, বিলাল হাবশি রা.-এর কথা। তাঁকে আগুনের মতো জ্বলন্ত বালির উপর এমনিতেই শোয়ানো হয়নি। তাঁর অপরাধ ছিল—তিনি বলেছিলেন, 'আহাদ, আহাদ—আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।' আজও মুসলমানদের শহিদ করা হচ্ছে। তাদের অপরাধ কী? তারা শুধু এই বলে—'তোমরা আমাদের প্রভু নও, আমাদের প্রভু আল্লাহ।' আল্লাহর প্রভুত্বের ঘোষণায় মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদারেরা রাগান্বিত হয়। আর আল্লাহ বলেন,

> এরা পশু নয়; বরং পশুর চেয়েও অধম। [সুরা আরাফ : ১৭৯]

কিয়ামতের দিন পশুদের হিসাবনিকাশ হবে না; কিন্তু ওই পণ্ডিতদের হিসাবনিকাশ হবে।

পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দা—তিনি সাদা হোন বা কালো—যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, আল্লাহ রহমতের আভায় তার চেহারা

আলোয় ঝলমল করে। হাদিসে বর্ণিত আছে,

> যখন কোনো মুমিন বান্দার রুহ কবজ করা হয়, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তার সামনে জান্নাত তুলে ধরা হয়। তিনি জান্নাতের সুন্দর দৃশ্য দেখতে থাকেন। তার রুহ নিজেই জান্নাত-অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। পক্ষান্তরে যখন কোনো কাফির ব্যক্তির রুহ কবজ করা হয়, তার সামনে জাহান্নামের বিভীষিকাময় দৃশ্য তুলে ধরা হয়।

যে-সকল কাফির আফগানিস্তানে নিহত হচ্ছে, এ জন্যই তাদের আকৃতি শূকরের মতো বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। একদিন না যেতেই তাদের মৃতদেহ থেকে উৎকট দুর্গন্ধ আসতে শুরু করে। এসব কি মুসলমানদের ষড়যন্ত্র? আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। তার কবরের মাটিকেও মানুষ সম্মান করে। যে মাটিতে তার রক্ত পতিত হয়, এ রক্ত সাধারণ রক্ত নয়। এ রক্ত আল্লাহর এতই প্রিয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ শুধু সরকার নয়; পুরো বিশ্বকে পরিবর্তন করে দেন।

আজও বিশ্বের মুসলমানরা যেখানেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছেন, সংখ্যায় নগণ্য হলেও ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হাতে তাদের লাঞ্ছিত হতে হয় না। আফগানিস্তানের অবস্থাই দেখুন। সেখানকার মুজাহিদরা ঘোষণা দিয়েছেন, 'আজকের পর কোনো আলোচনা হবে না, এই গ্রীষ্মে আমরা বদরযুদ্ধের স্মরণে লড়ব। বদরযুদ্ধের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করব।'

আমাদের মুসলিম শাসকরাও কাফিরদের বলছে, 'বিন লাদেনের ব্যাপারে আপনাদের অভিযান যথার্থ।' নাউজুবিল্লাহ, যেন তাদের কাছে ওহি এসেছে। বন্ধুরা, দুনিয়ার জীবন কদিনের? আমি বলি, বিন লাদেন শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন। এ মর্যাদা কোনো কাফির বা মুনাফিকের নসিব হয় না। এটি শুধু মুমিনদের জন্য নির্ধারিত।

হজরত উমরের শাসনামল। একবার তিনি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-কে ৬০ হাজার সৈন্যের সেনাপতি বানিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। আবু উবায়দা, যাঁর ব্যাপারে রাসুল সা. বলেছিলেন, 'এই উম্মাহর সবচেয়ে বড় আমানতদার।' ৬০ হাজারের এ বাহিনী লড়তে রওনা করছিল ৬০ লাখ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে, যাদের অগ্রণী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল ১০ লাখ। সেখানে পৌঁছে মুসলমানরা নিজেদের তাঁবু তৈরি করেন।

এই ছিল আমাদের সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তির ইতিহাস। আবু উবাইদা রা. শত্রুবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করতে গুপ্তচর পাঠালে তারা ফিরে এসে জানায়, হিরাক্লিয়াস ৬০ লাখ সৈন্যের বাহিনী পাঠিয়েছে। এবার তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে ডেকে পাঠান। আবু উবায়দা বললেন, 'খালিদ, রোমানরা ৬০ লাখ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আসছে। তাদের অগ্রণী বাহিনী-ই ১০ লাখ সৈন্যের। তাদের রুখে দিতে কত সৈন্য লাগবে আপনার?'

আজ মুসলিম নিপীড়নকারী মার্কিনদের মোকাবিলা করতে বলা হলে আমরা ভয় পেয়ে যাই। তোমাদের বক্তব্য, আমরা প্রস্তরযুগে ফিরে যেতে চাই না! আমরা যদি মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, আমাদের রাস্তা করে দেবে কে? প্রগতি হবে কীভাবে? প্রগতি তো আল্লাহর কাছে। তিনি যাকে চান তাকে প্রগতি দান করেন। যার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকবে, সে-ই বিজয়ী হবে।

তারা মার্কিনদের সম্মানিত মনে করে। তারা যদি সম্মানিত হতো তাহলে কি পুরো বিশ্ব থেকে ভিক্ষা চাইত? আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন, সত্য-সঠিক বোঝার ক্ষমতা দিন। যা কিছু ঘটছে, অত্যন্ত দুঃখজনক। আল্লাহ্ আমাদের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শাসক দান করুন, যে আমাদের ইমানের হিফাজত করতে পারবে। আল্লাহ্ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

বিন লাদেনের শাহাদাত লক্ষ শাহাদাতের চেয়ে বড়

মাওলানা আবদুস সাত্তার, মসজিদে বায়তুস সালাম, ডিফেন্স করাচি

বর্তমান বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাত অন্যতম একটি ঘটনা। একদিকে কুরআন-হাদিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মুসলিম প্রজন্ম দুঃখ-ভারাক্রান্ত, অপরদিকে আলহামদুলিল্লাহ, এই ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের ইমান বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছে, আল্লাহ বর্তমান যুগেও এমন সব মুসলমান মা তৈরি করেছেন, যাঁদের রাজপুত্ররা আল্লাহর দীনের জন্য নিজেদের আত্মোৎসর্গ করতে পারে। যাঁদের মধ্যে সাহাবি-জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। যে প্রজন্ম এই বিশ্বাস ধারণ করে, আল্লাহ আজও এমন ব্যক্তিদের অস্তিত্ব রেখেছেন, যারা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবিগণের জীবনাদর্শকে সফলতার মানদণ্ড মনে করে। যারা এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আনন্দিত হয়।

মানুষ যেখানে জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতার নামে জীবন উৎসর্গ করে, সেখানে এই আরব-বংশোদ্ভূত মহামানব কান্না করেন আফগানিস্তানের জন্য, দুশ্চিন্তা করেন ফিলিস্তিন, তানজানিয়া ও আলজেরিয়ার মুসলমানদের জন্য। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন হারামাইন ও বায়তুল মাকদিসে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দখলদারত্ব দেখে। মুসলমানরা তাঁর কীর্তি দেখে আশ্চর্যবোধ করেন—আল্লাহ এই শতকেও এমন মহামানবের জন্ম দিয়েছেন। আজ মানুষ সামান্য টাকার জন্য নিজের ভাইকে যেখানে জবাই করতে দ্বিধা করে না, সেখানে আরবের এই ধনাঢ্য যুবক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর রাস্তায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন। তাঁর এই দর্শনই রাসুলের দর্শন।

হয়ে পড়ে। টিভি স্ক্রিনে জ্ঞানহীন ধর্মবেত্তাদের আলোচনায় অনেক সময় নিজের ইমানও খুইয়ে বসে। কুরআন-হাদিস ও সাহাবিগণের জীবনাদর্শ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় নিজেদের ইমানটাও হিফাজত করতে পারে না। যখনই এমন কোনো ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, দু-ধরনের মানুষের দেখা মেলে।

প্রিয় বন্ধুগণ, এটি ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগ। আপনারা নিজেদের ও পরিজনদের ব্যাপারে সজাগ থাকুন। শুধু সালাত পড়াই যথেষ্ট নয়। শুধু হজ করা ও আল্লাহর ঘরে ইতিকাফ করেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। নিজের মেধা-মননের দিক থেকেও পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া জরুরি, অন্যথায় চিন্তাগত কুফরির শিকার হতে হবে।

এসবের অনুধাবন নিজের মধ্যে তৈরি করলে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের শাহাদাতের মর্যাদা বুঝে আসবে, যা মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে। এটিই আল্লাহর অনুগ্রহ। শাহাদাতের বরকত সীমাহীন। এ ঘটনার পর কত হাজার যুবক পাপকাজ থেকে তাওবা করেছেন। কত মা-বোন পার্থিব জীবন থেকে বিমুখ হয়েছেন। অসংখ্য মা-বোন নিজের সন্তানদের আল্লাহর দীনের মর্যাদা সমুন্নত করতে লালনপালন করছেন এবং আল্লাহর জন্য আত্মত্যাগী হতে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করছেন।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'শহিদের মৃত্যু জাতির জন্য জীবনীশক্তি।' তিনি সত্য বলেছেন। শাহাদাতের মাধ্যমে কোনো জাতি ধ্বংস হয় না; বরং তাদের পুনর্জন্ম হয়; কিন্তু শত্রুদের প্রচারমাধ্যম বিন লাদেনের শাহাদাতের ঘটনা মিথ্যা প্রচারণায় ঢেকে দিতে চায়, যেন মুসলমানদের সামনে তাদের সাহসী বীরদের বিজয়গাথা সমুজ্জ্বল না হয়। যেন মুসলমানদের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার না হয়; কিন্তু সত্যিকারের মুসলমানরা কুরআনের আলোয় পথ চলে, রাসুলের জীবন থেকে আদর্শ খোঁজে ও সাহাবিগণের চিন্তাভাবনা দর্শন হিশেবে লালন করে।

মাওলানা মুহাম্মাদ সুলায়মান বালাকোটি

কল্পনায় আমি শায়খ উসামা বিন লাদেনের আত্মত্যাগে মুসআব বিন উমায়েরের দৃশ্য দেখতে পাই। মুসআব বিন উমায়ের রা. মক্কার ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু দীনের ছোঁয়ায় সব ধরনের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেন। সর্বদা রেশম ও কিংখাবের পোশাকে অভ্যস্ত মুসআব একদা তালিযুক্ত চামড়ার পোশাকে রাসুল সা.-এর দরবারে এলে তাঁকে দেখে রাসুলের দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, 'আমি মক্কানগরীতে তার চেয়ে সুদর্শন ও উত্তম পোশাক পরিহিত কোনো যুবক দেখিনি; অথচ আল্লাহর জন্য আজ তাঁর শরীর ও পোশাক ধুলোমলিন।'

মুসআব বিন উমায়ের তিন বার হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহর জন্যই সাদাসিধে জীবন কাটিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেন। উহুদের ময়দানে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। রক্ত ও মাটিতে সিক্ত তাঁর মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত রাসুল সা. তিলাওয়াত করেন,

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا﴾

তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। [সুরা আহজাব : ২৩]

মুসআব বিন উমায়েরের প্রতিবিম্ব উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতেও আমরা তিলাওয়াত করছি,

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا﴾

মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, প্রতিটি অধঃপতনের যুগেই দীনের সংস্কারের বাণী গুঞ্জরিত হয়, যার প্রভাবে বাতিল প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বর্তমান শতাব্দীতে রাসুলের জীবনের জিহাদি অনুপ্রেরণা ও আমলের পুনর্জীবন দান করাই ছিল সংস্কারের অধিক উপযুক্ত। আর জিহাদি দর্শনকে পুনর্জীবন দিতে কাফিরশক্তির চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে কাজ করে নামধারী ইসলামি নেতৃত্ব। জিহাদের ব্যাপারে ধর্মবিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে এত আপত্তি ও প্রশ্ন তোলা হয়নি, যতটা ধর্মের দাবিদারদের পক্ষ থেকে উঠানো হয়। মসজিদের মিম্বার থেকে জিহাদের মৌলিক বিধান নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর, সূক্ষ্মভাবে মুজাহিদদের দোষত্রুটি তালাশ করে তাঁদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে যতটা আহত করা হয়েছে, কাফিরবিশ্বের পক্ষ থেকেও সম্ভবত এতটা করা হয়নি; কিন্তু জিহাদি দর্শনের সংস্কারক উসামা বিন লাদেন জিহাদের প্রতিটি অঙ্গনেই সংস্কারের ছাপ রেখেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিন লাদেনের শাহাদাতে বিশ্বের জিহাদি নেতৃবৃন্দের শোকবার্তা

ড. আইমান আল জাওয়াহিরি

[শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের পর তানজিম আল কায়িদাতুল জিহাদের নেতৃবৃন্দ শায়খ ড. আইমান আল জাওয়াহিরির হাতে বায়আত হন। আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করুন]

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه،

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিশ্বের মুসলিম ভাই ও বন্ধুরা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যাদের সঙ্গে কাফিররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে—আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। [সুরা হজ : ৩৯-৪০]

রাসুল সা. বলেন,

> কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর রাহে জিহাদে অবিচল থাকবে।

আমি মুসলিম উম্মাহ, একত্ববাদে বিশ্বাসী, জিহাদ ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

পোষণকারী ও আত্মত্যাগে উদ্‌বুদ্ধ জাতিকে ইমাম, মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ ও বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী মহান সাধক আবু আবদুল্লাহ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছি।

তিনি তো এমন, যিনি পৃথিবীর লাঞ্ছনা-বঞ্চনা লাথি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন লড়াকু যোদ্ধা, যুদ্ধের ময়দানে যাঁকে সর্বদা প্রথম কাতারে দেখা যেত। তিনি কমিউনিস্ট ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করেছিলেন। তিনি বর্তমান যুগের মার্কিনদের বিরুদ্ধে জিহাদে ইমাম হিশেবে আবির্ভূত হয়ে বিশ্ববাসীকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তিনি তাদের শান্তি ও সম্মানের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। উম্মাহর জন্য দাসত্ব-লাঞ্ছনা থেকে মুক্তিত্রাতা হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন, তাঁকে জান্নাতের প্রশস্ততায় আল্লাহর মনোনীত নবি, সিদ্দিকিন ও শহিদগণের সহাবস্থান দান করুন।

হে মার্কিনরা, আমি আল কায়দার পক্ষ থেকে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই, আমরা অচিরেই তোমাদের উপর নাইন ইলেভেনের চেয়েও ভয়ংকর হামলা করব। তোমাদের ভূমি তোমাদের রক্তেই রঞ্জিত করব।

দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়ার বিবৃতি

[আবু বকর আল হুসাইনি আল বাগদাদি আল ইরাকি]

সকল প্রশংসা আল্লাহর, রহমত ও দয়া অবতীর্ণ হোক তাঁর বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ সা., তাঁর পরিজন ও অনুসারীদের ওপর।

সদ্যই ক্রুসেডারদের নেতা ও বিশ্ব কাফিরজোটের মোড়ল আমেরিকা এক হৃদয়বিদারক সংবাদের ঘোষণা দিয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানদের মতো আমরাও এতে মর্মাহত হয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হে আবু আবদুল্লাহ, আমরা আপনার বিদায়ে ব্যথিত। আমরা যতই মর্মাহত হই, মুখে তা-ই প্রকাশ করব, যা দ্বারা আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হবেন। সবকিছুই আল্লাহর জন্য, তিনি যাকে চান নিয়ে যাবেন, যাকে চান পৃথিবীতে রাখবেন। সবকিছুই তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নিশ্চয় আপনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর চোখের শীতলতা। আল্লাহর শপথ, যদি আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাহলে আমরা এর সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করেছেন। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। যা বলেছেন, তা বাস্তবায়ন করেছেন। নিজের সকল প্রতিশ্রুতি

পূরণ করেছেন। কখনো প্রতারণা করেননি। দীনের ব্যাপারে কারও সামনে মাথা নত করেননি। জুলুমের মোকাবিলায় কখনো উদাসীনতা প্রদর্শন করেননি। হকের ব্যাপারে কারও প্রতি নমনীয় হননি।

আপনি ছিলেন খোদাভীরু, আল্লাহর পথে জিহাদের ইমাম। কখনো ধর্মের ঝান্ডা নিচু হতে দেননি। কাফিরদের বিরুদ্ধে ছিলেন কঠোর ও মুমিনদের সঙ্গে সদাচারী। মুমিনদের আপনি জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। শেষপর্যন্ত মহান প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

হে আল্লাহ, আপনি আপনার প্রিয় বান্দার ব্যাপারে আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন!

শায়খ আবু বাসির নাসির আল উহাইশি
[জাজিরাতুল আরব শাখার কমান্ডার]

হে আবু আবদুল্লাহ, আমার পিতা-মাতা ও আমার জীবন আপনার উপর উৎসর্গ হোক।

তাকদিরে যে মৃত্যুস্বাদ আস্বাদনের অমোঘ বাণী লেখা ছিল, আপনি তা বরণ করেছেন। দ্বিতীয় বার আপনাকে আর তা আস্বাদন করতে হবে না। আপনি আল্লাহর পথে শাহাদাতের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষমাণ ছিলেন। শেষপর্যন্ত এই মর্যাদায় আপনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

প্রিয় বন্ধু, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করা যেত, তাহলে আমি আনন্দচিত্তে আমার জান-মাল আপনার জন্য উৎসর্গ করতাম। যদি সম্ভব হতো, আমি নিজের জীবনের বিনিময়ে আপনার জীবন ফিরিয়ে নিতাম; কিন্তু আমার এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নের মধ্যে কুদরতি প্রতিবন্ধক বিদ্যমান।

হে সম্মানিত শহিদ, দীর্ঘজীবন শাহাদাতের তামান্না বুকে নিয়ে কঠিন যাত্রা শেষে আপনি মহান রবের রহমতের ছায়ায় বিশ্রাম করুন। আপনি ভাবতেন, নিজের ধারণার চেয়েও বেশি জীবন অতিবাহিত করেছেন। এখন আপনার বিশ্রামের সময় এসেছে, আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা অর্জন করেছেন। শহিদগণের নিবাসে নিশ্চিত করেছেন নিজের ঠিকানা।

আবু মুসআব আবদুল ওয়াদুদ
[কমান্ডার, ইউরোপ শাখা]

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি বলেছেন,

> আর বহু নবি ছিলেন, যাঁদের সঙ্গীসাথিরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছেন, আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে; কিন্তু আল্লাহর পথে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। [সুরা আলে ইমরান : ১৪৬]

পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক রাসূল সা.-এর ওপর, যিনি বলেছেন,

> যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ইমান আনে ও রাসুলের সত্যায়ন করে এবং গনিমতের লোভ ব্যতীত জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়তা দেন—হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না হয় ঘরে ফিরিয়ে আনবেন।

মুসলমান ভাইয়েরা, আমাদের প্রিয় শায়খ ইমাম ও মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি ছিলেন দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন, বিপ্লবের নেতা, প্রথম কাতারের সাহসী যোদ্ধা। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বর্তমান যুগের ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের মোকাবিলায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত, অবিচল। কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ সমরজীবন পাড়ি দিয়ে তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস ও নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও পিছপা হননি। তিনি আমাদের বিদায় জানিয়ে পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভুর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের অন্বেষণে বেরিয়েছেন। উম্মতের মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর অভিযাত্রায় বেরিয়েছিলেন।

শায়খ বলতেন, 'আমি মুসলমান হিশেবে মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ করেছি, সুতরাং আমার কোনো ভয় নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোনো অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হোক। আর তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তিনি ইচ্ছে করলে আমার প্রতিটি কর্তিত অঙ্গে বরকত প্রদান করতে পারেন।'

যদিও আমরা তাঁর বিচ্ছেদে শোকাহত; কিন্তু তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সে জন্য আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আল্লাহ তাঁকে জীবনের উত্তম সমাপ্তি নসিব করে সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এ মর্যাদা প্রতিটি মুজাহিদের জীবনের একান্ত লক্ষ্য। আজ তাই শোকের দিন নয়। অবশ্য তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি, যাঁর বিচ্ছেদ আমাদের ব্যথাতুর করবেই। তবে আজকের দিন আল্লাহর কাছে নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন, প্রতিশোধের শপথ নেওয়ার দিন। চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকার প্রতিশ্রুতি নবায়নের দিন।

শাবাব আল-মুজাহিদিনের বিবৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন,

> মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। [সুরা আহজাব : ২৩]

পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক নবি সা.-এর ওপর, তিনি বলেছেন,

> যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমি কামনা করি, যেন আমি অবশ্যই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহিদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহিদ করা হয়।[৩৭]

আমরা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির আলোকে শায়খুল মুজাহিদিন আবু আবদুল্লাহ উসামা বিন মুহাম্মাদ লাদেনের মৃত্যুসংবাদ শুনেছি। তিনি তাঁর সারা জীবন হিজরত, জিহাদ ও পৃথিবীব্যাপী নিপীড়িত মুসলমানদের সহায়তায় অতিবাহিত করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বস্তুত উসামা বিন লাদেন নামটিই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মুখপাত্র ও অভিশপ্ত ইহুদিদের আগ্রাসনের শিকার বায়তুল মাকদিসের পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার-অভিযানের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আজ আমরা সেই মহান ব্যক্তির গুণকীর্তন করছি, যিনি ছিলেন একটি জাতির সমান। আমরা বর্তমানের জিহাদি প্রজন্মের ওপর তাঁর অনুগ্রহগুলোর আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তিনি বর্তমানবিশ্বে জিহাদের সূচনা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলিমবিশ্বের জিহাদি কাফেলা উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে, ইতিপূর্বে যে জিহাদ সবার কাছে অপরিচিত ছিল। তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় আল কায়দার ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল। তাঁর পরিকল্পনায় মার্কিন ভূখণ্ডে এমন হামলা চালানো হয়েছিল, যা মার্কিনদের স্তব্ধ করে দেয়। ইতিহাসে এমন হামলার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আজও বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডার ও জায়নবাদী শক্তিকে এমন অসংখ্য হামলার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ যেন শাহাদাতের পরও কাফিরদের জন্য ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে তাদের নিদ্রা হারাম করছেন।

যে ব্যক্তি দিনরাত কুরআনের তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের জীবনের যাবতীয় ভোগবিলাস ও বিনোদন ত্যাগ করে নিঃসঙ্গতা অবলম্বন

---

৩৭ *সহিহ বুখারি* : ৭২২৭।

করেছিলেন, তাঁর ব্যাপারে নতুন করে আর কী-ই-বা বলা যেতে পারে। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা এমন, ধর্মবিদ্বেষীদের জীবনের প্রতি ভালোবাসা যেমন।

হে বিশ্বের মুসলমান ভাইয়েরা, বর্তমান বিশ্বের মুজাহিদদের সর্বাধিনায়কের মৃত্যুতে আমাদের ব্যথিত হলে চলবে না। মৃত্যু-উপত্যকায় সকলকেই নামতে হবে, এটাই চূড়ান্ত বাস্তবতা। আল্লাহর পথে জিহাদ ইহ-পরকালের মর্যাদা অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা। নিঃসন্দেহে শহিদের মৃত্যু সহজতম মৃত্যু। নিঃসন্দেহে শায়খ উসামা বিন লাদেন শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। যেমন শাহাদাতের মৃত্যু লাভের জন্য অধিকাংশ মানুষকে কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। কাবার রবের শপথ, নিঃসন্দেহে শায়খ এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

> আর যে-কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসুলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামাত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। [সুরা নিসা : ৬৯]

আরও বর্ণিত হয়েছে,

> আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোনো ভয়-ভীতিও নেই এবং কোনো চিন্তাভাবনাও নেই। [সুরা আলে ইমরান : ১৬৯]

শুরা জামাআতুত তাওহিদ ওয়াল জিহাদ
[বায়তুল মাকদিস]

> মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। [সুরা আহজাব : ২৩]

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি ইসলামকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর শত্রুদের

লাঞ্ছিত করেছেন। তিনি এমন সত্তা, যিনি ন্যায়প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বিপদাপদের কণ্টকে ভরে দিয়েছেন এবং মুত্তাকিনদের জন্য উত্তম পরিণতি বরাদ্দ রেখেছেন। পরিপূর্ণ রহমত ও সালাম অবতীর্ণ হোক রাসুল সা.-এর ওপর, যাঁর তরবারির ছোঁয়ায় আল্লাহ ইসলামের বাণীকে মহিমান্বিত করেছেন।

একত্ববাদে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের মতো আমরাও ইমামুল মুজাহিদিন ও সত্যান্বেষীদের নেতা শায়খ উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে প্রচারিত সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম। গত কয়েকদিন এ নিয়ে আমরা চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছি। শেষপর্যন্ত তানজিম আল কায়িদার নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ঘটনার সত্যতা-সংক্রান্ত বিবৃতি এসেছে, উসামা বিন লাদেন তাঁর আত্মা মহান রাব্বুল আলামিনের হাতে অর্পণ করেছেন। তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেননি বা কাপুরুষতার পরিচয় দেননি। বীরত্বের সঙ্গে তিনি মহান স্রষ্টার দরবারে হাজিরা দিয়েছেন।

তিনি পৃথিবীর প্রতি বিরাগী হয়েই জীবনযাপন করেছিলেন। জীবনভর মানুষকে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান ও আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। আমরা যদি বলি, বিন লাদেন একবিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন, তাহলে অতিরঞ্জন হবে না। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেছেন,

> আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুভাগে এই উম্মতের জন্য এমন একজন মুজাদ্দিদ পাঠাবেন, যিনি এই উম্মতের দীনকে তাঁর জন্য সঞ্জীবিত করবেন।[৩৮]

নিঃসন্দেহে বিন লাদেন ছিলেন বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ, তাঁর অনুরাগীদের আগে শত্রুরাই এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে। তিনি বিশ্বব্যাপী জিহাদের পতাকা সমুন্নত করেছেন। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মনে এ দর্শন তৈরি করেছিলেন যে, বর্তমানে মর্যাদালাভের একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। তিনি তাঁর এই মতবাদ ব্যবহারিক জীবনেও প্রয়োগ করেছিলেন। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে তিনি মার্কিনদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছিলেন। তাঁর ওপর অর্পিত জিহাদি দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করে দীনকে সঞ্জীবিত করেছেন। ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেন,

> যখন তোমরা ইনা-পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর অপমান ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। তোমরা তোমাদের

---

৩৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৯১।

দীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের এই অপমান থেকে মুক্তি দেবেন না।[৩৯]

শায়খ আবু মুসআব জারকাবি বলেন, রাসুল সা.-এর বাণী—'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ধর্মের পথে ফিরে না আসবে'—এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ও জিহাদবিমুখ হওয়া দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নামান্তর।

আমরা শুরা জামাআতুত তাওহিদ ওয়াল জিহাদ বায়তুল মাকদিস আল্লাহর দরবারে শায়খের জন্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাঁকে আম্বিয়া, সিদ্দিকিন ও শহিদগণের সহাবস্থান নসিব করুন। তাঁর শাহাদাত আমাদের জন্য বড় শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর শাহাদাত যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা যোগাবে।

তাঁর নশ্বর দেহ আমাদের থেকে বিদায় নিলেও তাঁর আত্মা যেন সর্বদা আমাদের ডেকে বলছে, 'তোমরা ইজ্জত ও সম্মানের পথ কখনো ছেড়ে দিয়ো না।' তাঁর বক্তব্যের গুঞ্জন যেন আমাদের কানে বেজে চলছে আল জিহাদ, আল জিহাদ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আল্লাহর শপথ, আমরা জিহাদের পথে অবিচল থাকব। আমরা আমাদের সম্মানিত নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

কাপুরুষ ও পরাজিতদের সংখ্যাধিক্য কখনো আমাদের মন ভেঙে দেবে না। তাদের দাসত্বের আহ্বান কখনো আমাদের পদচ্যুত করবে না। আমাদের মায়েরা আমাদের সম্মানের সঙ্গে জন্ম দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ শিখিয়েছেন। হে আল্লাহ, শত্রুদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> আরও অনেক নবি ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথিরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তাঁদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে; কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তাঁরা হেরেও যাননি, ক্লান্তও হননি এবং দমেও যাননি; আর যারা ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। এ ছাড়া তারা আর কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা, মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদের দৃঢ় রেখো এবং কাফিরদের ওপর আমদের সাহায্য করো। [সুরা আলে ইমরান : ১৪৬-১৪৭]

---

৩৯ *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৪৬২।

অষ্টম অধ্যায়

বিন লাদেনের প্রশংসায় বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবৃন্দ

কাবা শরিফের ইমাম শায়খ আবদুর রহমান সুদাইস

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে। সে দিন কাবা শরিফের ইমাম পবিত্র হারামে ইশার সালাতে সুরা হা-মিম সিজদার দুই রুকু তিলাওয়াত করেন। ৩০ থেকে ৩২ নম্বর আয়াতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। পবিত্র কাবার ইমামের পক্ষ থেকে এটি বিন লাদেনের স্মরণ ও গুণমুগ্ধতা ধরে নেওয়া যায়। হয়তো তিনি পবিত্র হারামের সংস্কার-কাজের সঙ্গে যুক্ত বিন লাদেনের শাহাদাতে এভাবেই ব্যথার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

সে দিনের তাঁর অশ্রুসিক্ত তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো ছিল—

> নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হন এবং বলেন, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহ-পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে মন যা চায়, তা-ই তোমাদের জন্য আছে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করো। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। [সুরা হামিম সিজদাহ : ৩০-৩২]

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিসর)-এর বিবৃতি

বিশ্বের প্রসিদ্ধ ইসলামি বিদ্যাপীঠ জামিয়াতুল আজহারের মুখপাত্র শায়খ আহমাদ তাইয়িবের উপদেষ্টা মাহমুদ আদাব উসামা বিন লাদেনের মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'এটি ইসলামের নীতিবিরোধী।'

রিয়াজুশ শরিয়া কলেজ (সৌদিআরব)-এর সাবেক ডিনের অভিব্যক্তি

সৌদিআরবের প্রসিদ্ধ আলিম রিয়াজুশ শরিয়া কলেজের সাবেক ডিন ড. সৌদ আলফুনিসান বলেন, 'কোনো মুসলমানের মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করা শরিয়তবিরোধী। তিনি আরও বলেন, মুসলমানের মৃতদেহ শুধু স্থলভাগেই দাফন করা যায়।'

জামিয়া তাওহিদ (ইন্দোনেশিয়া)-এর অভিব্যক্তি

ইন্দোনেশিয়ার একটি ইসলামি সংস্থা জামিয়া তাওহিদের মুখপাত্র সুন হাদি বলেন, 'বিন লাদেন শাহাদাতবরণ করেছেন। তবে তাঁর শাহাদাতে আল কায়দা ধ্বংস হবে না, জিহাদের ধারাবাহিকতাও বন্ধ হবে না।'

ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়ার বিবৃতি

ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডে পরিচালিত মার্কিনী অভিযানের তীব্র নিন্দা জানান।

চেচেন কমান্ডার আমরভের বিবৃতি

চেচেন মুজাহিদ-কমান্ডার আমরভ বলেন, 'বিন লাদেনের শাহাদাতে জিহাদ দুর্বল হবে না; বরং তা আরও শক্তিশালী হবে। শাহাদাতের নজরানায় জিহাদ ধ্বংস হয়ে যাবে, এটি ভাবলে আমেরিকা চরম ভুল করবে।'

শায়খ হামিদুল উলা

একটি বুলেট, যার জন্য খরচ করতে হয়েছিল পুরো ১ ট্রিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান গুলি, শেষপর্যন্ত যা আমাদের সাহসী বীরের মাথা চুম্বনের মর্যাদা পেয়েছে।

বস্তুত ইসলামের সাহসী শার্দূল বিন লাদেন এই দাস্তানের শেষ অধ্যায়টি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে শত্রুদের বাধ্য করেছিলেন। যিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন জিহাদের পথে, ইজ্জত ও আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে। কোনো এক সময় তাঁর মাথা ছুঁয়ে যায় একফালি গুলিবৃষ্টি, এ-ই ছিল তাঁল জীবনের আরাধনা। আর এভাবেই পূর্ণ হয়েছে তাঁর শাহাদাতের তামান্না, যে মর্যাদা ব্যতীত তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে সম্মত ছিলেন না।

তাঁর এই মৃত্যু সম্মানের, আত্মমর্যাদাবোধের। মাথা উঁচু করে এক অসমসাহসী যুদ্ধে তিনি বরণ করেছেন এই শহিদি মৃত্যু; সারা জীবন তিনি যার প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি তাঁর শাহাদাতের পরিবর্তে শত্রুদের ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বিপুল অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করেছিলেন। তাদের দাম্ভিকতা মাটিতে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের এমন ক্ষতি করেছিলেন, যার হিসাব মেলাতেও এ পৃথিবীর বহুদিন লাগবে। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত মর্যাদার সান্নিধ্য পেয়েছেন।

সিংহপুরুষ বিদায় নিয়েছেন। পুরো পৃথিবী আজ স্তব্ধ। শত্রুরাও বাকরুদ্ধ। ধর্মের জন্য এমন আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠতা! ধর্মের এ কেমন মনোহরি নেশা!

নিশ্চয়ই শত্রুদের অনেকেই এই সাহসী বীরের দুঃসাহসকে স্যালুট জানিয়েছে। হোয়াইট হাউসের আজ্ঞাবহ সাংবাদিকেরা তাঁর ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে। তারা এমন হাস্যকর কথা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে, যা শেষপর্যন্ত তাদের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ বহন করছে। যেখানে পুরো বিশ্ব এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে—তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি বিশ্ব-পরাশক্তিকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ব-পরাশক্তির আগ্রাসনের মুখে ইস্পাতকঠিন প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের পথে অবিচল থেকে শেষপর্যন্ত শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তিনি শেষপর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছেন এবং মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।

১ ট্রিলিয়ন ডলারের সেই ঐতিহাসিক গুলির মূল্য

ইসলামি ভূখণ্ডে ক্রুসেডের প্রচারণায় ব্যস্ত বুশের মুখে নিক্ষিপ্ত জুতাটির মূল্য কি কেউ জেনেছিল? মাত্র ১০ ডলার মূল্যের জুতো। আর শেষ পরিণতি? লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের জীবন কাটিয়ে এখন সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। কেউ কি আর জিজ্ঞেস করে, কোথায় আছেন জর্জ বুশ?

বিন লাদেন কী দিয়েছিলেন স্বজাতিকে? ইজ্জত, সম্মান, বীরত্ব, অনুপ্রেরণা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ। আর জর্জ বুশ কী দিয়েছিল স্বজাতিকে? লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, বদনাম, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাজয়।

কেউ যদি এই ক্রুসেডযুদ্ধের পরিণতি চিন্তা করে, তাহলে এর ফল এমনই দাঁড়াবে। তারা ভালোভাবেই জানে, প্রতিটি ক্রুসেডের ফল শেষপর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষেই ছিল।

মোল্লা আবদুস সালাম জাইফের অভিব্যক্তি

সাবেক সিনিয়র তালেবান নেতা মোল্লা আবদুস সালাম জাইফ জার্মান এক সংবাদসংস্থার সঙ্গে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, আল কায়দা নেতা উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতে আফগানিস্তানে তালেবানের যুদ্ধে কোনো প্রভাব পড়বে না। এটি তালেবানদের একান্তই নিজস্ব আন্দোলন। নিঃসন্দেহে বিন লাদেনের শাহাদাত বিশ্বমুসলিমের জন্য এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমাদের জিহাদের নৈতিকতা হলো, কেউ জীবিত থাকলেও সফলতা আর যদি শাহাদাতবরণ করে, এটি তার জন্য চূড়ান্ত বিজয়। একজন মুসলমান হিশেবে আমি মনে করি, মার্কিনী বা তাদের দোসরদের হাতে কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ড সহ্য করার মতো নয়।[৪০]

বিন লাদেনের পরিবারের প্রতিক্রিয়া

উসামা বিন লাদেনের বড় ছেলে উমর বিন লাদেন তখন লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। তিনি পিতার শাহাদাতের সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, যেভাবে তাঁর পিতার ওপর বর্বর অভিযান চালানো হয়েছে এবং তাঁকে সমুদ্রে সমাহিত করা হয়েছে, এটি তাঁদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাঁর মতে, মার্কিনরা তাঁর পিতাকে এভাবে হত্যা করে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করেছে। তিনি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে চান।

ব্রিটেনের সাংবাদিক ইভন রিডলির প্রতিক্রিয়া

তালেবানদের হাতে বন্দি হয়ে পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ব্রিটেনের নারী সাংবাদিক Yvonne Ridley। পরে মরিয়ম নাম ধারণ করেন তিনি। ব্রিটেনের এই নারী সাংবাদিক ও প্রতিবেদক ইরানি সংবাদসংস্থা *প্রেস টিভি*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মার্কিনরা বিন লাদেন-সংক্রান্ত সকল সত্যতা সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল। এ কারণেই তারা তাঁকে শহিদ করে।

---

৪০. *রোজনামা আওসাফ*: ৩ মে ২০১১।

নবম অধ্যায়

আরব আলিমদের চোখে বিন লাদেন

- শায়খ মুহাম্মাদ উসাইমিন বিন লাদেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের আলোচনায় বলেন, আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাই বিন লাদেনের সহজে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারণ, আমি তাঁর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে পরম আগ্রহী ছিলাম। তিনি আমাদের সামনে জিহাদের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের প্রিয় ভাইয়ের কাজে বরকত দান করুন।

- শায়খ ইবনু জিবরিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'বিন লাদেন পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ লালন করেছেন'—শায়খ বিন বাজ কি এমন কোনো কথা বলেছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'এটা অপপ্রচার; শায়খ বিন বাজ এমন কোনো কথা বলেননি। তিনি কখনো এমনটা বলেননি; এমনকি কোনো মুসলমান এটা বলতে পারে না। বিন লাদেন দীর্ঘদিন আল্লাহর পথে জিহাদ করছেন। আফগানিস্তানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি রয়েছে। আল্লাহ তাঁকে কল্যাণের কাজে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দিন এবং তাঁকে সাহায্য করুন। তাঁর মাধ্যমে ইসলামকে সাহায্য করুন। অবশ্য বিন লাদেনকে আরব শাসকদের তাকফিরের বিষয়টি তাঁর নিজস্ব গবেষণা।'

- শায়খ উমর আবদুর রহমান (মার্কিনদের হাতে কারারুদ্ধ) বলেন, 'আল্লাহ বিন লাদেনকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি কুরআন-হাদিসের নির্দেশমতে সঠিক অর্থে জিহাদকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। আল্লাহ তাঁর হায়াতে বরকত দান করুন।'

- শায়খ আলি আল খিজির বলেন, 'বিন লাদেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত সাহসী পুরুষ। আমি আল্লাহর আসমাউল হুসনার উসিলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁকে সাহায্য করেন এবং তাঁকে বিজয়ী করেন।'

- শায়খ হামিদুল উলা বলেন, 'বিন লাদেন ও আল কায়দার নেতৃবৃন্দ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছেন। আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করুন।' বিন লাদেনের

শাহাদাতের পর শায়খ হামিদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'যারা উসামা বিন লাদেনকে দোষারোপ করে, তাদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এটা খুব সাধারণ ঘটনা। বামনরা লম্বা ব্যক্তিদের দোষারোপ করবেই। কেননা, তারা বিশাল ব্যক্তিত্বদের নিয়ে অন্তর্জ্বালায় ভোগে। তাদের ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের লিলিপুট মনে করে। বাস্তবে তাদের মধ্যকার পার্থক্য সম্মান ও লাঞ্ছনা, অন্ধকার ও আলোর পার্থক্যের মতো।'

- শায়খ সিফির আল হাওয়ালি তাঁর এক টিভি টকশোতে বলেন, 'বিন লাদেনের ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়, তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ছিলেন। আমি বলব, তিনি ইসলামের পক্ষে আক্রমণাত্মক ছিলেন।'
- শায়খ আবদুল আজিজ জুরবু বলেন, 'কাফিরবিশ্বের জন্য একজন বিন লাদেনই যথেষ্ট। আমেরিকা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ষাটোর্ধ্ব দেশ মিলে মিত্রজোট গঠন করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। এক মুসলমান বীরের বিরুদ্ধে কাফিররা সব ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা সুসংবাদ।'
- ড. হামুদ আল আকলা আশ শাবি বিন লাদেনের ব্যাপারে বলেন, 'তিনি একজন মুজাহিদ, সত্যিকারের মুমিন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জিহাদের পথে অবিচল আছেন।'
- শায়খ আবদুল কারিম হামিদ ও শায়খ সালিহ আল লুহাইদান বলেন, 'মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে তালেবান সরকার ও বিন লাদেন উভয়ই মাজলুম; আর মাজলুমের সাহায্য করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব।'
- শায়খ সায়িদ আজ জাইর বলেন, 'বিন লাদেনের মতো এমন যুবক উম্মাহর প্রয়োজন, যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করবে। তোমাদের কেউ যদি সাহসী বীরপুরুষ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন বিন লাদেনকে দেখে।'
- শায়খ নাসির আল ফাহাদ বলেন, 'নিঃসন্দেহে বিন লাদেন (আল্লাহ তাঁর হিফাজত করুন)-এর বিরুদ্ধে পূর্ব-পশ্চিমের সকল ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী—ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুনাফিকরা ঐক্যবদ্ধ। তারা তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইটের সাহায্যে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তাঁকে কাফিরদের নাগাল থেকে নিরাপদ রাখুন ও মার্কিনজোটকে পরাজিত করুন।'
- আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনি বলেন, 'আমি আন্তরিকভাবে মহান মুজাহিদ আবু

আবদুল্লাহ উসামা বিন লাদেনকে সালাম করছি। তিনি উম্মাহকে মাথা উঁচু করতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ সাক্ষী, তাঁর মাধ্যমে উম্মাহর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিহাসে যত দিন পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তির নাম আলোচিত হবে, গর্বে আমাদের মাথা উঁচু হয়ে যাবে।'

- চেচেন মুজাহিদ কমান্ডার শহিদ খাত্তাব বলেন, 'তিনি ছিলেন আমাদের দীনি ভাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এক মুজাহিদ। আল্লাহর জন্য নিজের জানমাল সবকিছু উৎসর্গকারী। অত্যন্ত সদাচারী; কিন্তু কাফির-বেঈমানদের বিপরীতে অত্যন্ত কঠোর। নিঃসন্দেহে তাঁকে জিহাদ অধ্যায়ের একজন বিশেষজ্ঞ বলা চলে। তিনি বৈশ্বিক জিহাদের গুরু। বহু বছর আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এখন তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।'
- আফগান কমান্ডার হেকমতিয়ার বলেন, 'বিন লাদেন মুসলমানদের জন্য আল্লাহর বিশেষ উপহার, যাঁকে আফগানযুদ্ধে আল্লাহ আমাদের দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই মুজাহিদদের নেতা।'
- সিরিয়ার আল মুহাজিরুনের নেতা শায়খ উমর বাকরি বলেন, 'যখন বিশ্ববাসী জিহাদের বিধান বিস্মৃত হয়েছিল, তখনই উসামা বিন লাদেন তার পুনর্জীবন দান করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।'
- সদ্য কারামুক্ত মরক্কোর শায়খ মুহাম্মাদ আল ফাজারি বলেন, বিন লাদেন ছিলেন এ যুগে সাহাবিজীবনের ঝলক প্রদর্শনকারী।
- শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি তাঁর এক বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় বিন লাদেন ও মোল্লা উমরের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
- শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম মাকতাবুল খিদমাত-সংক্রান্ত তাঁর অসিয়তে বলেন, 'আমরা মাকতাবুল খিদমাতের জন্য অনেকের কাছে অর্থ-সহযোগিতা চেয়েছিলাম, এ ক্ষেত্রে আমাদের ভাই আবু আবদুল্লাহ উসামা বিন লাদেন অগ্রগামী হয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্পদে বরকত দান করুন। আল্লাহর শপথ, মুসলিমবিশ্বে তাঁর ব্যক্তিত্বের জুড়ি মেলা ভার। আল্লাহ তাঁর দীন ও সম্পদের হিফাজত করুন, তাঁর হায়াতে বরকত দান করুন।'
- কিছুদিন পূর্বে মিসরেরে শায়খ সায়িদ আবদুল আজিম এক সম্মেলনে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাঁর বক্তব্যের শিরোনাম ছিল, 'শহিদ উসামা, তোমাকে

অভিনন্দন।' তাঁর এক জুমুআর খুতবার আলোচ্য বিষয় ছিল, 'মুজাহিদদের শায়খের বিদায়।'

- মিসরের শায়খ ইয়াসিরকে বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'শহিদের জানাজার সালাত শরিয়তসিদ্ধ।'
- শায়খ মুসা আল কারনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'শায়খ উসামা বিন লাদেন নিজের ও তাঁর পরিবারের অর্থসম্পদ জিহাদের কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি ও অবস্থানকে আল্লাহর সন্তুষ্টি-কামনায় জিহাদের আহ্বানে ব্যবহার করেছিলেন।'
- শায়খ সালাহুদ্দিন আবু আরাফা মসজিদে আকসায় তাঁর এক আলোচনায় বলেন, 'যিনি মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলেন। তিনি কে? তিনি উসামা বিন লাদেন, যিনি শপথ করেছিলেন, জীবিত থাকাকালে কখনো মার্কিনদের শান্তিতে থাকতে দেবেন না।'
- মিসরের শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল মাকসুদকে *আন-নাস টিভিতে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাঁর ওপর অনুগ্রহ করুন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন ও তাঁর শাহাদাত কবুল করুন। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, একজন সত্যিকারের মুমিন ও সত্যান্বেষী ছিলেন। তিনি ওই হাদিসকে সত্য করে দেখিয়েছিলেন, "সর্বোত্তম মানুষ তিনি, যিনি অশ্বারোহণ করে যাত্রা শুরু করেন আর যেখানেই শত্রুর শঙ্কা তৈরি হয়, আল্লাহর দীনের জন্য সেখানেই পৌঁছে যান।"'
- মিসরের শায়খ আবদুল সালাম বালি *আল-হাকাম টিভিতে* বিন লাদেনের শাহাদাতের ব্যাপারে বলেন, 'শায়খের শাহাদাতে আমি ও প্রতিটি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান মর্মাহত। আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন। তিনি সারা জীবন কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ভোগবিলাসের যাবতীয় উপাদানকে বিদায় জানিয়ে জিহাদের রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন শাহাদাতের প্রত্যাশী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেছিলেন। কাফিররা ২০ বছর তাঁকে পিছু ধাওয়া করছিল; কিন্তু আল্লাহ তাঁর হিফাজত করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত অর্জন করেন।'
- শায়খ ওয়াজদি গুনেইম বলেন, 'কাফির-মুরতাদ, দাজ্জাল ও মিথ্যুক প্রেসিডেন্ট ওবামা নির্বাচনী প্রচারণায় পরিবর্তনের স্লোগান ধরেছিল, গুয়ানতানামো বে

কারাগার বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছিল। কোনো রাষ্ট্র বিন লাদেনের মৃতদেহ গ্রহণে সম্মত হয়নি, এ কথা বলে সে আবার মিথ্যাচার করেছে। বিন লাদেন একজন শহিদ। আল্লাহ্ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন।'

- আমেরিকার নিউ জার্সিতে অবস্থিত আত-তাওহিদ মসজিদের ইমাম শায়খ আহমাদ আসসিসি বিন লাদেনের শাহাদাতের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমরা শায়খ উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের খবর পেয়েছি। পুরো মুসলিম উম্মাহ্ এতে মর্মাহত। তিনি বর্তমান যুগের একজন সত্যিকার মুজাহিদ ছিলেন।'

- জামিয়া মুহাম্মাদ বিন সাউদের শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ হাসসান *আল-হাকাম টিভি*তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেনের শাহাদাতের ব্যাপারে বলেন, 'মার্কিনরা তাঁর ওপর অনৈতিক হামলা চালিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পরিচয় দিয়েছে। তাঁর সঙ্গে যদিও আমাদের পারস্পরিক কিছু মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে বৈধতা দিতে হবে।'

  টিভি উপস্থাপক জিজ্ঞেস করেন, 'বিভিন্ন মানুষ তাঁর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করছেন, আপনি এটা কীভাবে দেখছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বলতে পারি, বিভিন্ন চিন্তাধারায় আমরা পরস্পরে মতবিরোধ করতে পারি এবং প্রত্যেকের এই মতবিরোধের অধিকার আছে; কিন্তু এর অর্থ এই নয়, যাদের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ থাকবে, কখনোই তাকে সমর্থন করা যাবে না বা তার ওপর নৃশংস আক্রমণ সমর্থন করতে হবে।'

- শায়খ মুসতাফা আদাবি বলেন, 'নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন মুসলিম বীর, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং মার্কিনদের বিরুদ্ধেও আমৃত্যু জিহাদরত ছিলেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে হত্যার শিকার হওয়ায় নিঃসন্দেহে তাঁকে একজন শহিদ বলা যায়।'

- শায়খ আদনান আরুর *দলিল টিভি*তে *উসামা বিন লাদেনের পরে কী হবে?* শিরোনামের এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'তিনি একজন মেধাবী ও সাহসী যুবক ছিলেন। উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।'

- লিবিয়ার শায়খ আবদুল মুনয়িম শাহহাত *সম্মানিত উসামা ও ধিক্কৃত ওবামা* শিরোনামের টিভি-প্রোগ্রামে বলেন, 'ধনাঢ্য উসামা বিন লাদেন (আল্লাহ তাঁর ওপর দয়া করুন) আরবের বিলাসী জীবনযাপন ছেড়ে আল্লাহর পথে বেরিয়েছিলেন।'

- মিসরের সাবেক মুফতি শায়খ নাসর ফরিদ ওয়াসিল বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'শহিদ বিন লাদেন আল্লাহর পথে রাশিয়া ও মার্কিননীতির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে লড়েছেন।'

- শায়খ মুহাম্মাদ আজ্জাগিবি *আল-খালিজ টিভির* নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেনের ব্যাপারে বলেন, 'তিনি ছিলেন আল্লাহর পথের একজন মহান দায়ি, যিনি অসংখ্য মানুষকে জিহাদের পতাকাতলে সমবেত করেছিলেন। সৌদিআরবের যুবকদের তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি নিজের ধনসম্পদ ও অন্যদের জাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। আর সে যুদ্ধে রুশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়। রাশিয়ানরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে মার্কিনরা আফগানিস্তানে হানা দিলে পুনরায় তাঁকে সেখান থেকে ফিরে যেতে বলা হয়। তিনি ভাবছিলেন রুশদের পরিবর্তে এখন মার্কিনরা হানা দিয়েছে, পরিবর্তনটা কী হলো? কাফিররা সবাই কি এক?

  তাঁর বিরুদ্ধে ভয়াবহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে; কিন্তু এই মুমিন বান্দা নিজের মতাদর্শে ছিলেন অবিচল। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পিছপা হননি এবং লড়াই করেই শাহাদাতবরণ করেছিলেন।'

- মিসর জামাআতে ইসলামির শুরা ইঞ্জিনিয়ার আসিম আবদুল মাজিদকে *আন-নাস টিভির* এক টকশোতে বিন লাদেনের মৃতদেহ সাগরে সমাহিত করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করুন, নিঃসন্দেহে তাঁকে শহিদ করা হয়েছে ও মুসলমানদের অপমান করতে তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে।'

- প্রফেসর রজব আহমাদ বলেন, 'বিন লাদেন মুসলিমবিশ্বের জিহাদি নেতা। তিনি নিজের জানমাল জিহাদের পথে ব্যয় করেছেন। নিজের জন্মস্থান ও পরিজনদের ত্যাগ করেছেন। যশখ্যাতি বা অর্থের লোভ করেননি। তিনি আল্লাহর পথের শহিদ।'

- সুদান উলামা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শায়খ আবদুল হাই ইউসুফ বিন লাদেনের গায়েবানা জানাজা আদায়ের পূর্বে বলেন, 'এই অভিযানে নিহত ব্যক্তি আমাদের ভাই, তাঁর সঙ্গে রয়েছে আমাদের ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। আল্লাহর শপথ, তাঁর মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়া যায় না। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তিনি ছিলেন কাফিরদের সামনে বড় বাধা।'

একাদশতম অধ্যায়

বিভিন্নজনের অভিব্যক্তি ও প্রশংসা

লাহোর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের অভিব্যক্তি

[আমাদের মতো অসংখ্য অনুভূতিহীন মুসলমানদের জাগিয়ে তোলা সূর্য আজ ভারত মহাসাগরে অস্ত গেল]

উম্মে হাবিবা

শায়খ উসামা বিন লাদেনের জীবন ও শাহাদাত আমাদের শিখিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত থাকবে। এ পথের পথিকদের সর্বাধিনায়ক মুহাম্মাদ সা.। আর তাঁদের বিবরণ এভাবেই ফুটে উঠেছে আল্লাহর বাণীতে,

> হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। [সুরা মায়িদা : ৫৪]

উম্মে আইমান

তিনি নিজের জীবন দিয়ে ব্যবহারিকভাবে আমাদের শিখিয়েছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কালিমার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করার সবক। দিয়েছিলেন—আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শাসক হিশেবে মেনে না নেওয়ার এবং আত্মমর্যাদাবোধ ও শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালনের দীক্ষা। তিনি আমাদের

তাগুতি জীবনব্যবস্থার মূলোৎপাটন ও আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়নে নববি সন্ধান ও সে পথে চলার পদ্ধতি প্রায়োগিকভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে নবি, সিদ্দিক ও শহিদগণের সহাবস্থান নসিব করুন।

ফাতিমাতুজ জাহরা

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত, রাসুল সা.-কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ব

> যে ব্যক্তি নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।[৪১]

উম্মাহর এই সাহসী সৈনিক ছিলেন আমার জন্য এই হাদিসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যি বাতিলের মূলোৎপাটন ও হকপ্রতিষ্ঠায় সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিলে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর সত্তা ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় মানু নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

জয়নাব মুহাম্মাদ

আল্লাহ তাআলা শায়খ উসামা বিন লাদেনের ওপর অনুগ্রহ করুন। শাহাদাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করুন। তিনি ছিলেন ইসলামি জিহাদের অগ্রপুরুষ। পুরো বিশ্ব যখন ক্রুসেডারদের ইসলামবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করছিল আর মুসলিম শাসকরা তাদের আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকা পালন করছিল, তখন তিনি প্রতিবাদের মূর্তপ্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর অনুসারীরা সুরা মুহাম্মাদ, সুরা তাওবা ও সুরা মুনাফিকুনকে জিন্দা করে অভিশপ্ত ক্রুসেডার ও জায়নবাদীদের শিক্ষা দিয়েছেন।

> আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ-না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [সুরা আনফাল : ৩৯]

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয়—আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছু রাব্বুল আলামিনের জন্য। ইসলাম ব্যতীত আমাদের সম্মান অর্জন সম্ভব নয়। কাফিররা মনে করে, তাঁকে শহিদ করে ফেললেই জিহাদের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। এ সকল বোকা জানে না, ইসলামি জিহাদের ময়দান শহিদদের খুনে তপ্ত হয়। আল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহম করুন। তাঁদের মাধ্যমে কাফিরদের পরকালের পাশাপাশি ইহকালও লাঞ্ছিত করেছেন।

---

৪১ *সহিহ বুখারি* : ৯৬৯।

আয়েশা খানসা

বর্তমানের ফিতনার যুগে যেখানে তাগুতিশক্তি ও তাদের ভ্রান্ত দর্শন বহু মানুষের আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেখানে শায়খ উসামা বিন লাদেন তাদের জন্য জ্বলন্ত প্রদীপের ভূমিকা পালন করেছেন। যেভাবে রাসুলের আগমনে জাহিলিয়াতের বেহায়াপনা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মন্দ প্রচলনের সমাপ্তি হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই তিনি তাগুতের প্রভাবমোচনে ভূমিকা রেখেছেন।

আমি তাঁর থেকে শিখেছি, যেভাবে তখনকার তাগুতের মূলোৎপাটনে একমাত্র ভূমিকা ছিল ইসলামের, ঠিক বর্তমানেও তাগুতি নীতিমালা ও শক্তিকে ধ্বংসের একমাত্র মাধ্যম ইসলাম। এটাই রাসুল সা. ও সাহাবিগণের দেখানো পথ। তাঁরা উম্মাহকে এর ব্যবহারিক প্রয়োগও দেখিয়েছিলেন। প্রয়োজন শুধু পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা ও সত্যান্বেষীদের সঙ্গী হওয়া। অতঃপর সাহাবিগণের ওপর যেমন আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়েছিল, সেভাবে আল্লাহর রহমত আমাদেরও অন্তর্ভুক্ত করবে। আরও একবার ইসলামের বিজয়গাথা রচিত হবে।

খাদিজা জয়নব

উসামা বিন লাদেন শুধু আমাকে নয়; আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন প্রতিটি মুসলমানকে শিখিয়েছেন—'সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা শেয়ালের মতো শতবর্ষ জীবিত থাকার চেয়ে উত্তম।' তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন সত্যিকারের মুজাহিদের প্রতিচ্ছবি। দুর্বল ইমানের অধিকারী যে-সকল লোক তাঁকে সন্ত্রাসী মনে করে, তারা অত্যন্ত হতভাগা। আমরা কি ইমানের ন্যূনতম স্তরের চেয়েও নিচে চলে গেলাম?

মরিয়ম আদিল

শায়খ উসামা বিন লাদেন আমার চোখে সেই কবিতার জীবন্ত রূপ,

> তিনি হাসিখুশি শাহাদাতের ভূমিতে কদম রেখেছেন, মানুষ মনে করে মুসলমান হওয়া খুবই সহজ।

আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, শত্রুতার মুখে পড়েছেন সবার। নিজের জীবনের আরাম-আয়েশ ছেড়ে পাহাড়ি ভূমিতে ধুলোমলিন জীবন কাটিয়েছেন। এ পথে ছিলেন সদা অবিচল।

শিফাস সুদুর

কালিমা পাঠ করা একজন অবুঝ মুসলমান ডাক্তারকে যখন তার দীনি বোনেরা জিহাদ ও এর নেতা উসামা বিন লাদেনের উপাখ্যান শোনায়, তখন সে হতভম্ব হয়ে নিজেকে কুয়ার ব্যাঙ হিশেবে আবিষ্কার করে। কুরআনের ভাষায় যারা আনসারুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যকারী), রাসুল সা.-এর ভাষায় গোরাবা, শরিয়ত নয়তো শাহাদাতের স্লোগান দেওয়া আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা এই বাহিনীর সদস্য কারা?

২৭ রমজান শায়খ উসামা বিন লাদেনের পুরাতন সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, 'বর্তমান বিশ্বে মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীনের সহযোগিতার জন্য পাকিস্তানকে আহ্বান করছি। আমি কি দীনের এই আহ্বান পাকিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন।'—তৎক্ষণাৎ আমি গভীর চিন্তায় ডুবে যাই। বহু আলিমের বক্তব্যই শুনেছি; কিন্তু তা আমাকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি, যতটা এই মুজাহিদের বাণী আমাকে আলোড়িত করেছিল।

সাধারণত আমি ও আমার বোন সকলের সামনে শায়খ উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে আলোচনা করতাম না। আমরা সকলের সামনে তাঁর ব্যাপারে কথা বলতে 'চাচাজান' বলে অভিহিত করতাম। হাসপাতালে বসে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। নিজের অজান্তেই বাঁধভাঙা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। বিকাল নাগাদ হাসপাতালের সকলেই জেনে যায়, আমার আপন চাচা মৃত্যুবরণ করেছেন। সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল—শুধু আমার নয়; তোমাদের চাচাও শহিদ হয়েছেন। রাসুলের অনুসারী, যিনি এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে তরবারি নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমাদের মতো অসংখ্য অনুভূতিহীন মুসলমানদের জাগিয়ে তোলা সূর্য আজ ভারত-মহাসাগরে অস্ত গেল। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, যে ব্যক্তি নিজের জানমাল আল্লাহর কাছে জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, তাঁর কাছে সম্মানের মৃত্যু অপমানের জীবনের চেয়ে উত্তম।

তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে রবের দরবারে হাজির হয়েছেন; আর আমার মতো অনুভূতিহীনদের জন্য জান্নাতের পিদিম জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বের রাজনীতিবিদদের চোখে বিন লাদেন

কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ট্রোর অভিব্যক্তি

উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ। এর প্রতিশোধ ভোগ করতে মার্কিনদের প্রস্তুত থাকা উচিত। আল কায়দা নেতার লাশ সমুদ্রে সমাহিত করা আমেরিকার ভীতি ও নিরাপত্তাবোধহীনতার প্রকাশ। আমেরিকা ঘৃণার যে আগুন জ্বালিয়েছে, এর প্রতিক্রিয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পরিচালিত এ অভিযান প্রমাণ করে, আমেরিকা এশিয়ান দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে।

মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কির অভিব্যক্তি

তালেবান কখনো বিন লাদেনকে মার্কিনদের হাতে তুলে দিতে চায়নি—মার্কিনদের এই দাবি স্পষ্ট মিথ্যা। নিজের পরিজনদের সামনে তাঁকে হত্যা করা মার্কিনদের বিরুদ্ধে মুসলিমবিশ্বে ঘৃণার আগুন তপ্ত করবে, যার ফলে জিহাদি চেতনা আরও উজ্জীবিত হবে। জর্জ বুশ বিন লাদেনের চেয়ে বড় সন্ত্রাসী। আমেরিকা এখনো ভীত। বিন লাদেনের মৃতদেহের ছবি প্রকাশ না করা ও সমুদ্রে সমাহিত করা তাদের আতঙ্কের প্রমাণ। বিন লাদেনকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর দর্শনকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না।

নিউজিল্যান্ডের সংসদ সদস্যের প্রশংসা

নিউজিল্যান্ডের জনৈক সংসদ সদস্য মার্কিন হামলায় নিহত বিন লাদেনের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে একজন বীরপুরুষ বলে অভিহিত করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বিন লাদেনের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না।' তার ভাষ্যমতে, আল কায়দার মাস্টারমাইন্ডের মৃত্যুতে আমাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত নয়। তিনি বলেন, 'বিন লাদেনের ব্যাপারে আমরা শুধু মার্কিনদের কাছ

থেকে নেতিবাচক কথা শুনি; অথচ তিনি সারা জীবন নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বাসের যুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁর মতো একজন মহান যোদ্ধার প্রয়াণে আমাদের আনন্দ নয়; শোক প্রকাশ করা উচিত।'

সিন্ধু এ্যাসেম্বলির সংখ্যালঘু সংসদ সদস্যের শোকপ্রস্তাব

সিন্ধু আঞ্চলিক সংসদের চারঘণ্টাব্যাপী চলমান অধিবেশনে এ্যাবোটাবাদ অপারেশন নিয়ে কোনো একজন মুসলিম সদস্য কোনো মন্তব্য করেননি; এমনকি এ ঘটনায় হতাহতদের জন্য কোনো ধরনের দুআ-মাগফিরাতও করেননি—কথাগুলো বলছিলেন সে সংসদের একজন সংখ্যালঘু সদস্য। তিনি আরও বলেন, এ ব্যাপারে আমি বক্তব্য দিলে ইস্যু তৈরি হতো; কিন্তু হায়, মুসলমানেরা এতই কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের মৃতদের জন্য ফাতেহাও পড়তে পারেনি।

পশ্চিমা লেখকদের অভিমত

প্রসিদ্ধ চীনা জেনারেল ও দার্শনিক [সান জু] Sun tzu তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দ্যা আর্ট অফ ওয়ারে লেখেন,

> Know thy self, know thy enemy. A thousand battles, a thousand victories.

'নিজেকে জানো এবং নিজের শত্রুকে চেনো। হাজার যুদ্ধে, হাজার বিজয়লাভ হবে।'

বর্তমান চীনের বুদ্ধিজীবী ও নীতিনির্ধারকরা তাদের এই বিজ্ঞ সমরবিদের উপদেশ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হোক বা না হোক, পশ্চিমা থিংকট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে গবেষণায় লিপ্ত নীতিনির্ধারকরা শত্রুর পূর্ণ পরিচয় পেতে এক মুহূর্তও অপচয় করে না। বিন লাদেনের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, আরও অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হবে। বিগত ১০ বছর যাবৎ তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ, রিপোর্ট, ম্যাগাজিন ও বিশেষ সংখ্যা বের করা হয়েছে। গত এক দশকে পশ্চিমাজোট যতবারই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুজাহিদদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করেছে, ততবারই তারা নিজেদের ম্যাগাজিনের কভার স্টোরিতে বিন লাদেনকে জায়গা দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিবারই পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের জন্য বিন লাদেনের ব্যক্তিত্ব আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

শহিদ বিন লাদেনকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচনা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য একটি আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন। আমরা এখানে তাঁকে নিয়ে গ্রন্থিত পুস্তকগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি :

- **Osama bin Laden, Michael Scheuer**

পশ্চিমা বিশ্বে শায়খ উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে নিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনার অধিকার যদি কারও থাকে, তাহলে সে অধিকার থাকবে একমাত্র Michael Scheuer-এর। তিনি ১৯৯৬-১৯৯৯ পর্যন্ত মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থা সিআইএর বিন লাদেন ইউনিটের

প্রধান ছিলেন। এর সুবাদে তিনি শায়খ উসামা বিন লাদেন ও তাঁর মিশন সম্পর্কে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান।

এ জন্যই শায়খ উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে তার মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তার ভাষ্যমতে, পশ্চিমা মিডিয়া বরাবরই বিন লাদেনের খোদাভীতি, দানশীলতা, পরিকল্পনা গ্রহণের যোগ্যতা ও কমনীয় ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করে আসছে। তিনি একজন বিচক্ষণ নেতা ও সমরবিদ ছিলেন; কিন্তু পশ্চিমারা বরাবরই এমন একজন মহান ব্যক্তিকে বিশ্ববাসীর সামনে কার্টুন-চরিত্র হিশেবে উপস্থাপন করে আসছে। আর এভাবেই পশ্চিমারা একজন চরম বিপজ্জনক ও শক্তিশালী শত্রুকে হালকাভাবে নিয়েছে। তারা নিজেদের এমন এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যেখানে বিন লাদেন সুকৌশলে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার ভাষায়,

> উগ্র ধর্মীয় বক্তব্যে অসাধারণ বাগ্মিতার অধিকারী হলেও বিন লাদেন অত্যন্ত সুবিবেচক ব্যক্তি ছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে রুখতেই তিনি তাদের উপর হামলা চালিয়েছেন। মার্কিনরা যত দিন মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের হস্তক্ষেপ ধরে রাখতে চাইবে, তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তত দিন তাদের শত্রু হিশেবে বিবেচনা করবে। কয়েক দশক দীর্ঘ হতে পারে এমন প্রতিশোধযুদ্ধের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন।

মূলত এভাবেই পশ্চিমারা বিন লাদেনের ফাঁদে পা দিয়েছে। তার ভাষ্যমতে, বিন লাদেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের থেকে বাছাই করে ৫ থেকে ৭ হাজার জনসংখ্যার একান্ত আস্থাভাজন সৈন্য তৈরি করে রেখেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দর্শন নিয়ে অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ-সংক্রান্ত Michael Scheuer-এর এই গ্রন্থগুলোও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য,

- Through our enemies eyes, Michael Scheuer.
- Imperial Hubris, Why the West is loosing the War on Terror, Michael Scheuer
- The Osama bin Laden I Know: An Oral history of Al Qaeda's Leader, Peter Bergen

বিন লাদেনের ব্যাপারে লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এ বইটি বিন লাদেনের সরাসরি সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখক পিটার বার্গেন, তিনি সিএনএন-এর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট হিশেবে কাজ করেছেন। পাশাপাশি

মার্কিন বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আফগানিস্তানে সরাসরি উসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

লেখক তার গ্রন্থে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন—কী এমন সম্মোহনী ক্ষমতা আছে বিন লাদেনের, যা মুসলিমবিশ্বের অসংখ্য যুবককে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে অস্থির করে তোলে! যাঁর একটি নির্দেশে যুবকরা মার্কিন ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালিয়ে তাদের দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছিল। তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, 'শত্রুরা আমাদের উপর এভাবে আক্রমণ করার আগেই আমাদের বার বার সতর্ক করেছে, ইতিহাসে এর নজির বিরল।'

তার ভাষ্যমতে, জামাল আবদুল নাসেরের পর আরববিশ্বে শায়খ উসামা বিন লাদেনই একমাত্র বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ,

- The longest war : The Enduring conflict between America and Al Qaeda

এই গ্রন্থে লেখক নাইন ইলেভেনের হামলাকে বিন লাদেনের ভুল রণনীতি হিশেবে চিহ্নিত করেন। তার ভাষ্যমতে, এই হামলার মাধ্যমে আল কায়দা আদর্শের যুদ্ধে হেরে গেছে। ফলে মূলধারার ইসলাম এখন আল কায়দার বড় আদর্শিক শত্রুতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি গুয়ানতানামো বে কারাগারের কর্মকাণ্ড ও এই যুদ্ধের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করেন। তার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ,

- Holy war, inc : Inside the secret world of Osama

এই গ্রন্থটিতে তিনি বিন লাদেনকে এমন একটি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন সিইওর সঙ্গে তুলনা করেন, যে কোম্পানি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে তৎপর। তিনি অত্যন্ত অর্থবহ একটি বাক্যের মাধ্যমে গ্রন্থের সূচনা করেন,

> বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিটিকে কীভাবে খুঁজতে হবে। আপনি যখন বিন লাদেনকে খুঁজতে যাবেন, আপনি তাঁকে পাবেন না; কিন্তু তিনি ঠিকই আপনাকে দেখছেন।

সবিশেষ লক্ষ্যণীয়, লেখক ও প্রকাশক এই বইয়ের রয়্যালিটির একটি অংশ ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের জন্য বরাদ্দ করেন।

- Messages to the world : The statements of Osama bin laden, Bruce Lawrence

পশ্চিমা সোসাইটি নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রেস রিলিজ ও ব্রিফিংয়ে ক্লান্ত হয়ে নিজেদের বড়

শত্রু বিন লাদেনকে ভালোভাবে জানতে উন্মুখ হয়ে পড়ে। এ গ্রন্থটি সেই প্রকল্পেরই ফসল। গ্রন্থটি মূলত লাদেনের ৪২টি বক্তব্যের সমষ্টি। এ ধরনের আরও কয়েকটি সংকলন,

- Osama bin Laden: America's Enemy in His Own Words, Randall B. Hamud
- Intel Center- Words of Osama bin Laden, Vol-1
- Infamous Speeches: From Robespierre to Osama bin Laden, Bob Blaisdell

বহু মাইল দূর থেকে পশ্চিমা স্কলার ও চিন্তাবিদগণ এসব বক্তব্যের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে বিন লাদেনের অসাধারণ বাগ্মিতা ও অনুপম ভাষাশৈলীর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়।

- Where's Osama bin Laden? CIA Edition, Xavier Watekeyn & Danial Lallic

যখনই ইরাক ও আফগানযুদ্ধে আমেরিকা ও বিভিন্ন জায়গায় সিআইএকে পরাজয়ের গ্লানি ভুগতে হয়েছে, তখনই মার্কিন জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীরা বিন লাদেনকে হত্যা বা গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হওয়ায় মার্কিন সরকার ও সিআইএর কঠোর সমালোচনা করেছে। বিন লাদেনের ভূত যখন পেন্টাগনের সমরবিশারদদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন মার্কিন শিল্পী ও গল্পকারদের নিজেদের বিদ্যা জাহির করার সুযোগ মেলে। কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়। এটি কোনো গ্রন্থ নয়, মূলত মার্কিনদের অসহায়ত্বের ব্যাপারে সূক্ষ্ম কটাক্ষ বলা চলে। শেষপর্যন্ত বিন লাদেন কোথায় হারালেন? মাটিতে হারিয়েছেন নাকি আকাশ তাঁকে গিলে নিয়েছে?

গ্রন্থটি প্যারিস, সিডনি, বালি, স্পেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরের মনোরম ছবি দিয়ে বানানো হয়েছে। পাঠককে এসবের মধ্যে বিন লাদেনকে খুঁজে নিতে হবে। খুব মনোযোগ দিয়ে, মাথা খাটিয়ে খুঁজতে হবে। শেষপর্যন্ত কোথায় আছেন বিন লাদেন? আপনাকে খুঁজে পেতে হবে তাঁকে। হয়তো এই পৃষ্ঠাতেই সন্ধান মিলবে তাঁর।

এখানে গ্রন্থকার একা নন। এমন আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ডেভিড পেটন।

- I dreamed I killed Osama bin Laden, David payton

গ্রন্থকার এই গ্রন্থটিতে নিজের স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছেন, কীভাবে তিনি তালেবানদের সারি ভেদ করে বিন লাদেন পর্যন্ত পৌঁছেছেন। আর তাঁকে হত্যা করে বিশ্ববাসীকে শান্তিতে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন।

- Kill Bin Laden : A Delta force commander's account of

the hunt for the most wanted man, Dalton Furry

এ গ্রন্থটি মূলত একটা প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণার অংশ। আমেরিকা নিজেদের সামরিক ব্যর্থতা আড়াল করতে এটা প্রকাশ করে। গ্রন্থের লেখক ডালটন ফোরি ডেলটা ফোর্সের সাবেক কমান্ডার ছিলেন। এই গ্রন্থে তোরাবোরা অপারেশনের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এমনই আরেকটি গ্রন্থ,

- Jawbreaker : The attack on Bin Laden and AL-Qaeda : A personal account of CIA's key field commander Gary Berntsen

স্বভাবতই গ্রন্থটিতে আফগানিস্তানে মার্কিনদের ব্যর্থতার দায় সিআইএ ও মার্কিন সেনাবাহিনীর আমলাতান্ত্রিকতার ওপর চাপানো হয়েছে। যেখানে প্রমাণ করা হয়েছে, তারা একাধিকবার বিন লাদেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু প্রতিবারই মার্কিন বাহিনীর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তাদের ব্যর্থ হতে হয় এবং বরাবরের মতো সন্ত্রাসীরা তাদের হাত থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হয়।

- The Looming tower : AL-Qaeda and the road to 9/11, Lawrence Wright

লরেন্স রাইটের আলোচ্য গ্রন্থটিতে সাইয়িদ কুতুব শহিদ থেকে শায়খ উসামা বিন লাদেন পর্যন্ত ইতিহাস ও দর্শন-পরিক্রমার বিবরণী উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখকের ভাষ্যমতে, এ গ্রন্থ রচনা করতে তাকে আরববিশ্বের ১ হাজারের অধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে।

বিন লাদেনের ব্যক্তিত্ব যেভাবে সমরবিশারদ, সাংবাদিক ও বিশ্বরাজনীতিকদের আলোচ্য বিষয় ছিল, সেভাবে তিনি সোশ্যাল সাইন্স ও স্থাপত্যবিশারদদেরও আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলেন।

- The house of Osama bin Laden, Nikki Bell

নিকি বেল বিন লাদেনের আফগানিস্তানের বাসস্থান, বামিয়ানে ধ্বংসকৃত বৌদ্ধমূর্তির ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী স্থানের ছবিসংবলিত এই গ্রন্থটি রচনা করেন। বেফটা এ্যাওয়ার্ড দখলের পাশাপাশি গ্রন্থটি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে টুর্নার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়।

- Osama bin Laden : A psychological and political portrait, Anthony J. Dennis

লেখক তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিশ্রমে বিন লাদেনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকৃতি অঙ্কনের চেষ্টা করেন। তার ভাষ্যমতে, তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দীর এক অনন্য ব্যক্তি, যিনি সরকারি কোনো পদে অবস্থান ছাড়াই মুসলিমবিশ্বের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হিশেবে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন।

তার ভাষায়, বিন লাদেনের পাশ্চাত্যবিরোধিতা মুসলমানদের সেই সোনালি অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তাঁদের সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক নেতারা মুলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখতেন এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ে নেতৃত্ব দিতেন।

- AL-Qaeda And what it means to be modern, John Gray

জন গ্রে ইংল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত London School of Economics and Political Science-এর ইউরোপিয়ান দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তার ভাষ্যমতে, আল কায়দাকে মধ্যযুগীয় সংগঠন মনে করা চরম বোকামি। আল কায়দাকে পরাজিত করতে হলে আল কায়দার মডার্ন ডেভেলপমেন্টকে স্বীকার করতেই হবে। আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে আল কায়দার সম্পর্ক ঠিক ততটাই, যতটা অন্য যেকোনো দর্শনের রয়েছে।

পাঠক, আমরা ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে বার বার দেখেছি, ক্রুসেডযুগে জার্মান, ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের খ্রিষ্টান নারীরা তাদের শিশুদের সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত। এবারও ঠিক তেমনটিই হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ক্রুসেডবিশ্বের মায়েরা তাদের শিশুদের আবারও নিজেদের যুগের সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভয় দেখাতে শুরু করে।

- Osama bin Laden : A war against the West, Elaine Landau

ইলেইন ল্যান্ডাউয়ের এ গ্রন্থটি মূলত স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে। বিন লাদেনের ওপর লিখিত এ গ্রন্থটি ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে বিন লাদেনের ব্যক্তিগত জীবন, আরববিশ্বে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, আল কায়দা ও তাঁদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক তার গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, বিন লাদেনের দর্শন আরববিশ্বের মূল দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ছবি অত্যন্ত অর্থবহ ক্যাপশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, ট্যাংকের পাশে অবস্থানরত এক সোমালিয়ান শিশুর ছবির নিচে লেখা ছিল, 'উসামা বিন লাদেন সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষ ও অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে সেখান থেকে পশ্চিমা প্রভাব দূর করে ধর্মযুদ্ধ তথা জিহাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।'

স্কুলগামী শিশুদের জন্য এ ধরনের বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে।

- Heroes & Villans-Osama bin Laden, Bill Loehfelm.
- People who made history – Osama bin Laden, William Coleman.

বস্তুত বিন লাদেন নিজেই ছিলেন একটি সংগঠন। তিনি তাঁর অনুরাগীদের জন্য সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এসব গ্রন্থ প্রমাণ করে বিশ্ব-পরাশক্তির মোকাবিলা করা এই একক ব্যক্তিটি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এসব গ্রন্থে তাঁর উঁচু ব্যক্তিত্ব ও বদান্যতা শত্রুদের কলমে ফুটে উঠেছে।

দুই বিশ্ব-পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি

—সন্তোষ ভারতি

পৃথিবীর দুই পরাশক্তির সংসদ সদস্যরা পড়িমড়ি করে দৌড়ে কোনোরকম জীবন বাঁচাচ্ছে। একে ওপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সকলেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। এ দৃশ্য চোখে দেখার পরেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরের পূর্বে বিশ্ববাসী এমন দৃশ্যের কথা কল্পনাও করত না; কিন্তু নাইন ইলেভেনের পর এমন ঘটনা এক-দুবার নয়, কয়েকবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পতনের পর মার্কিন নাগরিকরা এক অজানা ভীতি নিয়ে জীবনযাপন করছে। তাদের অহংবোধ চূর্ণ হয়ে গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী পরাশক্তি, যাদের ব্যাপারে বলা হতো ভৌগোলিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় কেউ তাদের ওপর আক্রমণের দুঃসাহস করতে পারে না, তারাই কিনা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

মার্কিনদের এই দাম্ভিকতা গুড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন আওয়াদ বিন লাদেনের, যিনি বিশ্বের কাছে শীর্ষ সন্ত্রাসী উসামা বিন লাদেন নামে পরিচিত। তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন বটে; কিন্তু এমন কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, যা পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান বা জার্মানির হিটলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কেউ নিউইয়র্কের বুকে হামলার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। জাপান পার্ল হারবারে আক্রমণ চালিয়েছিল; কিন্তু এটা ছিল মূল ভূখণ্ড থেকে ২ হাজার কিলোমিটার দূরের একটি সামুদ্রিক দ্বীপ। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বিন লাদেন মার্কিনদের প্রথমবারের মতো এ অনুভূতি দিয়েছেন, তাদের শহরটিও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এ শহরে হামলা চালানো যায়।

মার্কিনদের উপর তাঁর এ হামলা প্রথম নয়, ইতিপূর্বে তিনি মার্কিন দূতাবাস ও রণতরিতেও হামলা চালিয়েছেন; কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলা পৃথিবীর

দৃশ্যপট পালটে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, ন্যাটোর দায়দায়িত্ব, বিশ্বরাজনীতিতে চীন ও রাশিয়ার প্রভাব, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বৈশ্বিক সম্পর্ক, ইসরাইল-ফিলিস্তিন লড়াই ও বৈশ্বিক আচরণে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব পরিবর্তনের একমাত্র কারণ মার্কিনদের উপর বিন লাদেনের হামলা। তাঁর এই আক্রমণ মার্কিনদের শুধু অরক্ষিতই করেনি; বিশ্বরাজনীতিকেই বদলে দিয়েছে। এরপর পুরো বিশ্বশক্তি তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। তিনি ১০ বছর পর্যন্ত মার্কিনদের ফাঁকি দিতে সক্ষম হন। এর মাঝে বিভিন্ন সময় তিনি নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে অডিও-ভিডিয়োবার্তা জারি করেন।

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরে মার্কিনরা তাঁকে হত্যা করে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলে আসে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই কি তাঁর অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে যাবে? নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর মৃত্যুতে মার্কিন সরকার শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে, তবে মার্কিন নীতিনির্ধারকরা ভাবছেন, কীভাবে ভবিষ্যতের বিন লাদেন তৈরির পথ বন্ধ করে দেওয়া যায়।

বিন লাদেনের মৃত্যুর পর স্বভাবতই আল কায়দার নতুন নেতৃত্ব সামনে আসবে। তিনি এখন তাঁদের সামনে একটি দর্শন হিশেবে অবস্থান করবেন। এ সংগঠনটি তাঁর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং তাঁর দর্শন ধারণ করে চলবে। গত কয়েক বছরে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আল কায়দাকে ফ্রাঞ্চাইজি মডেলে পরিবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ, যেখানে প্রথমে আল কায়দা একটি সংগঠন হিশেবে কাজ করত, সেখানে বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হয়ে কাজ করছে।

তিনি ইসলামি শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য গণতন্ত্র, কমিউনিজম বা অন্য যেকোনো শাসনব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি ইসলামি দেশগুলোতে ধর্মীয় আইন প্রবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে মোল্লা উমরের তালেবান সরকারের শাসনাধীন আফগানিস্তানই ছিল একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র। তিনি প্রতিটি অঞ্চলে এ ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন। তাঁর ভাষ্যমতে, মার্কিনরা পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামি মূল্যবোধকে তাদের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত করতে চাচ্ছে, তাই পশ্চিম এশিয়া থেকে মার্কিনদের বের করে দেওয়া উচিত।

তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের পক্ষপাতী। ইসরাইলকে পশ্চিম এশিয়া থেকে বের করে দেওয়ার দাবিতে ছিলেন সরব। এ কারণে তাদের উপর যেকোনো ধরনের হামলা চালাতে দ্বিধা করতেন না। নিঃসন্দেহে এমন দর্শন ও কর্মপদ্ধতি তাঁকে সন্ত্রাসী হিশেবে চিহ্নিত হতে বাধ্য করে।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আল কায়দার নীতিমালায় তিনি পরিপূর্ণভাবে তা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছোট ছোট দেশগুলোতে বোমা হামলা বা আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও রাশিয়া ও আমেরিকার মতো বড় দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর কর্মপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি সুকৌশলে তাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়ানোর ফাঁদে ফেলেন, যা তাদের শক্তি খর্ব করে দিতে পারে। তাঁর মতে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এমন পরাশক্তিকে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব। এই কৌশলে যেকোনো দেশকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া যায়। ধারাবাহিকভাবে সেনাদের হতাহত হওয়ায় সরকারের ওপর জাতীয়ভাবে চাপ তৈরি হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জিহাদিরা অংশগ্রহণ করতেন, যারা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে জীবন বিসর্জন দিতে রাজি থাকতেন। এই সমরকৌশলেই তিনি আফগানযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রুশবাহিনী নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিন লাদেন ভাবছেন, মার্কিনরা আফগানিস্তানে রুশদের ভাগ্যবরণ করবে। আসলেই তাঁর পরিকল্পনা সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এ যুদ্ধের ফলে মার্কিনদের অর্থব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। তারা এখন ইরাক-আফগানযুদ্ধে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। জনগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। আমেরিকার জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বারাক ওবামা তার নির্বাচনী ইশতেহারে দিয়েছিলেন, তিনি বিজয়ী হলে এসব যুদ্ধ সমাপ্ত করবেন, ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে নিজেদের সেনা ফিরিয়ে নেবেন।

বিন লাদেন ধরা পড়েছেন, মার্কিনরা তাঁকে হত্যা করেছে; কিন্তু বলতে হবে তিনি ইতিহাসের এমন একক ব্যক্তি, যিনি দু-দুটি বিশ্ব-পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। একটিকে পরিপূর্ণরূপে পরাজিত করেছেন, অন্যটিকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এনে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ভবিষ্যতে মার্কিন বাহিনী যদি আফগানিস্তান থেকে ফিরে যায়; আর তালেবানরা আফগানিস্তানে পুনরায় ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, নিঃসন্দেহে এর কৃতিত্ব থাকবে উসামা বিন লাদেনের।

উসামা বিন লাদেনের মৃত্যু নিঃসন্দেহে আল কায়দার জন্য মারাত্মক আঘাত। পুরো বিশ্বের চোখে সন্ত্রাসী হলেও তিনি একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা ছিলেন—এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। কোটি কোটি মানুষ আজও তাঁর অনুসারী। কে না চেনে বিন লাদেনকে? শিশু-কিশোরদের মুখে মুখেও তিনি আলোচিত ব্যক্তি। পুরো পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে, বিন লাদেন একজন ধনাঢ্য আরব বিলিয়নিয়ার। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি নিজের ভোগবিলাস ত্যাগ করে ময়দানে এসেছেন।

তাঁর সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচকরাও তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য। তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, বিন লাদেন সত্যিকারার্থেই মার্কিনদের চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, তিনি ধীরে ধীরে একটি আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ দল তৈরি করেছেন, যার ভয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও তটস্থ থাকত। তিনি কোনো সাধারণ সন্ত্রাসী ছিলেন না; বরং তিনি মার্কিন বিরোধিতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

আমেরিকা ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠিত করছে। তেল-গ্যাসের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের সরকারদের সঙ্গে আঁতাত করে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। মুসলিমবিশ্বের জনগণ মার্কিনদের ভালো চোখে দেখে না, শত্রু মনে করে। এসকল মানুষের জন্য তিনি মহানায়ক হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোতে তাঁর অসংখ্য অনুসারী রয়েছে। মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা প্রকাশ্যে তাঁর গায়েবানা জানাজা আদায় করে। তিনি কোনো সন্ত্রাসী নন; বরং একটি দর্শন হয়ে বেঁচে থাকবেন। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও খ্রিষ্টান সভ্যতার মধ্যে যে বিভেদরেখা এঁকে দিয়েছিলেন, এখন বিশ্বজুড়ে তা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে।

এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, আমেরিকা ও ইউরোপ ইসলামি সভ্যতা ধ্বংসের চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, মার্কিনরা পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান জনগণের ওপর নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায়। তিনি এ-ও বুঝাতে পেরেছিলেন, আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর শক্তি খর্ব করতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিকল্প নেই। মুসলিম শাসকরা মার্কিনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়েছে, এ জন্য নিজেদেরই ময়দানে নামতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইসলামের বিধান।

তাঁর এই দর্শন ও মতবাদ উগ্র হলেও মুসলিম যুবসমাজকে চরমভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এমনকি এর জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে ওঠে। বিন লাদেনের হাতেগড়া তানজিম আল কায়িদার আত্মত্যাগীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি লড়াকু বাহিনী। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার চল্লিশের অধিক দেশে এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কলামিস্টদের চোখে বিন লাদেন

শায়খ উসামা বিন লাদেনকে আল্লাহ এমন মর্যাদা দান করেছিলেন, তাঁর অনুসারীদের বাদ দিলেও বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ এমনকি সেকুলার মতবাদের কলামিস্ট-গবেষকরাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে নামকরা কজন কলামিস্টের মন্তব্য পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই। যদিও তাদের বিভিন্ন মতের সঙ্গে আমরা একমত নই।

উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের পর

আবদুল কাদির হাসান, দৈনিক এক্সপ্রেস

সৌদিআরবের এক ধনাঢ্য নাগরিক, যিনি নিজের ধনসম্পদ ও পরিজনদের ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ময়দানে পা রেখেছিলেন, শেষ-অবধি পাকিস্তানের মাটিতে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় শহিদ। বিশ্বমানচিত্রে বহু ইসলামি দেশেরই অস্তিত্ব দেখা যায়; অথচ যিনি ইসলামের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর ইসলামি দেশগুলোর লাখো-কোটি একর জমিনে তাঁর জন্য দু-গজ জায়গা বরাদ্দ হয়নি।

তিনি বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন ইসলামের বিজয়পতাকা বহনকারী ও ইসলামের জন্য আত্মত্যাগকারীরা অমর। হয়তো বিশাল এই ভূপৃষ্ঠে তাঁর একটুখানি কবরের জায়গা হয়নি; কিন্তু তাঁর ইমান-উদ্দীপক ঘটনাবলি মানবেতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তিনি পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মুসলিমবিশ্বের প্রতিরোধযুদ্ধের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, 'আমি কখনো শত্রুদের হাতে জীবিত বন্দি হব না।' তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও প্রচণ্ড লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেছেন। তিনি তাঁর উচ্চশিক্ষা ও অঢেল সম্পত্তি আল্লাহর জন্য কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তাঁর এই ত্যাগ

কবুল করেছেন। তিনি আজ কাফিরদের হাতে বন্দি না হয়ে বরং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। অনাগত মুসলিম প্রজন্ম তাঁকে শহিদ হিশেবে স্মরণ করবে।

আদর্শের মৃত্যু নেই

মুহাম্মাদ ইউনুস কাসেমি, উরদুপয়েন্ট

উসামা বিন লাদেন অমর। তিনি এমন মহান মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, যা ছিল অসংখ্য মহামানবের জীবনের আরাধ্য। মার্কিনরা ভেবেছে, হয়তো বিন লাদেনকে হত্যা করলে তাঁর মিশন সমাপ্ত হবে, বস্তুত এটা তাদের ভুল ধারণা। আদর্শের জনকেরা মৃত্যুবরণ করেন না; আদর্শের বীজ বপন করে মাটিতে সমাহিত হন শুধু। শস্যবীজের মতো সেখান থেকে তাঁদের অজস্র সৈনিকের জন্ম হয়, যা সূচনা করে নতুন বিপ্লবের। বিন লাদেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা আজ যে আদর্শের চাষ করছেন, যে দিন এর ফসল ফলবে, আমেরিকার মতো পরাশক্তি তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উসামা বিন লাদেনের ভীতি

মকবুল জান, দৈনিক এক্সপ্রেস

যাঁর মৃতদেহের ছবি প্রকাশ করতেও মার্কিন নিরাপত্তাবাহিনী আতঙ্কে ভোগে, না জানি কতদিন পর্যন্ত তাঁর ভয় মার্কিনদের মনে বিরাজ করবে। হয়তো তাদের কয়েক প্রজন্ম তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকবে।

আজ সকালে আমি ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ইসরাইল-লেবানন সীমান্তে দাঁড়িয়ে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদমিছিল দেখছিলাম। হঠাৎ টিয়ারশেল নিক্ষেপণ ও গোলাগুলি শুরু হয়। ফিলিস্তিনিরা আহতদের একদিকে রেখে এসে আবার স্লোগান ধরে। এতে প্রায় ১২ জন নিরীহ ফিলিস্তিনি শাহাদাতবরণ করেন। লেবাননের রাস্তাঘাটে প্রায়শই দুটি বিষয়ের দেখা মেলে—তাদের সকলে, এমনকি শিশু-কিশোরেরাও ইসরাইলকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড মনে করে। এই দেশটি ফিলিস্তিনের ওপর বর্বর নির্যাতনের সাক্ষী। তাদের সামনে ঘটেছে সাবিরা-শাতিলার বোমা হামলা। তারা বহন করেছে অসংখ্য ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর মৃতদেহ।

আরেকটি বিষয়, এখানে আমাকে পাকিস্তানি হিশেবে পরিচয় পেলেই যে-কেউ প্রথম যে প্রশ্নটি করে, বিন লাদেনকে কি শহিদ করে দেওয়া হয়েছে? আমি অস্পষ্ট উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তাদের অধিকাংশের মতে, আমেরিকা ও ইসরাইলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন লৌহপ্রাচীর। যে জাতি প্রতিনিয়ত

আমেরিকা ও ইসরাইলের বোমা হামলার শিকার হচ্ছে, প্রিয়জন হারাচ্ছে, ঘরবাড়ি হারাচ্ছে, নিঃসন্দেহে তারা বিন লাদেনের কণ্ঠে সম্মোহন অনুভব করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে মর্মাহত হবেন।

প্রতি ঘরেই উসামারা জন্ম নেবে

মুজাফফর এজাজ, দৈনিক জাসারাত

উসামা একটি দর্শনের নাম। শায়খ ফাতিহ, শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম, শায়খ মুসতাফা আবি ইয়াজিদ, শায়খ আবুল লাইস আল লিবি, হামজা রাবিয়া, শায়খ খালিদ হাবিব, আইমান আল জাওয়াহিরি এঁরা কারা? এঁরা সবাই বিন লাদেন। কেউ আগে যাবে আর কেউ পরে।

আগুন, নমরুদ ও ইবরাহিমের বংশধর

মাওলানা মুহাম্মাদ আজহার, দৈনিক ইসলাম

পৃথিবীপৃষ্ঠে অসংখ্য শহিদেরই সমাধি আছে। হয়তো আল্লাহর তাকদিরের ফায়সালায় সমুদ্রপৃষ্ঠের বঞ্চনা দূর করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল—আমার উত্তাল বক্ষ কোনো শহিদের রক্ত সঞ্জীবনী পায়নি—এমন অভিযোগ যেন সে করতে না পারে। শায়খ উসামা বিন লাদেন ছিলেন মহান এক মর্দে মুজাহিদ। তিনি শাহাদাতের রক্ত ঝরিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়েছেন।

তিনি শহিদ

আব্বাস আতহার, দৈনিক এক্সপ্রেস

নিঃসন্দেহে তিনি একজন শহিদ। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

উসামা বিন লাদেনকে কি মার্কিন এজেন্ট ছিলেন

হারুনুর রশীদ, দৈনিক জং

এমন এক ব্যক্তি, যিনি ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, যিনি অস্ত্রের মোকাবিলায় অস্ত্র বা সৈন্যের মোকাবিলায় সৈন্যের পথে না হেঁটে বিশাল সেনাবাহিনী ও অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রাখার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

এত কিছুর পরও বিন লাদেনকে মার্কিন এজেন্ট মনে করা নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ। এজেন্টরা অঢেল ধনসম্পদ আর আরাম-আয়েশ ছেড়ে পাহাড়ের গুহায় বাস করে না,

হাতের তালুতে জীবন নিয়ে খেলা করে না, নিজের স্ত্রী-পরিজনদের জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দেয় না।

মার্কিনরা উসামা বিন লাদেনকে সত্যবাদী প্রমাণ করেছে

হামিদ মির, দৈনিক জং

উসামা বিন লাদেন হয়তো মৃত্যুর পরেও মুচকি হাসছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শত্রুরা আনন্দ উদযাপন করেছে বটে; কিন্তু তারা এ-ও জানে, বিন লাদেনের পার্থিব মৃত্যু হলেও তিনি তাদের পিছু ছাড়বেন না।

মার্কিন সৈন্যরা ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে অ্যাবোটাবাদে এক অভিযান চালিয়ে আল কায়দাকে এমন এক শহিদ উপহার দিয়েছে, যাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর সেনাবাহিনীকে আতঙ্কিত রাখবে। আতঙ্কিত মার্কিনরা তাঁকে পৃথিবীতে দাফনের সাহস করতে পারেনি। বিন লাদেনের মৃতদেহ সমাহিত করে তারা তাঁর অধ্যায়ের সমাপ্তি করতে চেয়েছিল; কিন্তু হয়তো তারা জানে না, বিন লাদেনের জীবন সমাপ্ত হলেও সেখান থেকে শুরু হবে নতুন অধ্যায়ের। তাই মার্কিনরা তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের উত্তাল বুকে সমাহিত করে ইতিহাসবিদদের লিখতে বাধ্য করেছে—তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, বিশ্ব-পরাশক্তি যাঁর মৃতদেহের ভয়েও আতঙ্কিত ছিল। হয়তো তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করে মার্কিনরা নিজেদের ব্যয় সংকোচন করতে চেয়েছিল।

নাজির আহমাদ গাজি

নাওয়ায়ে ওয়াক্ত

পুরো বিশ্ব যখন স্তব্ধ, খানকাগুলো বোবার ভূমিকা পালন করছিল, মিহরাবগুলো নিশ্চল আর বক্তাদের মুখে ছিল বিশাল বিশাল তালা ঝুলানো। পৃথিবী যেন তখনই নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে বিন লাদেনকে। তিনি হুংকার দিলেন—হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে নাপাক মার্কিনদের আসতে দিয়ো না। তাদের চোখ বায়তুল মাকদিস থেকে হারামাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। তোমাদের ভূখণ্ড, তোমাদের সরকার, তোমাদের জনসাধারণ ও তোমাদের ইমান আজ হুমকির মুখোমুখি। এই আওয়াজ তোলার অপরাধে তাঁকে ছাড়তে হয়েছে হারামাইনের সান্নিধ্য। বরণ করতে হয়েছে যাযাবর-জীবন।

যুগের যখন তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করে উল্লাস করে, এতে আমরা দেখি ইবলিশের নগ্ননৃত্য। বিন লাদেন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে

আরোহণ করে তাকদিরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। হয়তো তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন। অতঃপর ঘূর্ণিঝড় হয়ে অবতরণ করে মার্কিন ভূখণ্ডকে সুনামিতে ডুবিয়ে দেবেন। আল্লাহর ক্রোধের তুফান তাদের মৃত্যুও দেবে না, আবার শান্তিতে বাঁচতেও দেবে না। শান্তির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ডলার হয়ে পড়বে মূল্যহীন।

উসামার মৃতদেহ উত্তাল সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে কী? হকের পক্ষে গর্জে ওঠা ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরেও তাঁদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এমন যেন না হয়, সমুদ্র-উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়বে তোমাদের ভূখণ্ডে; আর তোমাদের মাটিতেই আবার জন্ম নেবে উসামারা। তোমাদের প্রতিটি অলিগলিতে চোখে ভাসবে একেকজন মুসা, তোমরা হয়তো ভয়ে 'ইমান এনেছি, ইমান এনেছি' জপ করবে; কিন্তু আল্লাহর ক্রোধ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

উসামা বিন লাদেনের পর

সালিম সাফি, দৈনিক জং

উসামা বিন লাদেন আল কায়দার আধ্যাত্মিক গুরু ও এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে তিনি সন্ত্রাসবাদী হতে পারেন; কিন্তু নিজের অনুসারীদের মধ্যে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা ও মুগ্ধ করার সহজাত গুণের কারণে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। মানুষকে তিনি খুব সহজেই সম্মোহিত করতে পারতেন। তিনি ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন; কিন্তু পৃথিবীর আরাম-আয়েশ ছেড়ে পাহাড়-পর্বতে জীবন কাটিয়েছেন।

মরেও যিনি অমর

সফদর মাহমুদ, দৈনিক জং

মার্কিনরা উসামা বিন লাদেনের মৃতদেহ ও সমাধির আতঙ্কে তাঁকে সমুদ্রে সমাহিত করেছে; কিন্তু আমেরিকার মতো বিশ্ব-পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের জীবদ্দশায় মহানায়কে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর পরেও তিনি মার্কিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতীক হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর থাকবেন।

তিনি যেমন ছিলেন

ইরফান সিদ্দিকি, দৈনিক জং

আমি মর্মাহত দেশবাসীকে বলতে চাই, হে নিরীহ দেশবাসী, আমরা তাঁকে শহিদ বলতে পারি না। এতে সৃষ্টিকর্তা রাগান্বিত হবেন। কারণ, দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা

মার্কিনদের মিত্র হয়ে কাজ করছি; আর বিন লাদেন ছিলেন আমাদের বিরোধীপক্ষের নায়ক। আমরা নিজেদের জীবিকার জন্য মার্কিনদের রুটি-রুজির মুখাপেক্ষী ছিলাম। আর এ জন্যও যে, মার্কিনরা অত্যন্ত ক্ষমতাধর; আর আমাদের শাসকদের লাগাম ও তাদের হাতে। সবচেয়ে বড় কথা 'দাসদের ভাষায়' মার্কিনদের চ্যালেঞ্জ করা বীরকে শহিদ বলা যায় না। প্রতিটি পাকিস্তানি চ্যানেল আজ তাঁর ব্যাপারে আমেরিকা-ইউরোপ ও অন্যান্য মুসলিমবিদ্বেষী দেশগুলোর ভাষায় কথা বলছে। বরাবরই আমরা তাঁকে মার্কিনদের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। তাঁর ব্যাপারে মার্কিনদের ভাষ্যই পুনরাবৃত্তি করেছি, মার্কিনদের ভাষায় তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছি। এভাবেই আমাদের মনন-মেধা-মস্তিষ্কে দাসত্বের ছাপ তৈরি হয়েছে।

এত কিছুর প্রয়োজন নেই, তাঁর জীবনের ঘটনাপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলে। ধনাঢ্য বিলিয়নিয়ার আরব-পরিবারে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেওয়া যুবরাজ, যিনি প্রকৌশল শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছিলেন, তিনি কেন পৈতৃক অঢেল সম্পদ ও আরাম-আয়েশ ছেড়ে কষ্টপূর্ণ যাযাবর-জীবনে সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের কাঁটায় পরিণত হয়েছিলেন? পৃথিবীতে আর কজন যুবরাজ এমন আছেন, যারা নিজেদের আরাম-আয়েশ ছেড়ে কাঁটাযুক্ত পথে বের হন—মৃত্যু যেখানে ছায়ার মতো পেছনে লেগে থাকে? দুই টাকার চাকুরি, সম্মান ও ধর্ম বিক্রির এ যুগে এমন পাগলামি আর কে করেছে?

শায়খ উসামা বিন লাদেন এখন আল্লাহর হাতে সমর্পিত, যিনি প্রতিটি মানুষের জীবনের হিসাব রাখেন এবং নিয়তের অবস্থাও জানেন। আমাদের মতো আত্মপ্রবঞ্চক, কাপুরুষ, দুর্বল ও পেটপূজারি মার্কিন আজ্ঞাবহদের তাঁকে শাহাদাতের তকমা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর বিচারে তিনি দোষী হলে শাস্তি পাবেন; আর যদি তাঁর ভালো কাজগুলো আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়, তাহলে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের মাছের পেটে থাকুক বা হিংস্র প্রাণীর উদরে—তিনি আসীন হবেন শহিদের সোনালি আসনে। যদি বিশ্বজগতের স্রষ্টা নিষেধ না করেন আর তাঁর দরবারে দাসানুদাস আমাদের শাসকরা রাগান্বিত না হন, আসুন আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দুহাত তুলি, আল্লাহ তাঁর ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে ক্ষমার চাদরে ঢেকে নিয়ে প্রিয় বান্দাদের কাতারে গণ্য করুন।

শহিদ উসামা বিন লাদেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রতীক

মতিন ফিকরি, দৈনিক জাসারাত

উসামা বিন লাদেন সৌদিআরবের এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত

আরাম-আয়েশে প্রতিপালিত এই যুবক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চতর ডিগ্রিও লাভ করেন। তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, ক্যারিয়ার ছিল আলোকিত। চাইলে তাঁর পৈতৃক সম্পদে আরও বৃদ্ধি ঘটাতে পারতেন; কিন্তু তাঁর ভরাযৌবনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের উপর বর্বর হামলা শুরু হলে নিরীহ আফগানদের সহযোগিতায় পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তান গমন করেন। তিনি নিজের জীবনের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ইসলামকে বিজয়ী করতে নিজেকে সমর্পিত করেন। তিনি সশরীরে আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সকল বিপদাপদের মোকাবিলা করেন।

সাহসী বীর

আজমল নিয়াজি, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত

মুসলমানদের ইতিহাসে এমন অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু রয়েছে। মৃত্যু-উপত্যকায় যেতে জীবনের গলি পেরিয়েই যেতে হয়। জীবন-মৃত্যু উভয়ের জন্যই রোমান্স তথা প্রেম-ভালোবাসার প্রয়োজন হয়।

বারাক ওবামা মার্কিন ইতিহাসের দুর্বলতম প্রেসিডেন্ট। বহু বছর ধরে বিন লাদেনের রহস্যময় ব্যক্তিত্ব মার্কিনদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছে। 'উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুতে পৃথিবী নিরাপদ হয়েছে'—বারাক ওবামার এ বাক্যটা জর্জ বুশের বর্বরতা ও নির্বোধ পলিসিগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মিথ্যাচার করে ইরাক বিজয়ের পথে চলা জর্জ বুশকে একজন নিরীহ সাংবাদিক জুতো মেরে স্বাগত জানিয়েছিল। জানি না বারাক ওবামা কোন ধরনের সম্ভাষণের অপেক্ষা করছেন।

বিন লাদেনের মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত হয়েছে, তাতে কী? মহামানবরা সমাহিত হন মানুষের হৃদয়ে। পুরো সমুদ্রপৃষ্ঠ বিন লাদেনের কবর। আরবের সিংহপুরুষের জন্য আরবসাগর উপযুক্ত সমাধি।

আসরার বুখারি

নাওয়ায়ে ওয়াক্ত

উসামা বিন লাদেন কাফিরবিশ্বের বিরুদ্ধে ইসলামি জিহাদের প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন, এটি এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে, এটি স্রষ্টার বিধান। শাহাদাত মুজাহিদের জন্য মিরাজস্বরূপ। তিনি তাঁর স্রষ্টার সান্নিধ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি তাঁর গন্তব্যে পৌঁছেছেন, এই সৌভাগ্য অর্জনে তাঁকে অভিনন্দন।

উসামা বিন লাদেনের আত্মা

আতাউর রহমান, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত

উসামা বিন লাদেন যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে না-ও থাকেন, ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর থাকবেন। বর্তমান বিশ্বে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কীর্তিগুলো যে প্রভাব তৈরি করেছে, তা খুব সহজে মুছে ফেলার সাধ্য কারও নাই। পরাশক্তিগুলো তাঁকে শীর্ষ সন্ত্রাসী মনে করে; কিন্তু মুসলিমবিশ্বের একটি বড় অংশ তাঁকে জাতির কর্ণধার, স্বাধীনতাযুদ্ধের লড়াকু নেতা মনে করেন। তিনি এক অসম যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সহযোদ্ধা নিয়ে মার্কিন পরাশক্তির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। পালটে দিয়েছিলেন ইতিহাসের যাত্রাপথ।

যেভাবে তিনি শেষযাত্রায় গেলেন

বিলাল গোরি, দৈনিক মাশরিক

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, আল্লাহ উসামা বিন লাদেনকে কত সৌভাগ্য দিয়েছেন। পৃথিবীর কোনো সম্রাটের এমন সৌভাগ্য হয়নি, যার একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতে মানুষ আত্মত্যাগে সম্মত হবে। পুরো বিশ্বের মানুষ তাঁকে ভালোবেসে তাঁর প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করে। মার্কিনরা তাঁকে সন্ত্রাসবাদী মনে করে; কিন্তু বিশ্বে কোনো সন্ত্রাসবাদী কী এত ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন? হিংস্র ও বর্বর সন্ত্রাসী তো তারা, যারা তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে সমাহিত করেছে। যদি তাঁকে দাফন-কাফন ও তাঁর জানাজার সালাত পড়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে অনুধাবন করা যেত তাঁর বাস্তব অনুসারীর পরিমাণ কত।

মরিয়ম গিলানি

উসামা বিন লাদেনের স্থলাভিষিক্ত কে হবে, এটাই এখন সবার প্রশ্ন। আইমান আল জাওয়াহিরি থেকে আল কায়দার অধস্তন কর্মকর্তা পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি বিন লাদেন। এমনকি আল কায়দার সদস্য না হয়েও যে-ই মার্কিনদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে, আমি মনে করি তারা প্রত্যেকেই বিন লাদেন। বিন লাদেন একটি দর্শনের নাম। তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে, তা বড় ব্যাপার নয়।

সাআদ উল্লাহ্ শাহ্

নাওয়ায়ে ওয়াক্ত

উসামা বিন লাদেনের মৃত্যু বিস্ময়কর ঘটনা নয়। তিনি বিশ্ব-পরাশক্তির গলার কাঁটা ও মার্কিনবিরোধী যুদ্ধের প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। এমন লোকদের জন্ম হয়

শতাব্দীতে একবার—পৃথিবীর আরাম-আয়েশ ছেড়ে পাথুরে পাহাড়ি জীবন বেছে নেওয়া সিংহপুরুষ। ইতিহাসের ভাষায় এ যুগ বিন লাদেনের যুগ বলে অভিহিত হবে। তিনি মৃত্যুবরণ করেননি; তিনি অমর। ভবিষ্যতেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাঁর দোষ ছিল একটাই, তিনি মুসলিমবিশ্বকে মার্কিন দখলদারত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই দর্শন আজ প্রতিটি মুসলিম শিশুর জীবনাদর্শ। মায়েরা তাদের সন্তানদের নাম রাখছেন উসামা বিন লাদেনের নামে।

তাঁর শাহাদাতে ১৫ কোটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সংবাদপত্র, টিভি-টকশো ও সেমিনারগুলোর জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় অতীতে হয়নি। তিনি প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে জীবন্ত। কেননা, তিনি ইসলামের ভালোবাসা ও কাফিরবিদ্বেষের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। আজ আমি তাঁর নামে আমার এই কবিতাটি উৎসর্গ করতে চাই—

আমার প্রিয় বন্ধু, একটু দেখো, আমি তো পরাজয়বরণ করিনি,
আমার মাথা লুটিয়ে পড়েছে, তবে আমামা নিয়েই পড়েছে।
একদা সময় বলে দেবে, আমি সদা অমর,
নিজের কীর্তিতে যে অমর, তার মৃত্যু কোথায়?

মালিক আহমাদ সারওয়ার

মাসিক জিয়ায়ে আফাক ও মাসিক চশমে বেদার

উসামা বিন লাদেনের মৃত্যুসংবাদে পুরো বিশ্বের তাগুতি মিডিয়ার আনন্দ-উল্লাস থেকেই অনুমান করা যায়, তিনি কত বড় মুমিন ছিলেন এবং তাগুতের কত বড় শত্রু ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু উবাইর অনুসারীরা আজ আনন্দিত। মুনাফিক ও তাগুত আদিকাল থেকেই একে অপরের সহযোগী ছিল। বিগত ১০ বছরেও মুমিনের রক্ত ঝরাতে তারা ছিল একে অপরের দোসর।

বিন লাদেনের শাহাদাতে পাকিস্তানি মিডিয়ার আনন্দপ্রকাশ চরম লজ্জাজনক ও তাদের আজ্ঞাবহ মানসিকতার প্রকাশ। বিশ্বের কাফির মিডিয়া ও তাগুতি শক্তির মনে রাখা উচিত, বিন লাদেনের শাহাদাতে জিহাদের ধারা বন্ধ হবে না। তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। হামজা, উমর ফারুক, উসমান ও আলি রা.-এর মতো বীরপুরুষ শাহাদাতবরণ করেছেন; কিন্তু ইসলামবিচ্যুত হননি, জিহাদের পথও ছেড়ে যাননি।

উসামা বিন লাদেন প্রায় দুই দশক ধরে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পশ্চিমাজোটের মোকাবিলা করেছেন, তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছেন। পশ্চিমারা তাঁকে হত্যা করেছে, তবে এটা সম্ভব হয়েছে মুনাফিক ও ইসলামের গাদ্দারদের সহযোগিতায়।

ইতিহাস সাক্ষী, তাগুতের প্রতিটি সফলতাই সে যুগের মির জাফর ও মির সাদিকদের হাত ধরে অর্জিত হয়। বিন লাদেনের শাহাদাত আমাদের আবারও জানিয়ে দেয়, যত দিন পর্যন্ত মির জাফর ও মির সাদিকদের অস্তিত্ব থাকবে, তত দিন টিপু সুলতানরা শহিদ হতে থাকবেন।

আল্লাহ সেই ধর্মবিদ্বেষীদের জাহান্নামে প্রেরণ করুন, যারা ডলারের লোভে বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডে শয়তানের সঙ্গ দিয়েছে। তাদের পরিজনদের ওপর লাঞ্ছনা অবধারিত করুন। ইনশাআল্লাহ বিন লাদেনের প্রতিটি রক্ত থেকে বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশ হবে। তিনি মহানায়ক। আজ্ঞাবহ সাংবাদিকেরা তাঁর মর্যাদা কেড়ে নিতে পারবে না।

মুসলিম ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব অনুধাবনে শুধু এটিই যথেষ্ট—এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৪৪টি দেশের জোট দীর্ঘ ১১ বছর লড়াই করছে। তাঁর পেছনে ব্যয় করেছে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোট ব্যয় ছিল ৪০ ট্রিলিয়ন ডলার। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে মার্কিনদের পরাশক্তিসমূহের কবর আফগানিস্তানে টেনে এনেছেন।

আমেরিকার পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্ন চূর্ণ করে দিয়েছেন। আগত কয়েক বছরে বিশ্বমানচিত্রে যে পরিবর্তন হবে, এর একক কৃতিত্ব বিন লাদেনের। তাঁর মৃত্যুতে একদিনেই ১৫ কোটির বেশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আগামী কয়েক বছরে এ সংখ্যা ১৫ বিলিয়ন পার করবে। পৃথিবীতে আর কোনো নেতা কি ছিলেন, যিনি এতটা আলোচিত হয়েছিলেন?

রাশিদুল হক সামি হক্কানি

মাসিক আল-হক

তিনি একজন সাধক পুরুষ, যাঁর আতঙ্কে বিশ্ব-পরাশক্তিগুলো আতঙ্কিত ছিল। তারা ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিল, আফগানযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করতে আরব মুজাহিদরা, বিশেষ করে শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম ও শায়খ উসামা বিন লাদেনের ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব ছিল চরম প্রভাবক। বিন লাদেনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল শাহাদাত, যার সন্ধানে আরবের সুউচ্চ অট্টালিকা ছেড়ে তিনি আফগানিস্তানের পাহাড়ি গুহা চষে বেড়িয়েছেন। মুজাহিদ-জীবনের এই মিরাজের অন্বেষণে আরব-মুসাফির বিন লাদেন কোম্পানির মালিকানাসহ অঢেল সম্পদ ও পরিজনদের উৎসর্গ করতে আফগান-ভূমিতে পা রেখেছিলেন। বিন লাদেন শাহাদাতবরণ করে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে রইলেন। নিজের বেনজির আত্মত্যাগের কল্যাণে হয়তো বদরের শহিদগণের সহাবস্থান লাভ করবেন।

আজ মুসলিমবিশ্বের কমান্ডার, সিপাহসালার ও শাহাদাতের ইতিহাসে বিন লাদেনের নাম পূর্ণচন্দ্র হয়ে জ্বলজ্বল করেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, তিনি একক এমন ব্যক্তি, যিনি দুটি বিশ্ব-পরাশক্তির মোকাবিলা করে তাদের পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। বিশ্ব-পরাশক্তি ও মিত্রজোট অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেও দীর্ঘ ১৫ বছর তাঁকে খুঁজে পায়নি। আজও পাকিস্তানি শাসক ও গোয়েন্দাসংস্থার সহযোগিতা না থাকলে মার্কিন বাহিনী তাঁকে খুঁজে বের করতে পারত না।

মাওলানা বারিদ আহমাদ নোমানি

মাসিক আল-হক

থেমে থেমে যেন বুকে ব্যথার অনুভব হচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত যাঁর নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছিলাম, আজ তিনি আমাদের ছেড়ে জান্নাতের অভিযাত্রী। যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিল মুসলমানদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করা শত্রুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যিনি মুসলমানদের প্রথম কিবলার স্বাধীনতা ও হারামাইন শরিফাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মিশন শুরু করেছিলেন। ভোগবিলাসের জীবন ছেড়ে পাহাড়ি গুহায় ডেরা বানিয়েছিলেন। সামসময়িক ফিরআউনের সামনে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। জায়নবাদী পরিকল্পনার সামনে সিকান্দরি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসের অট্টালিকায় নিজের অর্জনে আনন্দ অনুভব করছেন, অস্থির জীবনে বিশ্রামের সময় এসে গেল বলে।

মাওলানা মাহমুদুর রশিদ হাদুটি

আব-হায়াত

ইসলামের সিংহপুরুষ, মুসলিমবিশ্বের মহানায়ক ও জিহাদের সমন্বয়ক উসামা বিন লাদেন গতকালও জীবিত ছিলেন, আজও তিনি জীবিত। মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে তিনি অমর। তাঁর হাতেগড়া বিপ্লবী বাহিনী আবারও শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। মার্কিন মিত্রজোট আবারও নাস্তানাবুদ হবে।

আমরা ভালোবাসার পুনর্জন্ম দিয়েছি

আবদুল কুদ্দুস মুহাম্মাদি, দৈনিক ইসলাম

পৃথিবীতে বহু মানুষ জীবন বাঁচাতে মৃতের মতো বেঁচে থাকে। মৃত্যুর আগেই তাদের

আত্মা মৃত্যুবরণ করে। জীবিত থেকেও তারা মৃত এবং শেষপর্যন্ত ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। আর যে-সকল লোক মৃত্যুর খোঁজে জীবন কাটায়, জীবনভর যারা মৃত্যুর সঙ্গে খেলায় লিপ্ত থাকে, তাদের কাছে জীবন-মৃত্যু বিশেষ কোনো মানে রাখে না। মৃত্যুর পরও তারা অমর। উসামা বিন লাদেন এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি এক বিশ্ব-পরাশক্তিকে পরাজিত করেছিলেন, অন্য এক পরাশক্তিকে এক দশক যাবৎ নিজের আঙুলে নাচিয়ে ছেড়েছেন।

তিনি যে মিশন বেছে নিয়েছিলেন, যে লক্ষ্যে কণ্টাকাকীর্ণ পথে হেঁটেছিলেন, তা আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। তিনি ছিলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রবাদপুরুষ। তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বে হাজারো প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার আজ পালানোর পথ খুঁজছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ছিলেন মুজাহিদদের অনুপ্রেরণা; আর তাঁর শাহাদাতে সূচনা হবে এক নতুন অধ্যায়ের। তিনি যৌবনেই বিলাসবহুল অট্টালিকা ও বিলাসী জীবন ছেড়ে পাহাড়ি গুহায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রুশ-বর্বরতার বিরুদ্ধে সিসাঢালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পুরো বিশ্ব যখন আমেরিকার ভয়ে প্রকম্পিত ছিল, তখন তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বিজেতা

সুলতান মাহমুদ জিয়া, দৈনিক ইসলাম

শায়খ উসামা বিন লাদেন দুটি বিশ্ব-পরাশক্তিতে পরাজিত করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। উপনিবেশবাদী আমেরিকা ও তাদের বৈশ্বিক মিশন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মুখ থুবড়ে পড়েছে। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের ফিরে যাওয়ার ঘোষণা প্রচার হচ্ছে। অ্যাবোটাবাদের অভিযানে উচ্ছ্বাস প্রকাশকারীরা মূলত এর আড়ালে নিজেদের পরাজয়ের ব্যর্থতা গোপন করার প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা হয়তো মুসলমানদের ইতিহাস জানে না। ইসলামের চারাগাছে যত দামি রক্ত দেওয়া হয়, ইসলামের ফুলবাগান তত সুশোভিত হয়। ইসলামের বীরপুরুষগণ শাহাদাতে হতাশ হন না। তাঁদের মিশন থেমে যায় না। আফগানিস্তান থেকে মার্কিনদের চলে যেতে হবে, এটাই একটি চিরন্তন সত্য।

বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় বা মার্কিনদের পূর্বনির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী হোক, তাদের আর এখানে অবস্থানের বৈধতা নেই। মার্কিনরা এই অভিযানকে কোনোভাবে হজম করতে পারছে না। এই রক্তাক্ত রাত যে দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দিয়েছে, তা প্রতিশোধের আগুনকে আরও উত্তপ্ত করবে। সময়ের বিবর্তনে এটা

ভয়াবহ সুনামির রূপ ধারণ করবে। বিন লাদেন একক কোনো ব্যক্তি নন, যিনি চলে যাওয়ায় এ ময়দান খালি হয়ে যাবে।

অ্যাবোটাবাদ-অপারেশনে বিন লাদেনের শাহাদাতের ঘটনার বাস্তবতা সময়ই ব্যাখ্যা করবে; কিন্তু এটা চিরন্তন সত্য, তিনি অমর। তিনি শুধু একজন ব্যক্তিই নন; বরং একটি দর্শন। একটি আদর্শ হয়ে অমর থাকবেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আজও জীবন্ত। কেননা, তাঁর চরিত্র সদা বিদ্যমান। বর্তমান ক্রুসেডারদের নাকানি-চুবানি খাওয়ানো বিন লাদেন কীভাবে ধ্বংস হবেন? নিঃসন্দেহে তিনি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বিজেতা হিশেবে চির স্মরণীয় থাকবেন।

ইতিহাসের মহানায়ক

সামিয়া সালিম

ইতিহাস সাক্ষী, এই উম্মাহ এখনো বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। ফিলিস্তিনের যুদ্ধক্ষেত্র হোক বা ইরাকের রণভূমি; অথবা আফগানিস্তানের দীর্ঘ গেরিলাযুদ্ধের পটভূমি—এই উম্মাহ শায়খ আহমাদ ইয়াসিন, ইঞ্জিনিয়ার ইয়াহইয়া আইয়াশ, আবু মুসআব জারকাবি, শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম ও উসামা বিন লাদেনের মতো মহানায়ক জন্ম দিয়েছে, যাঁরা বিশ্বের কাফিরশক্তির অহমিকা ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

তাগুতি পশ্চিমা মিডিয়া অবশ্য নিজেদের মিশনে অনেকটা সফল। তারা নিজেদের আজ্ঞাবহ কলামলেখক ও প্রতিবেদকদের মাধ্যমে উম্মাহর বহু সদস্যকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। শেখানো বুলির মতো তাঁকে অনেকে সিআইএর এজেন্ট, সন্ত্রাসবাদী ও ফিতনাবাজ বলে অভিহিত করে থাকে। দাজ্জালি মিডিয়ার জাদুতে বহু সাধারণ মানুষ আজও জানে না, এই আরব-যুবরাজ নিজের বর্তমান তাদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করেছেন, যিনি নিজের রক্তে কাফিরের বিরুদ্ধে যে বিভেদরেখা টেনেছেন, বিশ্ব-পরাশক্তি ও তার ৪৯টি দেশের মিত্রজোট অসংখ্য জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও ১০ বছর যাবৎ সে রেখা অতিক্রম করতে পারেনি।

এই উম্মাহর দুর্ভাগ্য, তারা তাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের চিনতে পারেনি। তারা তাদের মূল্যায়ন করেনি। সামান্য কয়েকটা ডলারের জন্য তাঁর রক্ত ও তাঁর সম্মান শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। রাসুল সা. বলেছেন, 'ধ্বংস হয়েছে দিরহাম ও দিনারের পূজারি।'

তুচ্ছ দুনিয়ার ভালোবাসায় অন্ধ রাজনীতিবিদ, শাসক ও তাদের এজেন্টরা গাদ্দারদের পরিণতি দেখতে পায় না। পশ্চিমারা কী আচরণ করেছে ইরান শাহ, পারভেজ মোশাররফ, হুসনি মোবারক ও তার ছেলেদের সঙ্গে? কী আচরণ করেছে সাদ্দাম

হুসাইন ও তাঁর ছেলেদের সঙ্গে? কী আচরণ করেছে ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে? মুআম্মার গাদ্দাফি বা তাঁর ছেলেদের সঙ্গে? গাদ্দারদের তালিকা আর কত দীর্ঘ হবে?

চলে গেলেন খাওয়ারিজম শাহ

ইসমাইল রায়হান, দৈনিক ইসলাম

হ্যাঁ, উসামা বিন লাদেনের শাহাদাতের সংবাদ শুনে আমার এটাই মনে হয়েছে, জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ আরেকবার শাহাদাতবরণ করেছেন। নিজের অজান্তেই অস্ফুট কণ্ঠে বেরিয়ে পড়েছে, বর্তমান যুগের জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি প্রায়ই লক্ষ করি, এ দুজনের জীবন কতই-না সাযুজ্যপূর্ণ। সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ হিজরি সপ্তম শতকের চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বাধীন কাফির পরাশক্তির মোকাবিলা করেছিলেন। এর ৮০০ বছর পর আমেরিকার নেতৃত্বাধীন কাফির পরাশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিন লাদেন।

সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজম শাহ সারা জীবন তাতারদের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেডের তালিকায় ছিলেন। চেঙ্গিস খান তাঁকে জীবত বা মৃত গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে তাতাররা দীর্ঘ ১২ বছর পৃথিবীর কোনায় কোনায় অভিযান চারিয়েছে। যেখানেই তাঁর অবস্থানের গুজব উঠত, সেখানের মানুষের জীবনে বিভীষিকা শুরু হয়ে যেত। তল্লাশির নামে এলাকাজুড়ে নির্যাতনের তাণ্ডব চালানো হতো। বর্তমানেও বিন লাদেন মার্কিনদের দৃষ্টিতে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন। মার্কিন সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁর সংবাদ সংগ্রহের জন্য অসংখ্য স্থানে হানা দিয়েছে, তল্লাশির নামে বহুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সুলতান খাওয়ারিজম শাহ বহুবার তাতারদের হাতের নাগালে এসেও অল্পের জন্য বেঁচে যান, একইভাবে বিন লাদেনও বিভিন্ন সময় অল্পের জন্য মার্কিনদের হাতে গ্রেপ্তারি এড়াতে সক্ষম হন। খাওয়াজিম শাহকেও যেমন তাতাররা জীবিত গ্রেপ্তার করতে পারেনি, অনুরূপ মার্কিনরাও বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

খাওয়ারিজম শাহ নিজের মিশন অব্যাহত রাখতে ও শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে বার বার ঠিকানা পালটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। দীর্ঘ জীবনে তিনি মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান-ইরাক ও তুরস্কসহ বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। বিন লাদেনও পুরো জীবন যাযাবর জিন্দেগি যাপন করেছেন। তিনি সৌদিআরব থেকে সুদান, সুদান থেকে আফগানিস্তান ও শেষপর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে গমন করেন।

খাওয়ারিজম শাহ ছিলেন রাজপুত্র; কিন্তু আরাম-আয়েশের জীবন ছেড়ে জিহাদের

কঠিন রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন ঘোড়ার পিঠে। বিন লাদেনও অর্থসম্পদের দিক থেকে কোনো যুবরাজের থেকে কম ছিলেন না; কিন্তু তিনিও জীবন কাটিয়েছেন কণ্টকাকীর্ণ ও আত্মত্যাগের দাস্তানে পরিপূর্ণ পথে।

সূর্যের মতো ব্যক্তিত্ব

মুহতারামা আমিরাহ ইহসান

বর্তমান কাফির মিডিয়া তাঁর শাহাদাতকে কলঙ্ক লেপন করে মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা বিভিন্ন মিথ্যা গল্প ফেঁদে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে; কিন্তু ইবলিসি মিডিয়ার মনগড়া কাহিনি, টিভি-ব্যক্তিত্বদের অপপ্রচার শেষপর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। লাল মসজিদ, উসামা বিন লাদেন, আইমান আল জাওয়াহিরির অর্থদ্বন্দ্বসহ কত মিথ্যা ছড়াচ্ছে। আসলে অর্থলিপ্সুরা চতুর্দিকে অর্থের দ্বন্দ্ব দেখবেই। মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বই দেখে।

কুরআন খুলে দেখুন, টেলিভিশনের পর্দা বন্ধ করুন। সময় এখন আল্লাহর দরবারে সিজদা করার, আল্লাহর আশ্রয়ে চলে যাওয়ার। উম্মাহর সামনে অপেক্ষা করছে মহাযুদ্ধ। সবকিছুই আজ হুমকির মুখে, শুধু মসজিদে আকসা নয়; পারমাণবিক শক্তির অধিকারী পাকিস্তান, এমনকি হারামাইন শরিফাইনও আজ হুমকির মুখে। আল্লাহ ভালোকে মন্দ থেকে আলাদা করবেন। ইমান ও কুফর থেকে নিজের অবস্থান নির্বাচন করে নিতে হবে। আখিরাত আমাদের সামনে চলে আসছে। নিজের সামর্থ্য, নিজের শক্তিকে একটু স্মরণ করুন। কোথায় বানাতে চান আপনার ঠিকানা?

কাফিরবিশ্ব যেন বিন লাদেনের শাহাদাতে উন্মত্ত না হয়। তাদের তো জানার কথা—রাসুল সা.-এর ইনতিকালের চেয়ে ভয়াবহ বিপদ মুসলমানদের ওপর আর আবর্তিত হয়নি। মুসলমানরা বেদনায় মুষড়ে পড়েছিল; কিন্তু তোমাদের রোমান পূর্বপুরুষরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে একসঙ্গে দুটি সংবাদ পেয়েছিল—রাসুলের ইনতিকাল ও উসামা বিন জায়েদের বাহিনীর শাম বিজয়ের ঘটনা। রোমানরা উসামা বিন জায়েদের বাহিনীর সামনে টিকতে পারেনি। তাঁরা বাহিনী গনিমত নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে। আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ইনতিকালের পরও তেমনিভাবে উমর রা. তাৎক্ষণিকভাবে মুসান্না রা.-কে ইরাক-অভিমুখে রওনা করেন। আমাদের কাফেলা থেমে যায় না; বরং হয়ে উঠে দুর্জয়। বিন লাদেনের বাহিনীও থেমে থাকবে না, আফগানিস্তানে মুজাহিদরা কাফিরদের মৃত্যুপয়গাম নিয়ে ধেয়ে আসবে।

দশম অধ্যায়

বিন লাদেন হত্যার প্রতিশোধ

নেভি সিল সদস্যসহ মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত

আফগানিস্তানের সরকারি কর্মকর্তাদের বরাতে জানা যায়, তালেবানরা কৌশলে সেখানে মার্কিন বাহিনীকে ডেকে নিয়ে তাঁরা একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। ঘটনাস্থলে ৩০ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে এটাই সবচেয়ে বেশি মার্কিন সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা এএফপিকে গোয়েন্দাসংস্থার বরাতে জানান, 'কারি তাহির নামে একজন তালেবান-কমান্ডার পরিকল্পিতভাবে মার্কিন বাহিনীর কাছে সংবাদ পাঠায়, সেখানে তালেবানরা বৈঠক করছে।' এ সরকারি কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, চার পাকিস্তানি নাগরিক কমান্ডার তাহিরকে সহযোগিতা করেছিল। তিনি বলেন, 'এখন স্পষ্ট হয়েছে, এটা ছিল একটি ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত করা হয়েছে। একজন তালেবান-কমান্ডার পরিকল্পিতভাবে এ ফাঁদ পেতেছিলেন। তালেবানরা ভালোভাবেই হেলিকপ্টারের গতিপথ জানত। সেখানে যাওয়ার এটাই ছিল একমাত্র রুট। উপত্যকার উভয় দিকে তালেবানরা পাহাড়ে নিজেদের পজিশন নিয়ে অবস্থান করছিল। হেলিকপ্টার সেখানে পৌঁছামাত্রই তাঁরা রকেট লঞ্চার ও অত্যাধুনিক হাতিয়ার নিয়ে একযোগে আক্রমণ চালালে হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত হয়।'

তার মতে, মার্কিন মদদপুষ্ট আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই সরকারের ভাষ্যমতে তালেবানরা বিন লাদেন হত্যার প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালিয়েছে।

হেলিকপ্টারটি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওয়ারদাগ প্রদেশের সাইয়িদাবাদ জেলায় ধ্বংস হয়, যা তালেবানদের ঘর হিশেবে প্রসিদ্ধ। এই ঘটনায় ৩০ মার্কিন সৈন্যের পাশাপাশি আফগান স্পেশাল ফোর্সের সাত সদস্য ও একজন দোভাষী নিহত হয়।

মার্কিন মিডিয়ার মতে, এ ঘটনায় নিহতদের মধ্যে মার্কিন নেভি সিলের ওই সদস্যরাও ছিল, যারা অ্যাবোটাবাদে বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। অবশ্য হোয়াইট হাউসের ভাষ্যমতে, নিহতদের মধ্যে অ্যাবোটাবাদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী কেউ নিহত হয়নি।

ISAF এর মুখপাত্রের ভাষ্যমতে, এ ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে এবং নিহতদের মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আফগান সরকারের ভাষ্যমতে, হেলিকপ্টারটি বিদ্রোহীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং তা বিধ্বস্ত হয়েছে।

এর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ পাকতিয়ায় আরও একটি হেলিকপ্টার উড্ডয়নের সময় ভূমিতে আঘাত করেছে। অবশ্য এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। এ ব্যাপারেও তদন্ত চলমান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের ফোনালাপে হামিদ কারজাই এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বারাক ওবামা বলেন, 'আফগানিস্তান-মিশন অব্যাহত থাকবে, উভয় দেশের জন্য এটি কল্যাণকর।'[৪২]

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত : ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিবৃতি

ওয়ারদাগ প্রদেশের সাইয়িদাবাদ জেলার ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সঙ্গে হানাদার মার্কিন সৈন্যদের কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ভয়াবহ লড়াইয়ে মার্কিনদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মার্কিন সামরিক মুখপাত্র স্বীকার করেন, বিগত ১০ বছরে এটা ছিল তাদের সর্বাধিক নিহতের ঘটনা। তিনি আরও মনে করেন, এ যুদ্ধে মার্কিন স্পেশাল বাহিনীর একটি চিনুক-৭৪ হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়। যেখানে ৩০ জন মার্কিন সৈন্যসহ আটজন আফগানসৈন্য আরোহী ছিল।

কাবুল-ওয়াশিংটনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হোয়াইট হাউস ও বাগরাম ঘাঁটির বিবৃতির অপেক্ষা না করে এত বিশাল হতাহতের ঘটনায় কাবুলের পুতুল সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতি আসা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। হতে পারে মার্কিন শাসকদের পরামর্শেই এটা হয়েছে। মার্কিন শাসকরা হয়তো তাদের সামরিক ক্ষয়ক্ষতির খবর জনসাধারণের কাছ থেকে লুকানোর পলিসিতে পরিবর্তন এনেছে। বিগত ১০ বছরে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু মার্কিন শাসকরা কখনো তা স্বীকার করেনি। অবস্থাদৃষ্টে আমরা বলতে পারি, এ ধরনের ঘোষণার মাধ্যমে মার্কিন

---

৪২ *আল আরাবিয়া ডটকম রিপোর্টার* : আমজাদ আলি।

সরকার হয়তো মার্কিন জনসাধারণকে নতুন চিন্তা ও নতুন বার্তা দিতে চায়, যার বাস্তবতা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে। আপাতদৃষ্টিতে আফগানিস্তানে তাদের ব্যবহৃত হেলিকপ্টারের ধরন প্রকাশ পাচ্ছে। আবার এই ঘটনায় আফগান মুজাহিদদের শক্তি ও সাহসিকতার দৃশ্যও ফুটে উঠছে। তাঁরা যেভাবে রাতের অন্ধকারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন হেলিকপ্টারের মোকাবিলা করেছে, এতে তাঁরা খুব সহজেই মার্কিন জনসাধারণকে আফগানিস্তানের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা দিতে পেরেছে।

বস্তুত মার্কিনরা নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি আড়াল করে জনগণকে বিজয়গাথায় বিভোর রাখার পরিকল্পনা নিয়েছিল। বিগত ১০ বছরে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মার্কিন হেলিকপ্টার মুজাহিদদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষত এ বছর বদর অপারেশনের পর থেকে হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ার ঘটনা রীতিমতো বেড়ে চলছে; কিন্তু তারা বরাবরই এসব অস্বীকার করে। আর যদি কখনো স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তখন যান্ত্রিক ত্রুটি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জন্ম নিতে বাধ্য, শুধু আফগানিস্তানেই কেন প্রযুক্তিগত ত্রুটিতে হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়? কেন আফগানিস্তানই শুধু জরুরি অবতরণ করাতে হয়? জরুরি অবতরণকালে এসব হেলিকপ্টারে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে বা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায়, আবার কখনো আরোহীরা বেঁচে যায়।

সাইয়িদাবাদের ঘটনা প্রমাণ করে, শত্রুদের বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সামরিক শক্তিতে কোনো ধরনের ঘাটতি হয় না; বরং আল্লাহর সাহায্যে মুজাহিদরা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী ও সংগঠিত হয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। শত্রুবাহিনীর জন্য গোঁয়ারতুমির পরিবর্তে বাস্তবতা অনুধাবন করাই কল্যাণকর হবে। চলমান আফগানযুদ্ধে প্রকাশ্য পরাজয়ের স্বীকারোক্তি করাই তাদের জন্য কল্যাণকর। নিজেদের আগ্রাসী মনোভাব পরিবর্তন করলেই তারা ভবিষ্যতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।[৪৩]

হেলিকপ্টার-দুর্ঘটনায় নিহতরা আমাদের নায়ক : আমেরিকা

ওয়াশিংটন-কাবুল নিউজ এজেন্সি, পেন্টাগন ও আফগানিস্তানের ন্যাটো মুখপাত্রের ভাষ্যমতে, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে। যেখানে ৩১ জন মার্কিনীসহ সাত আফগানসৈন্য নিহত হয়েছে। ওবামা প্রশাসন এ দুর্ঘটনায় উসামা বিন লাদেনের হত্যা-অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাদের নিহত হওয়ার তথ্য নাকচ

৪৩ *ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান* : ০৭ আগস্ট ২০১১।

করে দিয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল জন এলেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'পশ্চিম আফগানিস্তানের ওয়ারদাগ প্রদেশে হেলিকপ্টার ভূপাতিতের ঘটনায় নিহতরা আমাদের নায়ক, যারা স্বাধীনতা রক্ষায় বড় ভূমিকা রেখেছেন।' ন্যাটোর ভাষ্যমতে, এ ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন পানিটা তার বক্তব্যে বলেন, 'নিহত সেনারা অত্যন্ত সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন, তারা পৃথিবীকে নিরাপদ রাখতে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। যে মিশনে আমাদের সেনারা আত্মত্যাগ করেছেন, তা অব্যাহত থাকবে।' অবশ্য তিনি দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তার ভাষ্যমতে, 'এ ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আফগানিস্তানে আমরা আমাদের মিশন পূর্ণ করতে কাজ করে যাচ্ছি।' এদিকে মার্কিন বাহিনীর কমান্ডার অ্যাডমিরাল মাইক মুলেনের ভাষ্যমতে, এখনো দুর্ঘটনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তদন্তের আগেই এ ব্যাপারে মন্তব্য করা অনুচিত। তিনি বলেন, 'আমার মতে এই ঘটনার তদন্তকারীদের নিজেদের কাজ যথাযথভাবে করতে দেওয়া উচিত। আমরা আমাদের মিশন এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিহত সৈন্যদের পরিজনদের সম্মানের জন্য হলেও আমাদের এই মিশন অব্যাহত রাখা উচিত।'

তালেবানরা তাৎক্ষণিক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার দাবি করেছে। আফগান-সরকারের ভাষ্যমতে, হেলিকপ্টারে রকেট হামলা করা হয়েছিল। মার্কিন সরকারের এক কর্মকর্তাও ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। এদিকে এটাও বলা হয়, নিহতদের মধ্যে ২০ জন নেভি সিলের সদস্য রয়েছেন, যারা বিন লাদেন হত্যা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশ্য ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা বারাক ওবামা প্রশাসনের বরাতে এ তথ্য নাকচ করে দিয়েছে।

চিনুক হেলিকপ্টারের ধ্বংস

মার্ক আরবান, বিবিসির কূটনীতিক ও প্রতিরক্ষাবিভাগের প্রধান, নিউজ নেইট

মার্কিন বাহিনীর চিনুক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়া ও এর ৩৮ জন আরোহীর মৃত্যু আফগানিস্তানের ন্যাটোজোটের ভয়াবহ হামলার মুখোমুখি হওয়ার চিত্র বোঝায়।

চিনুক হেলিকপ্টার ধ্বংসে কার্যত আমেরিকান নেভি সিলের ছয়জনের কমান্ডো ইউনিটের একটি পুরো স্কোয়াড্রন ধ্বংস হয়েছে। এই ইউনিটের কমান্ডোরা এ বছর মে মাসে বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল।

মার্কিন সামরিক নীতিনির্ধারকরা এ নিয়ে বেশ চিন্তিত, বিশেষ এ বাহিনী এখন

বেশিরভাগ এমন হামলার শিকার হচ্ছে কেন?

২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ বাহিনী রাতের অন্ধকারে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে হাজার হাজার অপারেশন চালিয়েছে, যেখানে শত্রুদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ লড়াই করতে হয়েছে।

আফগানিস্তানে নিয়োজিত ন্যাটোর অধীন ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টান্ট ফোর্সের সদ্য সাবেক কমান্ডার জেনারেল পিটারসন এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন এই বিশেষ বাহিনীর প্রশংসা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-ও বলেন, 'বর্তমানে গণমাধ্যমে এ জাতীয় বাহিনীগুলোর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রচার চালানো হচ্ছে।'

ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর বিশেষ অপারেশনে নিয়োজিত সেনারা চিনুক হেলিকপ্টার ও বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে যাতায়াত করত।

মার্কিন অর্থনীতির দুরবস্থা

আফগানযুদ্ধে মার্কিনদের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা

বর্তমানে আমেরিকা ও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক দুর্দশা ও অস্থিতিশীলতার জন্য তাদের আগ্রাসী ঔপনিবেশিক মনোভাবই দায়ী, এর সঙ্গে দ্বিমত করার সুযোগ নেই। এ দেশগুলো বিগত ১০ বছর ধরে নিজেদের জনগণকে অনর্থক যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলো এড়িয়ে চলেছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক সংস্থার এর সদস্য পল ম্যাংগো মিডিয়ার সামনে বলেন, 'মার্কিনসমাজ আজ যে অর্থনৈতিক দুর্দশার মোকাবিলা করছে, তার মূল কারণ ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও লিবিয়ায় তাদের অযথা অর্থ ব্যয়।' তার ভাষ্যমতে, 'আমেরিকা ২০০১ থেকে আজ পর্যন্ত জনসাধারণের পুঁজি ও করের প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার ইরাক ও আফগানযুদ্ধে ব্যয় করেছে; কিন্তু মার্কিন জনগণ এর কোনো ইতিবাচক ফল পাচ্ছে না।'

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট রোলেকের মতে, বিশ্ব-অর্থনীতি এক ভয়াবহ অস্থিতিশীলতার মোকাবিলা করছে। তার মতে, উন্নত দেশগুলো ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। তিনি বলেন, 'যে অর্থনৈতিক অস্থিরতা শুরু হতে যাচ্ছে, তা ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার চেয়ে ভিন্ন ও ভয়াবহ হবে। কেননা, আমাদের কাছে সময়ক্ষেপণ বা নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের সুযোগ নেই।'

অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখে মার্কিন প্রতিরক্ষা-দপ্তর পেন্টাগনও শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর কমান্ডার মাইক মুলেন বলেন, 'মার্কিন সরকার যদি পার্লামেন্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে সক্ষম না হয় এবং ঋণ জুটাতে না পারে, আফগানিস্তান ও ইরাকে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যরা তাদের বেতন পাবে না।' সেনাদের সম্মুখে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন, 'যদি সৈনিকদের বেতন আটকে দেওয়া হয়, তাহলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ।'

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত

মার্কিন পুঁজিবাদীব্যবস্থা এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এখন হাস্যকর মনে হচ্ছে। যদি মার্কিন সরকার নতুন করে ঋণ না পায়, তাহলে তাদের বর্তমান কোষাগারে আফগানিস্তানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীকে পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই।

আমেরিকার ভঙ্গুর অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমেরিকা ও ইউরোপের জনসাধারণকে বলতে চাই, তারা যেন তাদের প্রতারক নেতাদের জিজ্ঞেস করে, যারা তাদের ১ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থ আফগানযুদ্ধে খরচ করেছে, এর ফলাফল কী? এমনকি তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন হেলিকপ্টার ও উন্নত প্রশিক্ষিত সেনারাও তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

তোমাদের চিনুক হেলিকপ্টার প্রতিদিন তালেবানদের আক্রমণের শিকার হয়ে ভূপাতিত হচ্ছে। একদিনে তোমাদের ৩১ জন সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় মার্কিন সরকার ও জনসাধারণকে ঘিরে রেখেছে, তার একমাত্র সমাধান নিজেদের আগ্রাসী মনোভাব পরিত্যাগ করে আফগানযুদ্ধের ইতি টানা। যত দ্রুত সম্ভব, আফগানিস্তানের জনসাধারণের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা।

যদি মার্কিন সরকার নিজেদের এমন যুদ্ধংদেহী রাজনীতি ও উপনিবেশী মতবাদ খতম না করে, তাহলে অচিরেই তাদের দেশের জনগণই এমন প্রতিবাদ ও বিপ্লবের জন্ম দেবে, যা তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে। কেননা, আমেরিকার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির কারণেই মার্কিন জনসাধারণ এখনো আমেরিকার অখণ্ডতায় বিশ্বাস করে; কিন্তু আমেরিকা যদি অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ে, তাহলে তাদের পরিণতি হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো।

শায়খের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—তিনি বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি জিহাদকে মার্কিন প্রভাবমুক্ত করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের জিহাদ বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই জিহাদের ব্যাপারে একটা প্রোপাগান্ডা হলো, এটি আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়, যা ইসলামি জিহাদকে আমেরিকান বলয়ে আবদ্ধ করে ফেলে। এই প্রোপাগান্ডা পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শায়খ জিহাদকে আমেরিকান বলয়মুক্ত করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুসলমানরা মার্কিন সামরিক শক্তি ও ডলারের প্রভাবে বিজয়ী হয়নি, তাঁরা বিজয়ী হয়েছিল মুসলমানদের জিহাদি মানসিকতা ও শাহাদাতের তীব্র বাসনার কারণে। মুসলমানরা নিজেদের ইমানি শক্তিতে তার পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম। খোরাসানে আমেরিকা ও তার সহযোগীদের পরাজয় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমেরিকা শায়খের মাথার মূল্য নির্ধারণ করেছিল ৫ কোটি ডলার। বস্তুত এটা তাঁর একটি পশমের মূল্যও নয়। কেননা তিনি ছিলেন একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি। আল্লামা ইকবালের কবিতার মর্ম প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহ.—

যদি রাজ্যও হাত থেকে চলে যায়, তো যেতে দাও;
তবু আল্লাহর বিধানের অন্যথা করো না।

পাঠক নিশ্চয় ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন গ্রন্থটি কী নিয়ে রচিত। গ্রন্থটিতে শায়খের জীবনী-সংক্রান্ত অন্যোন্য গ্রন্থের তুলনায় ভিন্ন ধরনের তথ্য পাবেন। তাঁকে নিয়ে আরও অনেক বই বাজারে এসেছে, যেগুলোর কোনোটায় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আঙুল তোলা হয়েছে। কেউ রূপকথার প্লট সাজিয়েছে। কেউ আবার তাঁর শাহাদাতকে নাটক প্রমাণের চেষ্টা করেছে। কেউ তাঁকে সিআইএর এজেন্ট হিশেবেও আখ্যায়িত করেছে। এ পরিস্থিতিতে তাঁর জীবনের সত্য তথ্যগুলো এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে আমরা তাঁর ব্যাপারে আলিমগণের বিভিন্ন মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন ব্যক্তি, এমনকি অনেক খ্রিষ্টান লেখকের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত এ গ্রন্থটিতে জাজিরাতুল আরবে জন্ম নেওয়া ও আরবসাগরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবনকালের সত্য ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন মন্তব্য তুলে ধরতে বিভিন্ন মতবাদের আলিম ও রাজনীতিবিদের নামও চলে এসেছে। আসলে সব মতবাদ ও মাজহাবের লোকেরাই তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করতেন বিধায় সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন।

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২০
স্বত্ব : প্রকাশক
মুদ্রিত মূল্য : ৩২০ টাকা মাত্র
প্রকাশক : রেনেসাঁ, ফকিরাপুল, ঢাকা